তৃতীয় খণ্ড "বীণাপাণি"র সূচী।

[গদ্য]

---

* চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি "বীণাপাণি"র চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে

[পদ্য]

চতুর্থ খণ্ড "বীণাপাণি"র সূচী।

[গদ্য]

—

চিহ্নিত প্রবন্ধটী "বীণাপাণি"র পঞ্চম খণ্ডে সমাপ্ত।

[পদ্য]

বীণাপাণি।

...াসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"...স্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে।"

...। } মাঘ, ১৩০৩ সাল। { ১ম সংখ্যা।

সারদার প্রতি।

১

...থেকে পড়ে মনে, মরুময় এই প্রাণে,
আলোক প্রতিমাখানি কি জানি কাহার ?
...নে আসিয়ে হৃদে, ভাঙ্গা বুক দেয় বেঁধে,
নিরাশা-সাগরে করে আশার সঞ্চার !
...দিকে জ্বালাতন; নিয়ে এই মরা-মন,
কেমনে বাঁচিয়ে থাকি বল গো আমায় ?
...ক নীর-বিন্দু, প্রাণ-সঞ্জীবনী-সিন্ধু,
মরা-প্রাণে মরা-মনে, আবার জীয়ায় ;
...'র প্রেম-বিন্দু সেটী কহ গো আমায় ?

২

...মনে, মিষ্টভাবে সযতনে,
...সি' গো থেকে থেকে প্রদানে সান্ত্বনা ?
...বাণী, ক'র সেই মুখখানি,
...ময় মনে জাগে যখনি বেদনা,—

কা'র সেই প্রেম-মূর্ত্তি, প'ড়ে মনে হয়

ক'ার আঁখি সচঞ্চল বিদ্যুৎ খেলায় ?

[illegible]-অন্ধকার, আলোকের [illegible]

ক'রে,—মরা-প্রাণে আবার জীয়ায়,

ক'ার প্রেমালোক সেটী কহ গো আমায় ?

৩

কিন্তু বহুদিন হায়, অন্তর মরুভূ

কেন গো দেয় না দেখা সে প্রতিমাখানি ?

বোধ হয় চলে গেছে, আর না আসিবে

আর না দানিবে সুধা সেই সুধা খনি,

কই কই কোথা' গেলো, কই সে প্রাণের আ

কোথায় কোথায় হায় জীবন-দায়িনী !

অন্ধকারে যাই যাবা, কোথা' সে সারাৎ

মানস-মরালী মম প্রেম-সঞ্জীবনী ?

কোথায় কোথায় হায় জীবনদায়িনী !

৪

ডাকিলে পাইনে দেখা, কিন্তু নিজে দেয়

কেন ওগো লুকাচুরি-খেলা মোর সনে ?

কি জানি কেন গো হায়, কোমলে কঠিনা

প্রেমের পাষাণীমূর্ত্তি পড়ে মোর মনে !

ছেড়ে দে ছেড়ে দে বাণি, শ্বেতভুজে "বীণাপা

প্রাণনাশা ওই তব লুকাচুরি খেলা।

আর, বস্, হৃদাসনে, পালাস্‌নে

তব অদর্শনে আমি বড় ঝালাপালা

ছেড়ে দে ছেড়ে দে বাণি ! লুকাচুরি

৫

সংসারের জ্বালাতন, তা'য় ে

তুমি [illegible] এ জগতে জীবন সহ

চাই না সম্ভোগ-তৃপ্তি,　　　তাহে নাই পূর্ণ দীপ্তি,
তুমি আসি আলো কর হৃদয়-কমল।
চাইনা বিষয়-বিষ,　　　কালকূট মহাবিষ,
বিলাস-কলুষ-বিষে করে জর জর ;
মানবের ভালবাসা,　　　তাহে মোর নাহি আশা,
মিটিযাছে সে পিয়াসা, তুমি কৃপা কর !
আঁধারহৃদয়ে বাণি ! তুমি আলো কর !

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

অদ্বৈতবাদ।

চেতনা হইতেই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি। জগতের সমুদয় দ্রব্যই ...ার দাস। মানুষের দেহের যেমন নানা অবস্থা হয়, যথা—শিশু, ...ক, যুবা ইত্যাদি ; সেইরূপ মানুষের কর্ম্মের নানা অবস্থা হয়, ...ন—ভাল কর্ম্ম, মন্দ কর্ম্ম, ঠকা কর্ম্ম ইত্যাদি। আবার মানুষের ... চৈতন্যের নানা অবস্থা হয়, যথা—রাগ, ভয়, শোক ইত্যাদি। ...রূপ মানুষ চিন্তা করিতে করিতে চিন্তায় নানা অবস্থা দেখিতে ..., যথা—স্থূল চিন্তা, সূক্ষ্ম চিন্তা, মহাচিন্তা ইত্যাদি। এই মহাচিন্তার ... যে চিন্তা তাহাকেই "অদ্বৈত" চিন্তা কহে। এখানে আসিলে ... একাকার।

চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার চরম স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলে, ...ষ্ট জগত একাকার বলিয়া বোধ হয়। মানুষের এই চিন্তাবস্থার নাম অদ্বৈতাবস্থা। ঠাকুর বলিয়াছেন, "যেমন থোড়ের খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ক্রমে মাজে গিয়া উপস্থিত হইলে, আর তাহা ছাড়ান যায় না। এই স্থলে দাঁড়াইয়া যদি চিন্তা করি যে, মাইজ কি বস্তু এবং যে সকল খোলা ছাড়াইয়া আসিলাম, তাহাই বা কি বস্তু ? তাহা হইলে আমরা এই জানিব যে, মাইজ এবং খোলা এক বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। অর্থাৎ খোলারও যে বস্তু, মাইজেও সেই বস্তু ! যেমন,

খোলাতেও যে জল এবং ঐ জল খাইতে যেমন আস্বাদন, মাইজেও সেই জল, খাইতেও ঐরূপ ; খোলার যে বর্ণ, মাইজের সেই বর্ণ ; খোলাতে যে ছাই আছে, মাইজেও সেই ছাই আছে। অতএব খোলা এবং মাইজে একাকার। তাহার পর যদি মাজ হইতে নামিয়া খোলায় আসি, তবে আর একাকার দেখিতে পাই না, তখন দেখি, খোলা স্বতন্ত্র মাইজও স্বতন্ত্র ; স্বতন্ত্র খোলা মানুষের ভক্ষ্য নহে, মাইজ মানুষের ভক্ষ্য। অতএব মাজ ও খোলায় স্থূলে যেমন প্রভেদ, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদেও সেইরূপ প্রভেদ। মাইজ এবং খোলা যেমন বৃক্ষের অবস্থার কথা, তদ্রূপ দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মানুষের চিন্তার অবস্থার কথা।"

খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যাওয়া, অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে উপরে উঠার নাম "আরোহণ সূত্র" এবং মাঝে পৌঁছিয়া, আর পথ না পাইয়া, তথা হইতে নামিয়া আসার নাম "অবরোহণ সূত্র।"

বরফ লইয়া যদি চিন্তার আরোহণ সূত্র ধরিয়া উঠিতে থাকি, তাহা হইলে জলে গিয়া উপস্থিত হইব ; আবার জল হইতে যদি ঐ সূত্র ধরিয়া উঠিয়া পড়ি, তাহা হইলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসে গিয়া দাঁড়াইব। অতএব জল, বরফ এবং বাষ্প বা গ্যাস এক জলের তিনাবস্থা। জলের শেষাবস্থা গ্যাস, এই অবস্থার ওদিকে আর যাইবার উপায় নাই ; অতএব এই স্থান হইতে দেখিলে আমাদের এই বোধ হইবে যে, সেই এক অদ্বিতীয় বাষ্প জলে এবং সেই বাষ্পই বরফে, কাজেই এখানে একাকার। কিন্তু আবার অবরোহণ সূত্র ধরিয়া ঐ বাষ্প হইতে ক্রমে জলে এবং বরফে নামিয়া আসিলে দেখিব, জলের সঙ্গে বরফের মিল নাই এবং বরফের সঙ্গে গ্যাসের মিল নাই। জল তরল, বরফ কঠিন ; জল যেরূপ শীতল, বরফ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শীতল, আর বাষ্পের ত কথাই নাই, তাহা চক্ষে দেখা যায় না। জলের পিপাসা, গ্যাস খাইলে মিটে না ; অথবা বরফের কার্য্য জলের দ্বারা সাধিত হয় না। ফোড়া কাটিবার সময় স্থানিক অসাড় করিতে বরফ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জলের দ্বারা সে কার্য্য হইতেই পারে না। অথবা মুখ ধুইবার কার্য্য বরফ দ্বারা হয় না। অতএব দ্রব্যের

এক অবস্থার সঙ্গে অপরাবস্থার মিল হয় না। শিশুর সহিত যুবকের মিল নাই এবং যুবকের সহিত প্রৌঢ়ার মিল নাই। এই সকল অমিল সূত্রকে দ্বৈতবাদ কহে, এবং মিল সূত্রকে অদ্বৈতবাদ কহে।

স্থূলে বা দ্বৈতবাদে আমাতে, হরিতে বা শ্যামেতে অথবা আমাতে এবং গাছেতে, অথবা আমাতে এবং পশু পক্ষীতে বড়ই প্রভেদ; কিন্তু সূক্ষ্ম বা অদ্বৈতবাদে এ সমুদয়ই একাকার।

সকল নরদেহই নিম্নলিখিত দ্রব্যসংযোগে সংগঠিত, যথা—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, অঙ্গার বা কার্ব্বণ, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়ম বা চুন, ফস্‌ফরাস, গন্ধক, সোডিয়ম, ক্লোরিণ, পোটাসিয়ম, লৌহ, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, সিলিকন, তাম্র, সিসা ও ব্যালুমিনিয় ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য আমাতে, হরিতে আছে, এবং শ্যামেতে রাধাতেও আছে। ইহা না থাকিলে, এক চিকিৎসা গ্রন্থ দ্বারা সকলের চিকিৎসা চলিত না। পরন্তু, ভাগের তারতম্যে ঐ সকল মূল দ্রব্য গরুতে, ভেড়াতে এবং মৎস্যতে বা সকলেতে আছে। যেমন তোমার আমার ভিতর যে নাইট্রোজেন, ময়দা ছোলার এবং ছাগ প্রভৃতি পশু মাংসের ভিতর সেই নাইট্রোজেন। আবার গাছের ভিতর, ফলের ভিতর, পশু পক্ষীর ভিতর এবং তোমার আমার ভিতর যে অঙ্গার, যে সোডা, যে গন্ধক, যে ফস্‌ফরাস আছে, পৃথিবীর সমুদয় দ্রব্যের ভিতর সেই অঙ্গার, সেই সোডা, সেই গন্ধক, সেই ফস্‌ফরাস সেই বালি, সেই চুন, সেই ছাই, সেই ভস্ম আছে; অতএব এখানে সব একাকার। কাজেই এ সকল যুক্তি অদ্বৈতবাদের উক্তি।

কিন্তু এই একাকার অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িলে, ইচ্ছা করিয়া না নামিলেও তবু নামিতে হইবে। কারণ, একাকার অবস্থায় থাকা চলে না; "তাঁহাকে" দেখা চলে! যাহা হউক, নামিয়া আসিলে দেখিবে, গরু, ভেড়া, ছাগল, গাছ, পালা, গাছের পাতা, গাছের ডাল, গাছের ফুল; মানুষ,—যুবা, পুরুষ, নারী, বালক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতি স্ব স্ব প্রভেদ। এত প্রভেদ যে, প্রভেদের ভিতর প্রভেদ। দুই আম্র গাছ এক নহে, দুইটী মানুষ এক নহে। এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার নাম দ্বৈতবাদ।

ঠাকুর বলিয়াছেন,—"গুরু শিষ্যকে কহিল, 'দেখ বাপু! আম্র গাছে কাঁঠাল হয়, আর তাল গাছে নীচু হয়; কলা গাছে আম্ হয়।' যে শিষ্য এই গুরুবাক্য ঈশ্বর বাক্যবোধে বিশ্বাস করিয়া গুরুকে উত্তরে বলিতে পারে যে,—"প্রভো! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পার। আপনার এক একটী অবস্থাতেই জগতের এই অবস্থা। মানুষ, গরু, ভেড়া তোমার অবস্থার কথা, বৃক্ষলতা তোমার অবস্থার কথা। মানুষের এক রক্তের অবস্থানুসারে সেই রক্ত যদি নখ, সেই রক্ত যদি মাংস, সেই রক্ত যদি চুল, সেই রক্ত যদি দুগ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে, আপনার অবস্থা বিশেষে (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদে) যে, কলাগাছে কচু এবং কচু গাছে কলা হইতে পারে না, ইহা কে বলিল? ঠাকুর সেই মন আমায় দাও, যেন তোমার সঙ্গে একাকার হইয়া যাই। ঠাকুর! তুমি যে চৈতন্য। তোমার সঙ্গে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ না থাকিলে কি তোমাকে চেনা যায়?"

যখন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি, তখন এক আকাশ সকলের উপর দেখিতে পাই। আবার যখন সেই দৃষ্টিকে নিম্নদিকে নামাই, তখন আর অনন্ত আকাশ দেখিতে পাই না, আকাশ যেন খণ্ড খণ্ডভাবে বিভক্ত হইয়াছে। সেই অনন্ত আকাশ ঘটের ভিতর প্রবেশ করিয়া "ঘটাকাশ" এবং পটের ভিতর প্রবেশ করিয়া "পটাকাশ" জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া "জলাকাশ" মানুষের ভিতর প্রবেশ করিয়া "মানুষাকাশ" মেঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া "মেঘাকাশ" নাম ধারণ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের অনন্তাকাশকে কেহ প্রাচীর দিয়া বখ্‌রা করিতে পারে না, কিন্তু নিম্নের সমুদয় আকাশকে প্রাচীর দিয়া বখ্‌রা করিতে পারে। ইহাই হইল আকাশের দ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদে দাঁড়াইয়া মানুষ "তাঁহাকে" সকলের পিতা বলিতে পারে, কিন্তু দ্বৈতবাদে আসিলে, এক ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলা চলে না, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার পিতা, এবং আমার পিতার পিতা, কিরূপে হইবেন? তিনি যদি আমার পিতার পিতা হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার ঠাকুরদাদা হইয়া যান! বস্তুত, স্থূলে অদ্বৈত বা ব্রহ্ম

্না করিতে গেলে, এইরূপ গোলযোগে পড়িতে
্রূপ ভাবা যায় যে, এক মৃত্তিকা হইতে ঘট,
া, খুরি এবং সরা ইত্যাদি হইয়াছে; এখন খুরি,
সী ও জালা সকলেই যদি তাহাদের সেই এক
টীকে জন্মদাতা পিতা বলিয়া উপাসনা করে, তাহা
বলা হয় না। কারণ, যথার্থই উহারা সেই এক অদ্বিতীয়
ই জন্মিয়াছে। তবে সরা, খুরী, জালা, কলসী প্রভৃতি
বস্থা বিশেষের নাম মাত্র। অতএব আমরাও সেই এক
ঈশ্বর হইতেই জন্মিয়াছি, তাই তিনি আমাদের সকলের
। তবে যে, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি নাম পাইয়াছি, ইহা
াদের অবস্থা বিশেষের জন্য।

এরূপ একাকাব ভাবিতে পারি, কিন্তু একাকার করিতে পারি না। কারণ, খুররি কার্য্য কলসীতে হয় না; অথবা পুত্রের কার্য্য পিতা দ্বারা হয না; স্বামীর কার্য্য স্বামীতে করিবে, ভ্রাতা দ্বারা কি সে কাযা মিটিবে? ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে এক উপাদানে সকলকে মিলাইতে পারি, কিন্তু নিম্নদৃষ্টিতে যিনি যে স্থানের বা যে অবস্থাপন্ন, তাঁহাকে সেই স্থানে সেই অবস্থায রাখিয়া থাকি। জামা, কাপড়, রুমাল, টকিন প্রভৃতি সকলই এক সূতা দ্বারা হইয়াছে, বিলক্ষণরূপে তাহা অবগত আছি, কিন্তু কাপড় পবিধান করিবার অবস্থানুরূপ, এ অবস্থায় জামাকে পরিধান করা চলে না; জামা যে অঙ্গের পরিধেয়, তাহাকে সেই অঙ্গে পরিধান করিতে হয়। রুমালের কাজ জামায় হয় না, অথবা জামার কার্য্য রুমালে হয় না; যদি হয়, তাহা হইলে জামাকে ছিঁড়িয়া রুমালে অগ্রে পরিবর্ত্তন করিতে হয; তবে ত জামা দ্বারা রুমালের কার্য্য হইবে। পরন্তু জামা ছিড়িয়া, রুমাল করিলে, তখন লোকে আর তাহাকে জামা বলিবে না, রুমালই বলিবে। এত পরিবর্ত্তন তিনি না করিয়া দিলে হয় না। অতএব একাকার ভাবা চলে, করা শীঘ্র চলে না; বেগর তাঁহার কৃপা ভিন্ন, যোগ ভিন্ন হয় না। তবে তাঁহার কাছে যাইতে হইলে একত্রে একাকার হইয়া যাইতে হয়, নচেৎ নয়।

ঠাকুর বলিয়াছেন, "আমি ত এক। আম.
কিন্তু আমি নিজেই নিজের হস্ত এবং পদকে এ৲
আমার হাতের কার্য্য পায়ে করিতে পারে না,
হাতে করে না। যে যাহার, অবস্থানুসারে সে তাহার ৲

ঠাকুর কেশব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁরে কে·
ব্রাহ্মণের পৈতা ফেলাইতেছিস্।" উত্তরে কেশববাবু
"আজ্ঞে হাঁ! যখন এক ঈশ্বরের পুত্র সকলেই, তখন সক
ভাই ভাই! অতএব ভা'য়ে ভা'য়ে আর প্রভেদ
প্রয়োজন কি?"

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "বটে। তুই নিজের নামটা বামহস্ত দিয়া দেখি। অথবা জল বলিলেই যদি সকল জলকে বুঝাইত, তাহা হই৲ নর্দ্দমার জল এবং গঙ্গাজলে প্রভেদ থাকিত না। গঙ্গাজল পানীয় খাও যায়, নর্দ্দমাব জল খা দেখি। যখন তোর বাম হস্তে এবং দক্ষিণ হস্তে প্রভেদ রহিয়াছে, তখন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ থাকিবে না।" ইহার উত্তরে কেশবধাবু বলেন, "মহাশয়! আপনিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু আপনার পৈতা নাই কেন?" ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখ্ কেশব; আমি পৈতা পরি, কিন্তু আমার পৈতা হাবাইয়া যায়, খুজিয়া পাই না। যখন ঝড় উঠে, তখন বটগাছ অশ্বত্থগাছ চেনা যায় না। ঝড় থামিয়া গেলে, গাছ চেনা যায়; সে সময় পৈতা পড়ি, আর ঝড়ের সময় পৈতা কোথায় উড়িয়া যায়, খুঁজিয়া পাই না। তুই লোকের পৈতা ফেলাইতেছিস্ কেন? উহাদেব দেহে ঈশ্বর, প্রেমের ঝড় উঠিলে পৈতা আপনি উড়িয়া যাইবে।"

কলা, মূলা প্রভৃতি ফলকে, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি·গাছকে, মানুষ গরু ভেড়া প্রভৃতি জন্তুকে, ইট্ কাট্ প্রভৃতি দ্রব্যকে অথবা যদি জগতের সমুদয় দ্রব্যকে অদ্বৈত বা ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে এই জগত দগ্ধ হইয়া কেবল এক অদ্বিতীয় ভস্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়। কিন্তু আবার জ্ঞানবারি দিয়া ঐ সকল দগ্ধদ্রব্যকে পুনর্জ্জীবিত করিলে, আবার স্ব স্ব পৃথক পৃথক বোধ হইবে। তখন

দেখিবে, কাহার সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এক অদ্বিতীয় লৌহ দ্বারা ছুরী, কাঁচি, ছুঁচ, তরবাল এবং রেলের গাড়ি হইয়াছে; আবার সেই লৌহ আমাদের রক্তের ভিতর আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া, ছুঁচের কাজ কাঁচিতে হয় না; অথবা কাঁচির কাজ রক্তে হয় না। অতএব অদ্বৈতবাদে একাকার ভাবা যায়, কিন্তু দায়। পরন্তু যদি তাঁহার দয়া হয়, তাহা হইলে প্রবল গ্রীষ্মেও শীতের উদয় হয়—এত শীত যে দুখানা লেপ মুড়ি দিতে হয়। তখন রক্তের দ্বারা ছুঁচের কাজ হয়; কাঁচি দ্বারা কলম কাটা যায়।

তখন,—

একমেবাদ্বিতীয়ং।

তখন,—

জননী রমণী, রমণী জননী,
অথবা কে যে তুমি তা' নাহি চিনি।

তখন,—

সে বড় বিষম ঠাঁই—
গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

তখন,—

সবাই ভগ্নী, সবাই ভাই,
অথবা যা ভাব তাই তাই।

তখন,—

অহং সোঽহং,
অথবা স্বয়ং।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

———

একটী সনেট।

বড়ই কঠোর এই মাটীর ধরণী ;
ভেঙ্গে চূরে গেছে হিয়া পেষণে তাহার !
কোথা স্নেহ—কোমলতা—সুধা সঞ্জীবনী,
কোলে তু'লে লও গুরু মাথাটী আমার !
কি মরণ বিভীষিকা—আঁধার জগৎ ;
একাকী পথিক আমি জীবন-প্রান্তরে !
কোথায় কিরণ তুমি, দেখাও সে পথ,
ঘুরিতে পারি না আর নিরাশ অন্তরে।
শোক-তাপ-দুঃখে প্রাণ অবসন্ন ক্ষীণ ;
জীবনে বিশ্বাস নাই, হৃদয়ে সে বল ;
আশারো সে ক্ষীণ রশ্মি সন্দেহে মলিন,
তাও শেষে ধুয়ে লবে নয়নের জল !
অনেক সহেছি আর সহেনা এ প্রাণে ;
কোথা' তুমি নারায়ণ রাখ প্রেমদানে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাণা প্রতাপসিংহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালচক্রের আবর্ত্তনে প্রতাপ সিংহ ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। আমাদের ভাগ্যদোষে সেই বার্দ্ধক্য আবার অকালে উপনীত হয়; ইহার কারণ এই যে, দুঃসহ চিন্তাসর্পের বিষম দংশন, অনন্ত মানসিক ক্লেশ ও সাংসারিক যন্ত্রণারাশির কঠোরতম প্রহার। দিনের পর দিন অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল, প্রতাপের স্বর্গারোহণের দিনও ততই নিকটবর্ত্তী হইতেছে কিন্তু চিতোরোদ্ধারের আশা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম চিতোরনগরী যবন-কর-কবলিত !

ইহা কি বীর হৃদয় প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন? মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রসন্ন সলিলা পেশালা সরোবরের তটোপরি কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতির উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। মহারাণার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তথাপি কেন তিনি পর্ণকুটীরে বাস করিতেন! ইহার কারণ এই যে, যেহেতু তিনি চিতোর নগরীর উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হন নাই, তজ্জন্যই আজ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তিনি পর্ণ-কুটীরশায়ী সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। মিবারের চির-রাজধানী চিতোরনগরীর হীনাবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া যাইত, তাই আজ তিনি ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ ভাবে কালহরণ করিতেছেন। পাঠক! সমগ্র জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ দেখি, কোথাও এরূপ স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীর অন্য একটী দৃষ্টান্ত পাও কি না?

বীরেন্দ্র কুলকেশরী প্রতাপ সিংহ আজ ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত, তাঁহার পুত্র অমরসিংহও সুখ দুঃখের চিরসহায়, পরম বিশ্বস্ত ভীলগণ ও ক্ষত্রিয়বংশীয় সর্দ্দারগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রতাপ এই শেষ মুহূর্ত্তেও স্বীয় স্বদেশে প্রেমিকতা ও প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হওয়া দূরে থাকুক, স্বপ্নেও তাহা দেখেন নাই। প্রতাপ মিবারের পূর্ব্ব স্বাধীনতা ও প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইলেন না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার পুত্র ও সর্দ্দারগণ পাছে তাঁহার মৃত্যুর পর যবনের অধীনতা স্বীকার করেন, তজ্জন্য তিনি শেষ মুহূর্ত্তেও সবিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র অমরসিংহ ও সর্দ্দারগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যত দিন না মিবার ভূমির স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় উদ্ধার হয়, ততদিন আমরা কুটীরেই বাস করিব ও আপনার ন্যায় চিরদিনই যবনের শত্রুতা চরণ করিব।" এই কথাগুলি বীর হৃদয় প্রতাপের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তিনি সহাস্যবদনে, নিশ্চিন্তমনে ও প্রশান্তভাবে অমরধামে যাত্রা করিলেন। জনৈক স্বাধীনচেতা ইংরাজীভাবাপন্ন দেশীয় কবি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাসম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন,—

প্রতাপ বলিলেন,—

"Now swear, my boy, upon thy sword,
Thy country to defend,
And swear that ne'er in homage mean,
Thy royal knees shall bend.
"Eternal conflict thou must wage—
Such as thy sire begun—
To crush the haughty Moslem power,
Or be thyself undone.
Then will my soul sleep sound in peace,
This troubled spirit rest.—"

প্রতাপের সমতুল্য বীর মানবেতিহাসে অতীব বিরল। প্রবল পরাক্রান্ত দুরন্ত মোগল সেনাগণের সহিত একাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া যে শুভ্র যশোরাশি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই ভারতেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বীর ত অনেক আছেন, কিন্তু প্রতাপের ন্যায় বীর কয়জন? কে এই অল্পমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমবিক্রান্ত বিপুল সহায় সম্পন্ন সুবিশাল রাজ্যাধিকারী বৈরীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যে দুর্দ্দিনে ভারতের ভাগ্য গগন হইতে প্রতাপরূপ উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সে দিনের বিষয় স্মরণ করিলে আজ পরাধীন হিন্দুজাতির হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি যে অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবে দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দীতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছেন। "প্রতাপ নরকুলে দেবতা।" তিনি মাতৃভূমিকে দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এ মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অসাধারণ ক্লেশ, অসীম যন্ত্রণা কি কখন মানবে সহ্য করিতে পারে? প্রতাপ আজীবনকাল অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে যবনের অধীনতা স্বীকার রূপ পাপময়ী চিন্তাকে

যে মানস-মন্দিরে স্থান দেন নাই, বরং অরাতিগণের সহিত সমরানল প্রজ্জলিত রাখিয়া নিজেকে সার্থক বোধ করিতেন। তাঁহার দুর্দ্দশা যতই ঘনীভূত হইয়াছিল, তিনি ততই উৎসাহিত হইয়া যবনের শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন। বিপক্ষকে শত সহস্রগুণে সহায় সম্পন্ন জানিয়া, যে বীর কিছুমাত্র ভীত হইতেন না, তিনি কি মানব? ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন মোগলের অধীন, তখন তিনিই কেবল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া অবিচলিত সাহস, অমানুষিক স্বদেশ-প্রেমিকতা, অসাধারণ বীরত্ব ও অলৌকিক স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়া, হিন্দুজাতির মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপসিংহের কীর্ত্তিস্তম্ভ অভ্রংলিহ হিমাদ্রি অপেক্ষাও উন্নত, ধবলাগিরি অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ। যতদিন জগতে ইতিহাসের সম্মান থাকিবে, যতদিন একজন মাত্র ব্যক্তি আগ্রহ-সহকারে মানবকীর্ত্তির অতীত সাক্ষী ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে, ততদিন প্রতাপসিংহের নাম কেহ কখনও ভুলিবে না। ভারতকে যখন অমানিশা রজনী আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তখন তিনিই স্বীয় অদ্ভূত ক্ষমতাবলে পূর্ণিমার শুভ্রালোক ভারতে বিস্তার করিয়া জগতের সম্মুখে হিন্দুজাতির মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। যতদিন হিন্দুজাতির একজন মাত্র ব্যক্তি জীবিত থাকিবেন, যতক্ষণ তাঁহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি প্রতাপকে স্বীয় মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। সমগ্র জগতকে জিজ্ঞাসা কর—কে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বদেশোদ্ধারার্থ এরূপ প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দীতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন?—কে সুধা-ধবলিত সুখসেব্য অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর ন্যায় ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ভ্রমণ করিয়াছেন? কে স্বদেশের স্বাধীনতা-উদ্ধারে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াও সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শীত বর্ষাদি ঋতু হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন?—কে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা ও রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত কন্দমূল ফলে ক্ষুন্নিবারণ

ও তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আত্মোৎসর্গের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন?—কে শান্তির সুকোমল ক্রোড় সেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর শত্রুগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন? ইহার একমাত্র উত্তর—বীরেন্দ্র চূড়ামণি সংগ্রাম-পৌত্র প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ।

মহাত্মা টড্ এইরূপ লিখিতেছেন;—

"Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the "ten thousand" would have yielded more diversified incidents for the historic muse, than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Mewar. * * * There is not a pass in the Alpine Arvali that is not sanctified by some deed of Protap,—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat Huldighat is the Thermopylœ of Mewar; the field of Dewir her Marathon"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐশী-শাসন ও শাস্তি।

সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ—শাসনবিধি—প্রয়োজনীয়, আর সেই সকল বিধির সম্যক পরিচালনায় প্রভু-শক্তির প্রয়োজন। এই শাসনবিধি আমাদের অন্তরে, বাহিরে, দেশে, সমাজে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কীটানুকীট হইতে অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত এই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এই বিধি প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই জগতের ক্রিয়া আবহমানকাল সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে।

এই বিশ্বরাজ্যের এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার পরিচালনে যে প্রভুশক্তি প্রযুক্ত্য হইতেছে, সেই শক্তিই পরমা শক্তি, আর সেই প্রভুই মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর মহতীশক্তি প্রতিনিয়ত এই নিখিল বিশ্ব-শাসনে নিযুক্ত। সেই রাজার রাজা সেই প্রভুর প্রভু দুষ্ট-দমন শিষ্ট-পালনাদি রাজধর্ম্মে এই সুমহান বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছেন। তাহার বিচারের আর আপীল নাই, তাঁহার বিচারালয়ে উকীল কাউন্সীলের সমাগম নাই, তাঁহার বিচার-মন্দিরে আইনের কুটতর্ক স্থান পায় না; সেখানে সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মাধিকরণে নিরত সত্য ও ন্যায়ের ধারায় বিচার এবং শাস্তি হইতেছে। ত্রিভুবন তাঁহাব বিচারে নতশির, তৎপ্রদত্ত শাস্তি মস্তকে ধারণ করিয়া কর্ম্মফলানুসাবে ফলভোগ করিতেছে।

পাপী আমরা, সেই ধর্ম্মরাজকে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তদীয় বিচারব্যবস্থা ও শাসন শাস্তি প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর শাস্ত্রগ্রন্থ অতীতের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পাপীর পাপাচরণের শাস্তি দিতে, ভুভার হরণ করিতে, ধর্ম্মেব জয় ঘোষণা করিতে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সেই চক্রধব কত চক্রান্ত অবলম্বন করিয়াছেন, মহাভারত—রামায়ণ—পুরাণাদি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যখনই পাপের ভরা পরিপূর্ণ হয়, তখনই তিনি একবারে স্বয়ং সারে জামিনে তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিয়া থাকেন।

আমরা অবোধ— আমরা যাহাকে দুঃখ, শোক, পরিতাপ, ব্যসন ইত্যাদি মনে করিয়া ম্রীয়মান হই, তাহা তাঁহার শাসন বই আর কিছুই নহে, আমাদের স্বকৃত অপরাধের ফলভোগ বই আর কিছুই নহে। অবোধ অজ্ঞান বালক হিতৈষী পিতার শাস্তিতে বিরক্ত হয়, অলস অমনোযোগী ছাত্র জ্ঞানদাতা শিক্ষাগুরুর শাসনে দোষারোপ করে, আর জ্ঞানান্ধ মোহান্ধ আমরা সেই পরম কারুণিক পরম পিতার, সেই অবিদ্যা বিনাশক বিদ্যাদাতার শাস্তিতে কতই দুঃখিত হই, কতই দোষারোপ করি।

প্রেমময় পরমপিতার প্রেম-নিকেতনে এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে—

যাহাতে তাঁহার প্রজাবর্গ সর্ব্বদা আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই ইচ্ছায় তিনি কত মঙ্গলকর, অশেষ হিতকর বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিশাল-বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই তদীয় প্রেমের অনন্ত প্রস্রবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

তবেই আমাদের এত যাতনা, এত কষ্ট, এত ক্লেশভোগের কারণ—আমাদের দুষ্ক্রিয়া, আমাদের অবাধ্যতা, আর আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা। আমরা বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা অর্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানশূন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানে অন্ধ হইয়া তদীয় অশেষ মঙ্গলকর বিধিব্যবস্থার অবমাননা করিতে গিয়াই, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে গিয়াই আমরা শাস্তিভোগ করি, আর জ্ঞানের গর্ব্বে মত্ত হইয়া নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে সেই অমোঘ ঐশ্বরিক শাস্তি ব্যর্থ করিতে চেষ্টা পাই, ভাবি না, আমাদের সে চেষ্টা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের চেষ্টা অপেক্ষাও হাস্যজনক, বামনের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা অপেক্ষাও বৃথা।

সেই ধর্ম্মরাজ আমাদের পাপাচরণের শাস্তি বিধানার্থ সচরাচর ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ উপায়কে আমরা ত্রিবিধ দুঃখ বা "ত্রিতাপ" বলি।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ বা ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সেই পরম কারুণিক ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রজাবর্গের শাস্তি ও শিক্ষাবিধান করিতেছেন। আমাদের মানসিক বিকার ও তদোৎপন্ন শারীরিক বিকারাদি (যাহাকে আমরা রোগ বলি) প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, চোর-তস্করাদির অত্যাচারজনিত দুঃখই আধি-ভৌতিক আর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিভ্রাট নিমিত্ত দুর্ভিক্ষাদি দুঃখই, আধিদৈবিক। কাল মাহাত্ম্যে, যুগ ধর্ম্মে আমাদের পাপাচরণ যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই সুবিচারক ততই আমাদিগকে দমন করিবার জন্য এই ত্রিবিধ শাস্তি উপর্য্যুপরি ব্যবহার করিতেছেন। আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, শিক্ষার গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া, রোগের নিদান নিরাকরণ করিতে না পারিয়া নানাবিধ কাল্পনিক

ঔষধের প্রয়োগ করিতেছি। বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের করাল কবল অবলোকনে আমরা প্রায়শই ভীত, কম্পিত ও জর্জ্জরিত হইতেছি; মহামারি মার মার শব্দে প্রায়ই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দিন দিন নূতন নূতন পীড়া আমাদের সর্ব্বনাশের নিমিত্তই বুঝি জন্মগ্রহণ কবিতেছে। আজ এই ভয়ঙ্কর মারিভয়, কাল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, একথা ত আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি। এ ত্রাস, এ ভীতি, ঐশী-শাস্তি ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শারীরিক ও মানসিক সুখ-শান্তির সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলেই ব্যক্তিমাত্রেই এতদুভয়ের বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। বল দেখি—৫।৭ টাকা মাসিক বেতনের উপর নির্ভর করিয়া তোমার বৃদ্ধ প্রপিতামহঠাকুর দোল দুর্গোৎসবাদি করিয়া, পুত্র পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া যে সুখ শান্তিতে সুদীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজ মোটা বেতনের চাক্‌রী করিয়াও সেই সুখ-শান্তি, সেই দীর্ঘজীবন তোমার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে কি না? তাঁহাদের আয় ব্যয়, তাঁহাদের চিকিৎসকের খরচ ও তাঁহাদের পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত তোমাদের তত্তৎ বিষয়ের তুলনা করিয়া ভাব দেখি, আমাদের এত অধোগতি, এত যন্ত্রণা কেন হইতেছে? এ বিষয়ে আমাদের—পাপাচার কি একমাত্র কারণ নহে?

আমাদের অন্তরে যত অধিক সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইবে, পাপ-প্রবৃত্তি ততই তিরোহিত হইতে থাকিবে। এই সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব বা তিরোভাব আমাদের আচার ব্যবহার ও আহার বিহারাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই জন্যই বহুদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ বুধগণ আমাদের সাত্ত্বিকভাব রক্ষা করিবার জন্য আচার ব্যবহার, আহার বিহারাদি বিষয়ে কতকগুলি হিতকর নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সেই সকল নিয়ম পরিপালনে মানবের অন্তরে সাত্ত্বিকভাব প্রাদুর্ভাব হইয়া, তামসিক ভাবকে নষ্ট করিয়া

ফেলিবে এবং সাত্ত্বিকভাবের আধিক্যে অন্তরে ধর্ম্মবলেরও আধিক্য ঘটিবে এবং ধর্ম্মবলাধিক্যে আত্মার উন্নতি, সুতরাং শারীরিক উন্নতিও সংসাধিত হইবে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়া—কেবল শরীর লইয়া ব্যস্ত হইয়াই, নিষিদ্ধ আচারের প্রশ্রয় দিয়া দিন দিন পাপের পথে অগ্রসর হইতেছি। পাপাচাব আমাদের অন্তর কলুষিত কবিতেছে, সুতরাং আমাদের দেহও অন্তঃসার শূন্য হইযা যাইতেছে। তাই আজ আমরা ঐশী-শাসনে এত জর্জ্জবিত, ত্রিতাপে নিযত সন্তপ্ত হইতেছি।

ধর্ম্মই আত্মার বল, শুদ্ধাচারই আত্মাব একমাত্র পরিপোষক, আত্মার উন্নতিতেই মানসিক উন্নতি, আর মানসিক উন্নতিতেই শারীরিক উন্নতি। এইরূপ ক্রমাবলম্বনে শারীবিক উন্নতিবিধান না করিতে পারিলে, কখনই আমাদেব উন্নতিবিধান হইবে না; সুতবাং কখনই আমবা এই ত্রিবিধ তাপেব হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব না। ধর্ম্মবলই এই ত্রিবিধ দুঃখনাশক। ধর্ম্মবলেব নিকট সকল দুঃখই নতশির।

অতএব আমাদেব এই সকল কষ্ট, দুঃখ ও বিপদাদি আমাদের আত্মাপরাধবৃক্ষেব ফল বই আব কিছুই নহে, তাই নীতিশাস্ত্র বিশাবদ বলিবা গিয়াছেন—

"বোগ, শোক, পবিতাপ, বন্ধন ব্যসনানি চ।
আত্মাপবাধ বৃক্ষানাম্ ফলন্যেতানি দেহিনান্॥

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রতাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাইয়া দেখিলাম, সুরো বস্তুতই আত্মহত্যা করিয়াছে। একখানি সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুকুমার দেহলতাখানি স্থাপিত রহিয়াছে। আর সেই শয্যা প্লাবিত করিয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া রুধির-ধারা ছুটিতেছে। চক্ষু দুইটী ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। আর সেই মুদ্রিত চক্ষুকোলে বুঝি দু-একটী অশ্রুকণা শুকাইতেছে, অস্তনোন্মুখ সৌন্দর্য্যরাশি ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়িতেছে। সুরো তখনো বিবাহের পট্টসাড়ী পরিয়া।

পার্শ্বে নবীনবাবু বসিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছেন। মাটীতে তাঁহার স্ত্রী ধূলিবিলুণ্ঠিতা হইয়া চীৎকার করিতেছেন। দোঁহার আর্ত্তনাদে ঘর ফাটিতেছে। দিগ্ দিগন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছে। অদূরে দাস-দাসীরা বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আর সেই হতভাগা বর—জগদীশ নীরব নীস্পন্দ ভীতের ন্যায়, চকিত বিস্মিতের ন্যায় স্তম্ভীত হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকুল নেত্রে চাহিতেছে।

সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে কিছুতেই আমি সমর্থ হইলাম না। আমার হৃদয় শতধা-চূর্ণ হইয়া গেল। আমি উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। যে কুসুমলতাটী আমি বাল্যকাল হইতে সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছি, আজ সেই লতাটীকে এ হেন অবস্থায় দলিত দেখিয়া, আমার এক প্রাণ শত প্রাণ হইয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমার স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, সেই সুরো আজ রক্তাক্ত কলেবরা; কেশ পাশ দিয়া আজ রক্ত ঝরিতেছে, অস্ফুট চম্পক কলির ন্যায় অঙ্গুলীমালায় রক্তস্রোত শুকাইতেছে, দ্রুমচ্যুত বল্লরীর ন্যায় দেহ-লতাখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি আর দেখিতে পারিলাম না; দ্রুতপদে পার্শ্বস্থ কুটীরে যাইয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। এইরূপ

অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, বলিতে পারি না; কিছুকাল পরে একজন চাকর আসিয়া আমাকে ডাকিল,—"প্রতাপ বাবু!" আমি চমকিয়া চাহিলাম। সে বলিল, "বাবু আপনাকে ডাক্‌চেন।" সে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইল, আমি চলিলাম।

* * * * *

নবীন বাবু বলিলেন, "প্রতাপ! সুবো আত্মহত্যা করিল কেন?"

আমি। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু—

নবীন বাবু। কিন্তু কি প্রতাপ?

আমি। বিবাহের কিছু পূর্ব্বে সে আমাকে ডাকিয়াছিল; ডাকিয়া বলিল যে, তোমার সঙ্গে হয়ত আমার আর দেখা হইবে না—আমার এই কৌটাটী তুমি উপহার গ্রহণ কর; আমার অনুরোধে ইহা কল্য খুলিও। আমি আর বলিতে পারিলাম না, আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নবীন বাবু দ্রুতস্বরে স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "তার পর।"

আমি। তার পর আর কিছুই জানি না, সে দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। আমি বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। সে কৌটা সেই রকমই পড়িয়া রহিয়াছে। আমি তাহা এখনও খুলি নাই।

নবীন বাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ধীর অথচ কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কৌটার কথা আমায় আগে বল নাই কেন? সকলই আমার দুরদৃষ্ট, প্রতাপ! কৌটাটী শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আইস।" আমি কৌটা আনিতে চলিয়া গেলাম। নবীন বাবু পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"মহাত্মা আর্য্যঋষিগণ! তোমাদের বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা আমি তুচ্ছ করিতাম, আজ তাহার ফল হাতে হাতে পাইলাম। হিন্দুরমণী মনকেই সকল বিষয়ের সাক্ষ্য মনে করে; পাষণ্ডের হাত হইতে কেমন করিয়া নিজের অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানে। টাকা কড়ি, ধন দৌলত অতি তুচ্ছ মনে করিতে জানে; পার্থিব জিনিষে অতিমাত্র বীতস্পৃহ হইতে জানে। হায় হায়! আমি এতটা এতদিন বুঝিতে পারি নাই কেন? তাহা

হইলে বুঝি আজ আমার প্রাণের সুরো এমন করিয়া মরিত না। হায়! আমি যদি অষ্টম বর্ষে ইহাকে বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমন করিয়া আজ আমায় কাঁদাইত না। হায়। অদূরদর্শী ক্ষীণদৃষ্টি, পাপিষ্ঠ আমি, আর্য্যঋষিদিগকে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য মনে করিতাম। জানিতাম না. হিন্দু-গৃহে লজ্জাশীলা রমণীর যুবতী-বিবাহ কীদৃশী ভয়াবহ। হায় প্রতাপ! তুমি দরিদ্র হইলে কেন?"

আমি কৌটা লইয়া আসিলাম। নবীন বাবুর শেষ কথাটী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম. নবীন বাবুর চক্ষু শুষ্ক, মুখমণ্ডল গম্ভীর। কৌটাটী তাহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি বলিলেন, "খোল।"

কৌটাটী খোলা হইল। দেখিলাম তাহার মধ্যে খানচারেক স্বর্ণালঙ্কার। নবীন বাবু অলঙ্কারগুলি উঠাইলেন; উলটাইয়া পালটাইয়া তিনচারিবার দেখিলেন; বলিলেন, "এইগুলি সুরো বড় ভালবাসিত।" গহনাগুলি উঠান হইলে তন্নিম্নে একখানি সুদীর্ঘ পত্রিকা দেখিলাম। নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন. "ওখানা কি?" আমি বলিলাম, "একখানা পত্র।" নবীন বাবু বলিলেন, "পড়।" আমি পড়িতে লাগিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"প্রতাপ! যদি বিবাহ শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর না হয়. যদি নিতান্ত একটা লোকাচার নৃত্য-গীত-বাদ্য বিশেষের অঙ্গ না হয়, তবে প্রতাপ! বলিতে লজ্জা কি—কি জন্যই বা আর লজ্জা করিব—আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার মনের মতন হৃদয়রত্ন স্বামী আমি পাইয়াছিলাম, আমি হতভাগিনী, তাই ভোগ করিতে পাইলাম না। তাহাকে যদি না পাইলাম, তবে এ ছার জীবন কিসের জন্য? য হৃদয় একবার তাঁহার চরণপ্রান্তে উৎসর্গ করিয়াছি. কোন প্রাণে তাহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতিনী হইয়া অপরের প্রতি তাহা সমর্পণ করিব। সাবিত্রী বলিয়াছেন, "কর্ম্মের সাক্ষী মন।" আমি রমণী, আমিও সাবিত্রীর মত মুক্তকণ্ঠে

বলিতে জানি, "কর্ম্মের সাক্ষী মন।" বাহ্যিক লোকাচার আমি মানি না। তবে আমি অসহায়া, কিন্তু আমারও শক্তি আছে, মনে রাখিও, আমি শক্তিসম্ভূতা।

"প্রতাপ! আজ আমার লজ্জা নাই, বলিতে ভয় নাই, আজ আমি জগতের সমক্ষে নির্লজ্জা, নির্ভয়া; কারণ আমি আর জগতের সহিত, তোমার সহিত কথা কহিতে পাইব না। এ জগতে তুমি বই আর কেহ আমার স্বামী হইতে পারিবে না। কিন্তু তোমাকে ত পাইলাম না! যখন তোমায় পাইলাম না, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়, আমি রমণীকুলে কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। পবিত্রা সাবিত্রীর কূলে কালিমা রোপন কবিতে চাহি না। প্রতাপ! তোমার জনা আমি মবিলাম না; তুমি দুঃখিত হইও না। আমি মন্দভাগিনী. তাই আমায় মরিতে হইল; তোমাব কি দোষ?

"প্রতাপ! প্রতাপ! ও প্রতাপ! আজ একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিয়া লই। তোমাকে ত আব পাইব না, এই জন্মে তোমাকে ত আব পাইব না, তবে আমার লজ্জা কি? আজ এ সময়ে আব লজ্জা করিব না, একবাব হৃদয় ভবিয়া তোমায় ডাকি। হৃদয়েশ! স্বামিন্! প্রভো! সুবোর হৃদযবত্ন—আমি ডাকি, তুমি শুন।

"তুমি বড দুঃখিত হইতে, তোমার কাছে যাইতাম না। কোন্ প্রাণে, কোন্ সাহসে তোমার কাছে যাইব? তুমি আমাকে প্রায়ই দিদি বলিয়া ডাকিতে—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না—আমার হৃদয় তখন ফাটিয়া বাহির হইত। তাই তাড়াতাড়ি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতাম, কিন্তু তবুও তোমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিত, লুকাইয়া লুকাইয়া অনেক সময় চক্ষু ভরিয়া তোমাকে দেখিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আজও আমার সাধ মিটে নাই।

"তুমি দেবতা, তাই আমাকে ভগ্নির মত ভালবাসিতে, আমি মন্দভাগিনী, সে স্নেহের প্রতিদান করিতে পারি নাই। আমি আস্তে আস্তে উগ্র হলাহল পান করিয়াছি; এখন হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছি। আমি দুর্ব্বল হৃদয়কে

য়া রাখিতে পারি নাই—সামান্য তৃণের ন্যায় প্রবল তরঙ্গ-ভাসিয়া চলিয়াছি! জলন্ত বহ্নি দেখিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে পতঙ্গের ঝাপ দিয়াছি, তাই আজ মরিতেছি। প্রতাপ! তোমার কি দোষ! আমার জন্য দুঃখিত হইও না।

"এ মন্দভাগিনী জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় চাহিয়া লিল। আমায় মনে রাখিবে—তোমাকে দিব, এমন কিছুই নাই; তবে এই কথানা অলঙ্কার আমি বড় ভালবাসিতাম—ইহাই তোমাকে দিয়া যাইতেছি। প্রতাপ। যখন তোমার বিবাহ হইবে, তোমার স্ত্রীকে এই কথানা গহনা পরাইয়া আমাকে একবার মনে করিও—ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

"পিতাকে আমার শান্ত করিও, বৃদ্ধের আর কেহই থাকিল না। তাহার এই মন্দভাগিনী কন্যাকে জন্মের মত ভুলিতে বলিও। পার্থিব সুখভোগ আমার কপালে ছিল না। পিতাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা করিও। প্রতাপ! ভালবাসার যদি পুরস্কার থাকে, পরজন্মে কি তোমায় পাইব না? স্বামিন্ তোমাকে কি কখন সেবা করিতে পাইব না? তোমায় কি কখন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইতে পারিব না? আমার সময় কমিয়া আসিতেছে, আমি চলিলাম। ইতি—

মন্দভাগিনী সুরো

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী নলিনীবালা সেন।

প্রকৃতির আনন্দ

সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?—প্রথম ভাগ, শ্রীনবকুমার দেব নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষীগণ হিন্দুদের দেবতাগণের নানা প্রকার কুৎস রটনা দ্বারা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হিন্দুদেবতাবিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিয়োগী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সেই কলঙ্ক অপনোদনার্থ বিশেষ পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের পরিচয় প্রদান দ্বারা বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

সরল গৃহ চিকিৎসা।—রাণাঘাট, নদীয়া, ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কস্ হইতে ডাঃ জে, সি, মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

"ডাঃ জে, সি, মুখার্জ্জী" সহজে গৃহ চিকিৎসার জন্য এই পুস্তকখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ভাল। পুস্তক পাঠে কতকটা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া বোধ হয়। তবে এরূপ পুস্তক যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই। ভাষা ও মুদ্রনের প্রতি একটু নজর করিলে ভাল হইত। মুষ্টিযোগগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

চক্রচিন্তামণি।—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

ষট্চক্র নিরূপণ ও তদ্ভেদক্রম ইহাতে পদ্যে লিখিত হইয়াছে। বিষয় যেমন গুরুতর, বুঝান তেমন বিষদ হয় নাই। এ বিষয়ে গদ্য বিস্তৃত পুস্তক লিখিলেও সাধারণে তাহা বুঝিতে পারেন কি

হউক, পুস্তকের সদুদ্দেশ্য জন্য আমরা সুখ্যাতি

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভাবতি, দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩০৩ সাল। | ২য় সংখ্যা।

প্রতাপ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

নবম পরিচ্ছেদ।

রজনী পোহাইল। কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগ কূজিল, হেলিয়া দুলিয়া মৃদুল অনিল বহিল। কত ফুল ফুটিল, কত ফুল মুদিল। রজনী পোহাইল। রোজ যেমনি করিয়া নবরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া রাত পোহায়, আজও তেমনি করিয়া পোহাইল। এ বিশ্বে একটা হৃদয়,—নবীন বাবুর মত বিশাল একটা হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া গেল, একটা পরিবার যে ছার খার হইল, এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত লজ্জা যে, অনাদরে নষ্ট হইয়া গেল, এ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, অপার রূপরাশি, অতুলনীয় যৌবন যে দু মিনিটে এমন করিয়া ফুরাইয়া গেল, তবু রাত পোহাইল, তবু প্রকৃতির আনন্দ তরঙ্গের একটী তরঙ্গ কমিল না।

বেলা হইল। জগত ব্যাপিয়া সূর্য্যের স্বর্ণ ছটা হাসিল। পৃথিবী কাজে ব্যস্ত হইল। আমাদের যে আজ সব কাজ ফুরাইয়াছে; এত আমোদ কোলাহল যে থামিয়া গিয়াছে, এত আদর যে অনাদর হইয়াছে, এত আনন্দ যে নিরানন্দ হইয়াছে, এত সুখ যে দুঃখ হইয়াছে, তবু পৃথিবী কাজে ব্যস্ত। আকাশে বেলা উঠিল।

নবীন বাবু সহসা উন্মত্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জলদ গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"প্রতাপ।" আমি ভীত হইলাম, তাহার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিলাম, নবীন বাবু বলিলেন "প্রতাপ এত বাজনা কেন থামিয়াছে, উহাদের কেন আনিযাছিলাম? সুরোর যে আজ বাসী বিবাহ। বাজনা বাজাইতে বল।"

আমি আরও ভীত হইলাম। কিছুই বলিতে সাহস করিলাম না! কিয়ৎকাল উন্মত্তবৎ বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন বাবু আবার বলিলেন "বাজনা বাজাইতে বল।" আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু নবীন বাবু বড় ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন—"তুমি কথা শুনিলে না, আমিই বলিতেছি" নবীন বাবু বাহির বাটীতে চলিযা গেলেন। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

নবীন বাবু বাহির বাটীতে আসিয়া বাজনা ডাকাইযা পাঠাইলেন, খাজাঞ্চিকে তলব করিলেন। পুরোহিত আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?" তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "কাজ আছে"—বলিযাই চমকিযা আমার দিকে ফিরিলেন বলিলেন "তুমি এখানে কেন? সুরো একলা রহিযাছে, তুমি সেখানে যাও।" আমি উত্তর করিতে সাহস করিলাম না, দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিযা আবার বলিলেন, দেরি করিতেছ কেন, যাও শীঘ্র যাও। আমি অন্তঃপুরে আসিলাম।

* * * * *

যখন আকাশে দ্বিপ্রহরের বেলা উঠিল, তখন শুনিলাম, সুরোর সাধের ফুলের বাগানে বড বাজনা বাজিতেছে। আমি বড় ভীত হইলাম, নবীন বাবুর ভাব আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইয়া ছিল না।

বাজনা শুনিয়া আরোও ভীত হইলাম। সহসা একজন কর্ম্মচারী আসিযা বলিল "বাবু ডাকিতেছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবু কোথায়?" কর্ম্মচারী বলিল "দিদির বাগানে" আমি আর দাঁড়াইলাম না। কর্ম্মচারীকে সুরোর মৃত দেহের নিকট বসিতে বলিযা, তাড়াতাড়ি চলিলাম। পা বাড়াইযা দেখিলাম, নবীন বাবু আসিতেছেন। আমাকে দেখিযা নবীন বাবু বলিযা উঠিলেন "সুরো কৈ?" সুরোকে লইয়া চল, শীঘ্র এস, সময যায়, বলিয়া নবীন বাবু আবার চলিযা গেলেন। আমি কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। সুরোর মৃতদেহ স্কন্ধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম।

বাগানে গেলাম, দেখিলাম চন্দন কাঠের চিতা সাজান হইয়াছে। পাশে কলসে কলসে ঘৃত বহিয়াছে। সুগন্ধি তৈল, হলুদ, সিন্দুর, আলতা, পট্টসাড়ী, লাজ, চন্দন সব গোছান রহিযাছে। কলসে কলসে জল রহিয়াছে, পার্শ্বে পুরোহিত দাঁড়াইয়া।

নবীন বাবুর চোখে জল আসিল। আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আমার স্কন্ধে সুরোর মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে নবীন বাবুর চোখে জল আসিল। মুছিতে মুছিতে নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন, "প্রতাপ আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমায স্নেহ করিতাম, কিন্তু গরীব বলিয়া ঘৃণা করিতাম। তোমায় বিদ্যার জন্য, তোমার বিনযের জন্য, পবিত্র স্বভাবের জন্য, তোমায় স্নেহ করিতাম, তুমি দরিদ্র, আমি অর্থ পিশাচ, তাই তোমায় ঘৃণা করিতাম। সেই ঘৃণার ফলে, আমার সুরো আজ মরিযাছে, আমার নীচ হৃদযের জন্য সুরো আজ মরিয়াছে। আমার পাপের প্রাযশ্চিত্ত করিবার জন্য সুরো আজ মরিয়াছে। আমায ক্ষমা কর।" বলিতে বলিতে নবীন বাবু আমার কাছে দৌড়াইযা আসিলেন, আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

আমায় শান্ত করিতে করিতে নবীন বাবু বলিলেন—"আজ তোমার সহিত সুরোকে যদি একত্র করিতে পারিতাম, এমনি করিয়া তোমার অঙ্কে যদি সুরোকে সঁপিয়া দিতাম, তবে আজ আমার সুরো মরিত না। আমি পাপিষ্ঠ, তাহা করি নাই, তাহার ইহলোকের পুণ্য আমি হরণ

করিতেছিলাম, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতাপ! ইহ জগতে হিন্দু-রমণী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া, হাসিতে হাসিতে মরিতে চায়। স্বামীর সম্মুখে যে চিতায় পুড়িতে পাবে, ইহ জগতে সে বড় সৌভাগ্যবতী। প্রতাপ, আজ সুরোব বিবাহ।"

বাজনা ঘোর বোলে বাজিয়া উঠিল। সুবোর মৃতদেহ সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রায় সিক্ত করিয়া স্নান করান হইল। আলতা, চন্দন, সিন্দুর, পট্টবস্ত্রে ভূষিত করিয়া, চিতায় উঠান হইল। পুরোহিত বাসীবিবাহের মন্ত্র পড়িল, লাজ বর্ষিত হইল। চিতা জ্বলিল। আমার সম্মুখে এতটা হইল, আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না।

* * *

রাত্রি দ্বিপ্রহর, আমি সে দিন ঘুমাই নাই। পৃথিবীতে আর কি আছে? বুক ভাঙ্গিয়া যে শতধা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর দ্বিপ্রহরের কাণ্ডে, নবীন বাবুর সেই পাগলের মত কার্য্যাবলীতে আমি পাগল হইয়া পড়িয়াছি। সংসারে কি আর সুখ আছে? সংসারে কি আর শান্তি আছে? সুরোর মত হৃদয় কি আর এ সংসারে পাওয়া যায়? আমি ভাবিতে ভাবিতে বাটীর বাহিরে আসিলাম। কেহ দেখিতে পাইল না, কেহ ডাকিল না, আমি সংসার পরিত্যাগ করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

কি আর বলিব? কথা ত ফুরাইয়াছে; যে দিনের কথা বলিয়াছি, তার পর আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই আট বৎসরে কত ঘটনা ঘটিয়াছে তোমরা কেহ বিশ্বাস করিবে না। বিশেষ বলিলেও তোমরা পাগল বলিবে, তাই বলিতে চাহি না। বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জীবনের এই আটটা বছর কাটিয়াছে। ইহার শেষে আমি আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

এক দিন রজনীতে একটা গাছে কাপড় দিয়া, ডালের সহিত দেহ

বাঁধিয়া শুইয়াছিলাম। ভোর হয় হয়, এমন সময় দেখিলাম—এক জটাজুটধারী দিব্য জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, ধীর পাদবিক্ষেপে বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইতেছেন। আমি দেহের বন্ধন খুলিলাম। তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, বলিলাম—"প্রভো! আমায় রক্ষা কর, পাপের আগুণে দেহ পুড়িতেছে, আমায় দীক্ষা দাও।

সন্ন্যাসী আমায় উঠাইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বৎস! হৃদয়ের অনুরূপ হৃদয় না পাইয়া, সংসারের পদ চাপে ভীত হইয়া সন্ন্যাসী হইতে আসিয়াছে, সংসার হইতে ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছ, তোমায় দীক্ষা দিব না। যাও বৎস! সংসারে ফিরিয়া যাও, তোমার সংসারের কাজ আজও ফুরায় নাই, বিস্তর কর্ত্তব্য তোমার পড়িয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া যাও, বিবাহ করিও।"

আমি বলিলাম,—"বিবাহ করিব না ভাবিয়াছি, সংসারের মায়া এড়াইতে চাই। কেন প্রভো! আবার সে শিকলি পরিতে বলিতেছেন?"

সন্ন্যাসী নয়ন ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! তোমার মাতা আজও জীবিতা। দুঃখিনীর কত কষ্ট কি একবার ভাবিয়াছ?" আমি চমকিয়া উঠিলাম, হৃদয় চঞ্চল হইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। আমি বাটী ফিরিলাম।

৩০ বৎসর বয়সে বাটী আসিয়া সন্ন্যাসীর উপদেশ মত বিবাহ করিলাম। মাতা বড় সুখী হইলেন। নবীন বাবুর বাটী আর যাই নাই। তাহাদের কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

সুখে আছি, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এ সংসার সংসার বলিয়া বোধ হয় না। সুরোর গহনা ক খানা সাথে আনিয়াছিলাম। যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে এক দিন পরিতে দিয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চোখে জল আসিল।

শ্রীমতী নলিনীবালা সেন।

মহিলা মহিমা।

(১)

কেমনে বুঝা'ব আমি নারীর মহিমা,
অসংখ্য অসংখ্য কবি,
পাইয়ে নারীর ছবি,
গাহিয়াছে কত গান নাহি তার সীমা।

(২)

কি দিয়ে গঠিল বিধি ও রূপ মাধুরী,
কেমনে বর্ণিব তাহা,
ভাবিয়ে না পাই যাহা,
সম্মুখে আসিলে পরে করে মন চুরি।

(৩)

নানারূপে নারীজাতি এ বিশ্বসংসারে,
খেলিতেছে কত খেলা,
ললিত লহরী-লীলা,
সম্পূর্ণতালিকা তার কেবা দিতেপারে।

(৪)

কে বর্ণিবে ইন্দুমুখী ললনার লীলা,
কখন সে শেফালিকা,
কভু ফুটন্ত মল্লিকা,
হেসেহেসেঢলেপড়ে দশদিশিআলা।

(৫)

রূপের প্রভাবে তোর মত্ত বসুন্ধরা,
লো ললনে। লীলাময়ি,
স্বর্গ মর্ত্ত বিশ্ব-জয়ি,
তোমার ও রূপরাশি, প্রাণ মনহরা।

(৬)

ধরাতে উপমা তব কোথায় সুন্দরি,
কি আছে এ অবনীতে,
তোমার তুলনা দিতে?
কবির মানস সরে মরালী মাধুরী।

(৭)

যা'কিছু সুন্দর ধরে ধরা মনোরমা,
ফুল্ল চন্দ্রমার হাসি,
কুসুম সুরভি রাশি,
সকলিতোমায় আছে বিমলিনী বামা।

(৮)

বিশ্বের জননী তুমি আনন্দ রূপিনী
তুমি মাতা জগদ্ধাত্রী,
তুমি গো সন্ধ্যা গায়ত্রী,
অপার মহিমা তব বিশ্ব-বিমোহিনি।

(৯)

যুবার প্রেয়সী তুমি প্রেম কল্পলতা,
যুবা যা'রে হৃদে ধ'রে,
ভুলে আছে এ সংসারে,
হৃদে হৃদি মিশাইবা হর হৃদি-ব্যথা।

(১০)

কনিষ্ঠ ভায়ের তুমি স্নেহের ভগিনী,
কি কব তোমার কথা,
মাতৃহীনে তুমি মাতা,
বুকেবেঁধা শোকে তুমি বিশল্যকরণী।

(১১)

সুমধুর বাল্যকালে সুন্দরী বালিকা,
বিধুমুখে সুধাহাস,
তায় আধ আধ ভাষ,
ধরাধামে স্বর্গচ্যুত, মন্দার কলিকা।

(১২)

মূর্ত্তিমতী প্রেমকণা নয়ন পুতলি,
তুমি বালা খুকুমণি,
আনন্দের ক্ষুদ্র খণি,
ছুটে ছুটে খেলা কর খেলায়ে বিজলি।

(১৩)

তোমার বালিকা খেলা অতি মনোরম,
ফুল্লনবনীত কায়,
অলঙ্কার শোভাপায়,
থেকেথেকে ঢলে পড় ফুলবালা সম।

(১৪)

বযোবৃদ্ধি সহকারে তুমি লো ললনা!
নানামতে কর খেলা,
কৈশোরে কিশোরী লীলা,
কেবাসেইখেলা ছবিআঁকিবেঅঙ্গনা।

(১৫)

কেমনে আঁকিব আমি সেই রূপ ছবি,
কখন চঞ্চলা মেযে
হেসে হেসে যাও ধেয়ে,
কখন গম্ভীরা তুমি হেরে নর কবি।

(১৬)

কি সুন্দর কিশোরীর অপরূপ ভাব,
কভু তুমি কন্যা গৌরী,
কভু বুকে হান ছুরি,
কোমলতা কঠিনতা বিচিত্র স্বভাব।

(১৭)

অতীব কৈশোর ক্রমে আগত যৌবন,
যেন বিকসিত কলি,
ধায় শত শত অলি,
ধরাধাম স্বর্গপুরী নয়ন শোভন।

(১৮)

কে তুমি অপূর্ব্ব সৃষ্টি ওলো কুহকিনি,
কোথা পেলি হেন শোভা,
প্রাণ কাড়া, মনলোভা,
কেরে স্বীয়া শক্তিরূপা মহা মায়াবিনি?

(১৯)

কে আঁকিবে বিধুমুখী যুবতী ললনা,
সুমধ্যা সে নিতম্বিনী,
চন্দ্রিকা চারু-হাসিনী,
লাবণ্য প্রতিমা বালা মরাল গমনা।

(২০)

কাছে নাহিযেতে পারেযুবতী নারীর,
কেমনে নিখুঁত ছবি,
চিত্রিয়ে দেখা'বে কবি,
দূর হ'তে কাড়ে প্রাণ পরাজিত বীর।

(২১)

যা কিছু সংগ্রহ আছে ভাবিনীর ভাব,
দেখি যদি সেই সব,
দিতে পারি অবয়ব,
কবিপদ অনুসরি পূরাই অভাব।

(২২)

নখরে ঠিকরে মরি খণ্ড শশী আভা,
আহা কি চরণ তল,
নিন্দিত রক্ত উৎপল,
অলক্তের চারু রেখা বাড়াইছে প্রভা।

(২৩)

ঝুণু ঝুণু ঝম্ ঝম্ বাজিছে নূপুর,
শুনে মধুময় তান,
প্রমত্ত পথিক প্রাণ,
চমকি' ফিরিয়ে দেখে ধন্য সুরপুর।

(২৪)

থমকি থমকি থির মন্থর গমনা,
রাজ হংসী ভুলে চলে,
যেন গো সরসী জলে,
অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী যুবতী ললনা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সামাজিক সভ্যতা সমালোচনা।

জগতের ইতিহাসে নানা সভ্যজাতি ও সভ্যদেশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরাবৃত্তে ভারতীয় আর্য্যজাতি, গ্রীক্‌জাতি, মিসরজাতি ও চীনজাতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জাতিই অবশ্য সমসময়ে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করে নাই, একের পর অন্যে এই উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, ইহাদের উন্নতি সম্বন্ধে যত মত দ্বৈধই থাকুক, ইহারা যে সভ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত সে বিষয়ে মতভেদ নাই।

এ সকল জাতির পতনের পর রোমজাতির অভ্যুত্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপ মহাদেশই সভ্য বলিয়া কথিত। পূর্ব্বোক্ত সভ্যজাতি-সমূহের ক্রিয়া কার্য্য আচার ব্যবহার পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধান করিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করতঃ স্বীয় মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক

এই "সভ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল সাজসজ্জা বা ফিটফাটে থাকিয়া তাহারা এই উচ্চ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই।

সভ্যতার নানাবিধ-শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সভ্যতা, জাতীয় সভ্যতা শ্রেণীভুক্ত; ইহা ভিন্ন সামাজিক সভ্যতা, সাম্প্রদায়িক সভ্যতা, দেশীয় সভ্যতা প্রভৃতি সভ্যতাব অনেক বিভাগ আছে।

অন্য সকল প্রকার সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে "সামাজিক সভ্যতাব" সমালোচনা করা যাউক। আমাদের এই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সভ্য কে? আর সভ্যতাব লক্ষণই বা কিরূপ? তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

যদি আচার ব্যবহার, সাজ-পোষাক ও চাল-চলন, সভ্যতার স্বভাব হয়, তাহা হইলে এ সমাজে সভ্যতাব প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় সুকঠিন ব্যাপার; কাবণ বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে আহার ব্যবহাব, সাজ-পোষাকেব কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। রুচি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, মতি গতি অনুসারে ও অনুকরণে আহাব ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায। ঐ যে দাড়ি-চস্‌মা-চেনধারী যুবক, নিদার্ঘার্ত্ত কলেবর বহুবিধ বসনে আবৃত করিযা স্বেদসিক্ত বদনমণ্ডল রুমাল দ্বারা মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন, আর পথে পরিচিত সন্দর্শনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ শিরশ্চালন ও অঙ্গনানন্দন-স্বভাব-সুলভ দন্তবিকাসনে আপ্যায়িত কবিতেছেন; উহাকেই কি "সভ্য" বলিব? এবং উহার ওই নবীন নটবর বেশ, ওই সুঠাম সুবঙ্কিম হাব ভাব, হেলন দোলন, আব চাহন বলনকে কি সভ্যতার লক্ষণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যাইব? অথবা ওই যে অনাচ্ছাদিত বিশালবপু ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রধারী পুরুষ উত্তরীয় স্কন্ধে ধীরপদে গমন করিতে-ছেন, আর পথিমধ্যস্থ পরিচিত সকলের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতেছেন, উহাকেই কি সভ্য সংজ্ঞা প্রদান করিব? এই উভয় ব্যক্তিই ত এক সমাজের এক দেশের অন্তর্গত; বল দেখি এ উভয়ের মধ্যে কে সভ্য?

যদি বল এই উভয়ের মধ্যে যাঁহার চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ দশজনের সুরুচিসম্মত, যাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান সুজনের প্রশংসিত, তিনিই সভ্য; তাহা হইলে এই উভয়ই সভ্য পদবী পাইবার উপযুক্ত। কারণ, উভয়েরই চাল-চলন, জ্ঞান বিজ্ঞান দশজনের অনুমোদিত ও সুজনের প্রশংসিত, উভয়েই জ্ঞান বিজ্ঞানে বিলক্ষণ উন্নত; তবে রুচিভেদে উভয়ের মধ্যে এত প্রকৃতি ভেদ, নতুবা ইহার মধ্যে কেহই তোমার আমার চক্ষে 'অসভ্য' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না। বল দেখি ঐ নব্য সভ্য ভদ্র যুবককে তুমি কোন্ সাহসে 'অসভ্য' বলিতে চাও, আর ওই দেবোপম সাধুপুরুষ যিনি দেশীয় প্রাচীন প্রথার বশবর্ত্তী, তাঁহাকেই বা কোন প্রাণে, কোন্ বিজ্ঞানে 'অসভ্য' বর্ব্বর-শ্রেণীভুক্ত করিতে পার? আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম্মের রক্ষক, শাস্ত্রীয় বিধান কর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি অসভ্য হন, তবে জানি না ভারতে সভ্য কে আছে!!!

যখন দেখিতে পাওয়া যায়, এক সমাজের মধ্যেই, এক দেশের মধ্যেই সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ ও মতদ্বৈধ রহিয়াছে, তখন সর্ব্ববাদী সম্মত 'সভ্য' স্থির করা সুকঠিন; আর সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশও সুতরাং গুরুতর ব্যাপার। রুচিভেদে এক সমাজের, এক জাতির মধ্যেও সভ্যতা সম্বন্ধে 'নানামুনির নানামত' দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আমি যাহাকে সভ্য বলিব, হয়ত তোমার মতে সে ঘোর অসভ্য; তাই বলিতেছি, সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ বিষম সমস্যা।

যদি সাজ-সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদেই সভ্যতার সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে হয় নব্য বাবুগণ, না হয় বৃদ্ধপিতামহগণ, অথবা হয় সহুরেগণ, না হয় পল্লীগ্রামবাসিগণ এই উভয়ের মধ্যে এক দলকে অবশ্যই অসভ্য হইতে হইবে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকেও ত অসভ্য বলা যায় না, উভয়েই গণ্যমান্য ও সভ্য ভব্য বলিয়া দশের কাছে সমাদৃত।

পোষাক-পরিচ্ছদের প্রথা ও প্রণালী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের দেশে অতি পুরাকালে যে প্রকার পোষাক ছিল, মুসলমান

রাজত্বে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, আবার ইংরাজ রাজত্বেও ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ সকল প্রথা অনুকরণ সাপেক্ষ; সুতরাং সমাজে সর্ব্বদা একপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ আদরণীয় হইবার নহে। যাঁহারা সাজ-পোষাকে পূর্ব্বরীতি অবলম্বন করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান রীতির বিরুদ্ধ মতাবলম্বী; সুতরাং এক মতাবলম্বীরা অন্য মতাবলম্বীকে অবশ্যই অসভ্য বলিবে: অথবা যিনি কল্য সভ্য ছিলেন, আজ তাঁহাকে অসভ্য হইতে হইবে, আবার যিনি অদ্য সভ্য, হয়ত তিনি গত কল্য অসভ্য ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, সভ্যতা একটী ক্ষণস্থায়ী কথামাত্র। ইহার প্রকৃত লক্ষণ কিছুই নাই।

এই সভ্যতা লইয়া আজ কাল আমাদের সমাজে, পাড়াগাঁয়ে সহরে, নব্যে বৃদ্ধে, নাতিতে ঠাকুরদাদায়, বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণে, নবীনায় প্রবীণায় ও অধ্যাপকে আফিসারে বিষম বিগ্রহ বাধিয়া যাইতেছে— একপক্ষ অন্য পক্ষকে অসভ্য প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন দল যে সভ্য, তাহা স্থির করা কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দেশে সভ্যতার সাবেক লক্ষণ একপ্রকার ছিল, বর্ত্তমানে আর একপ্রকার হইয়াছে। সাবেক সভ্যতা পল্লীগ্রামে আজিও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সভ্যতা বর্ত্তমান সভ্যতার দৃষ্টিতে ঘোর অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা।

চিরপ্রচলিত দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রথা অব্যাহত রাখিয়া, যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'সেকেলে' সভ্য, আর পরের অনুকরণে আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের খিচুড়ী পাকাইয়া যাঁহারা হুজুকের হিড়িকে আত্মহারা হইয়া "রুচিবিকার" আনিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহারাই একেলে বা নব্য সভ্য।

আমরা বিনাদোষে প্রাচীনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের প্রয়াসী নহি। অনুকরণ অবশ্য স্থান বিশেষে অশেষ কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে, তাই বলিয়া অনুকরণের অনুরোধে হাটক দূরে নিক্ষেপ করিয়া

কাচ পাইবার প্রত্যাশায় ধাবিত হইব না। যাহা আমাদের নিজের, যাহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত, যাহা আমাদের মহাপুরুষগণের অনুমত, তাহাই আমাদের আদরের ও যত্নের জিনিষ। আমাদের মহাজনেরা আহারে ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে ও চাল-চলনে যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথকেই আমরা প্রকৃত পন্থা মনে করিব। যিনি যে পরিমাণে সেই পথের পথিক হইতে পারিবেন, যিনি যে পরিমাণে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে "সভ্য" পদবীতে আরোহণ করিবেন। আমাদের এই সভ্যতা অন্যের দৃষ্টিতে বিসদৃশ হইলেও, অন্যে ইহাকে অসভ্যতা, বর্ব্বরতা বলিলেও আমরা আমাদের সমাজে--হিন্দুর দৃষ্টিতে কখনই অসভ্য হইব না।

দেশের জল বায়ু ভেদে আহার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়। যে দেশের যেরূপ দেশাচার, তাহাই সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করাই সভ্যতার লক্ষণ। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্প্রদায় ভেদে, কার্য্যভেদে পরিবর্ত্তিত হয়, এ নিয়ম সকল দেশে সকল সময়েই প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পোষাক, যোগীর পোষাক, গৃহীর পোষাক কখনও একপ্রকার হইবে না। গৃহীর মধ্যেও আবার কার্য্যালয়ের পোষাক, বেড়াইবার পোষাক, শীতকালের পোষাক, গ্রীষ্মকালের পোষাক প্রভৃতি নানা প্রকারে রূপান্তরিত হইবে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। এ সকল পোষাক পরিবর্ত্তনে সভ্যতার সীমা নির্দ্দিষ্ট নহে। যাহা স্বভাবজ তাহাই বজায় রাখাই সভ্যতার অনুমত, আর স্বভাবের বিরুদ্ধে, দেশাচারের বিপরীতে, অপরের অনুকরণে, প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করাই অসভ্যতা।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

এ যে রাক্ষসের প্রাণ!

এ যে রাক্ষসের প্রাণ!

নাই দয়া, নাই মায়া, শীতল সলিল-ছায়া,
শুধু বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—নিত্য রক্তপান!
ক্ষুধিতা শাঁকিনি মত, আগুলি সংসার পথ,
বদন ব্যাদান করি—নাহিক বিরাম!
নিশ্বাসে নিশ্বাসে সরে, কত প্রাণী সে উদরে,
তারি অস্থিপূর্ণ এই—হৃদয়-শ্মশান!
অভিমান, রোষরাগ, তার সে দংশন-দাগ,
রুধির রঞ্জিত ঠোঁটে—কলঙ্ক-নিশান!

এ যে রাক্ষসের প্রাণ!

কে কবে কি চেয়েছিল, কে কবে কি দিয়েছিল,
করিয়াছি চিরদিন অতি তুচ্ছ জ্ঞান!
দয়া মায়া স্নেহ আর, মানবের এ করার,
টুনকো আঁখির ঠার—হাসির মেলান;
চাহিতে অমনি পায়, লাভালাভ কি বা তায়?
বালকের ক্রীড়নক ভেবেছি সে দান!
যখনি হয়েছে খুসী, একটু আধটু তুষি,
ছুঁড়িয়া ফেলেছি শেষে; প্রাণের কি মান!
কি আকাঙ্ক্ষা সাধ বুকে, চেয়ে আছ এই মুখে?
এ শুষ্ক নদীতে আর ডাকিবে না বাণ!
হৃদয় করিয়া খালি, বাকী রক্ত দাও ঢালি,
এ রাক্ষসী পিপাসার হউক নির্ব্বাণ!
নাহি পার—স'রে যাও, মিছে আর কেন চাও,
কাতরতা—আকুলতা—সজলনয়ান
তুলিবে কি খাত?—এ যে রাক্ষসের প্রাণ!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহামায়া

(গল্প।)

(১)

কৃষ্ণধনের স্ত্রী মহামায়াদেবী একবার করিয়া শ্বশুরালয়ে যান, আর একটা করিয়া বিপদ আনিয়া স্বামীর কাছে গচ্ছিত করিয়া দেন। কৃষ্ণধন ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট। হাকিমি করিতে তাহাকে অনেক জেলায় ঘুরিতে হয়। প্রতিবার স্থান পরিবর্ত্তনের সময় তিনি মহামায়া-দেবীকে দেশে রাখিয়া আসেন। তাঁহার যে গ্রামে বাস সে গ্রামের লোক অতিশয় দরিদ্র। কাজেই গ্রামবাসিগণের বিপদ, এক মহামায়ার কল্যাণে নানামূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণধনের উপার্জ্জিত অর্থে হস্তক্ষেপ করে। মোটা মাহিনা পাইয়াও, বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারি-লেন না দেখিয়া, কৃষ্ণধন মহামায়াকে দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কৃষ্ণধন একেবারে দয়াদাক্ষিণ্য-শূন্য ছিলেন না। তবে তাহার দয়াদাক্ষিণ্যের একটা সীমা ছিল। দারিদ্র্য-প্রতিকারে, বিপন্নের সহায়তায়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি আপনার শক্তির অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া, মহামায়ার মত, পরোপকারের জন্য নিজের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতেন না। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; এবং বাল্যকালেই তাহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে আবার যে কেহ দারিদ্র্যের জ্বালাময় দংশনে জর্জ্জরিত হইবে ও তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচনায়, তাহাদের জীবনেতিহাসের মুখবন্ধ রচনা করিবে, এটা তিনি কল্পনায়ও আনিতে সাহস করিতেন না। জীবনযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের সমুদায় দোষ, পূর্ব্বপুরুষের অমিতব্যয়িতার উপর নিক্ষেপ করা বাঙ্গালীর একটা প্রধান স্বভাব—এটাও কৃষ্ণধনের বিশেষ বিদিত ছিল। পুত্রের মঙ্গলচিন্তা পিতামাতার কর্ত্তব্য, কিছুমাত্র সঞ্চয় না রাখা

বর্ত্তমান কালোচিত সভ্যতার অনমুমোদিত—ইত্যাদি নানা উপদেশ-সূত্রে কৃষ্ণধন মহামায়াব হাত বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। দুই চারি দিনের জন্ত কৃতকার্য্যও হইতেন। কিন্তু যেদিন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়া মহামাযা স্বামীর উপদেশটা ভুলিয়া যাইত, সেদিন মহামায়াব ব্যয়-স্রোতে বাণ ডাকিত। কখন বা অনির্ণয়নীয কারণ পরম্পরায়, আন্তঃসলিলিক প্রবাহের স্থায মহামায়ার দান, কৃষ্ণধনের উপার্জ্জনটাকে অন্তঃসাবশূন্ত কবিযা ফেলিত। মাহিনা আনিয়া ঘরে না রাখিতে রাখিতে কৃষ্ণধন শুনিতেন তাহার অর্দ্ধেক খরচ হইয়া গিযাছে। মহামায়ার এই আত্মবিস্মৃতিরোগটা দেশেব জল বায়ুর গুণেই কিছু প্রবল হইত। নিরুপায় কৃষ্ণধন মহামায়াকে দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কিন্তু মহামায়াকে পাঠাইবেন কোথায়? পিতামাতার মৃত্যুর পর মহামায়া পিত্রালযে যাইতে চাহিত না। যদিও বা কখন যাইত, সে সময় কৃষ্ণধনকে সঙ্গে যাইতে হইত। আর সেখানে যাইলেই, যে কয়দিন থাকিতে হইত, সেই কয়দিনই সমযে অসময়ে পিতামাতার উদ্দেশে মহামায়াব করুণক্রন্দনে কৃষ্ণধনের কর্ণের বধিরতা অবশুম্ভাবী হইয়া পড়িত। কৃত্রিম কোপপ্রকাশে মহামায়াকে নিরস্ত করিতে যাইলে বিপরীত ফল হইত। হৃদযেব আবেগগুলা বাহিব হইবার পথ না পাইয়া, শিরায ধমনীতে প্রবৃষ্ট হইয়া একটা না একটা রোগের সৃষ্টি কবিত। তাহার জন্ত যে অস্থিবতা ও অর্থব্যয, তা হইতে মহামাযার মুক্তহস্ততা শতগুণে ভাল। কৃষ্ণধন স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন, স্থির করিলেন।

(২)

সঙ্গে সঙ্গে রাখিযাও কৃষ্ণধনের মহামায়া-ভীতি দুব হইল না। কৃষ্ণধন যখন মেদিনীপুরে, তখন মহামায়া এক নূতন রকমের বিপদ আনিয়া উপস্থিত করিল। একদিন নিমন্ত্রণোপলক্ষে বাটীর বাহির হইয়া মহামায়া অষ্টমবর্ষীয পুত্র শ্যামসুন্দরের একটী ক'নে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকাটী পথে খেলিতেছিল, আর সেই পথ

দিয়া পাল্কী করিয়া মহামায়া নিমন্ত্রণ বাড়ী যাইতেছিল। বালিকার সৌন্দর্য্যে মহামায়ার নয়ন আকৃষ্ট হইল। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই দেখিয়া, তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পাল্কী হইতে নামিয়া মহামায়া কন্যাটীকে কোলে করিল, তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। পাল্কীর ভিতর শ্যামসুন্দর ছিল, তাহাকে বলিল "শ্যামসুন্দর তোর হারগাছটা খুকিকে দে না।" শ্যামসুন্দরের গলায় গার্ডচেন ছিল। সে তৎক্ষণাৎ মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল। হার খুলিয়া বালিকার গলায় পরাইয়া দিল।

মহামায়া কি করিতে আসিয়াছিল ভুলিয়া গেল। বালিকাকে পাল্কীতে তুলিয়া বাটী ফিরিল! কৃষ্ণধনকে দেখাইয়া বলিল, "এই লও, তোমার বউ আনিয়াছি।"

কৃষ্ণধন বালিকাটীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু মহামায়ার বুদ্ধির অস্তিত্বে তাহার বিশেষ সন্দেহ থাকায়, বালিকাকে শুধু দেখিয়াই পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণধন স্বভাব-কুলীন। তাহার পুত্রের বিবাহে নানারূপ বাধাবিপত্তি ছিল। সামাজিক নিয়মানুসারে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ঘরের সহিত বৈবাহিকবন্ধনের বাধ্য-বাধকতায় যে সে ঘরে কুলীনের পুত্র কন্যার আদান প্রদান চলিতে পারে না। কৃষ্ণধন কন্যার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। এই খানেই একটু গোল হইল। মহামায়া কন্যাটীকে সুন্দর দেখিয়াই ধরিয়া আনিয়াছিল। সৌন্দর্য্যই বালিকার পরিচয়। অন্য পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে, এটা মহামায়ার মনেই ছিল না। মহামায়া বালিকার পরিচয় দিতে পারিল না বলিয়া, কিছু অপ্রতিভ হইল। কৃষ্ণধন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিলেন। আর মহামায়াকে আবার নিমন্ত্রণ রাখিতে ও যেখান হইতে কন্যাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে, সেই স্থানেই ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

(৩)

মহামায়ার হৃদয়ে সরলতা ও দয়ার কিছু আধিক্য ছিল। এমন কি আধিক্যটা গর্হিত হইবার সমস্ত লক্ষণই পাইয়াছিল। শুধু কৃষ্ণ-

ধনের সাবধানতায় সেটা বড় একটা অনিষ্ট করিতে পারিত না। অনিষ্টের প্রকোপটা তাহার উপার্জ্জনের উপর দিয়াই চলিয়া যাইত। সেটা কৃষ্ণধনের এক রকম সহিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু এবারে কৃষ্ণধন বিষম ফাঁপরে পড়িলেন।

পুত্র বিবাহ করিয়া বধূরত্নের সহিত কিছু ধনরত্নও শ্বশুর গৃহ হইতে আনিবে, এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল পিতারই আন্তরিক ইচ্ছা। তাহার উপর কৃষ্ণধন বড় কুলীন। কৃষ্ণধন স্থির করিয়াছিলেন, মহামায়ার হাতে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন পুত্রকে কোন ধনীর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, তাহাকে দারিদ্রের হাত হইতে রক্ষা করিব। কিন্তু সে আশাতেও মহামায়া ছাই দিল। মহামায়া বালিকার কুল-গোত্রের সন্ধান লইয়া আবার স্বামীর কাছে উপরোধ করিল। বালিকার পিতা তাহারই আদালতের একজন সামান্য আমলা। সদ্ব্রাহ্মণ ভাল কুলীন ভঙ্গ। কিন্তু বিবাহ হইলেই শ্যামসুন্দরের কুলভঙ্গ হইবে। এমন বিবাহে কেমন করিয়া কৃষ্ণধন সম্মতি দেন! তিনি মহামায়াকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন। পুত্রের শিশুত্ব, বাল্যবিবাহের বিষময়ত্ব, কুলভঙ্গের অপকারিতা, নানাতর্কযুক্তি তিনি মহামায়ার কাছে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সমস্তই মহামায়ার চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তখন নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণধন মহামায়ার ইচ্ছায় আর বাধা দিতে চাহিলেন না। সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থার ও পদমর্য্যাদার অসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মচারীর কন্যাকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। বিবাহের কেবল একটা পাকা দেখার অপেক্ষা ছিল। এমন সময় বালিকাটা নিজের বিবাহের প্রতিবন্ধক হইয়া সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিল। একদিন মহামায়া বালিকার মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনিল। বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। আসিয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিল। খেলিতে খেলিতে কেমন করিয়া যে হতভাগা মেয়ে শ্যামসুন্দরকে রোয়াক হইতে ফেলিয়া দিল যে, সেই পতনেই বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টায় সে মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। লজ্জিতা বালিকার মাতা কন্যা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি বালিকার পিতাও লজ্জায় কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। মহামায়াও আর এই অলক্ষণা কন্যার জন্য কৃষ্ণধনের কাছে একটীও কথা কহিতে পারিল না। মহামায়া ভাবিল, ইহা কুলভঙ্গোদ্যমের কুফলের পূর্ব্বসূচনা। একমাত্র পুত্র শিক্ষিত কৃষ্ণধনও এই আকস্মিক ঘটনায় একটু অশুভ ফলকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িলেন। ঘটনাটা আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে তাঁহার হৃদয়-বলে কুলাইল না। তবে তিনি মহামায়াকে এই সময় দুটা মিষ্টি-তিরস্কার করিবার অবকাশ পাইলেন। বলিলেন,—"সৎকার্য্যই কর, আর অসৎকার্য্যই কর গুরুজনের অনুমতি লইতে হয়। হিন্দুর ঘরের স্ত্রী, স্বামীকে যদি গুরু বলিয়া জান, তবে আর স্বেচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করিও না।"

মহামায়া বলিল,—"এবার হইতে তোমার অনুমতি না লইয়া আর কোনও কার্য্য করিব না।"

কৃষ্ণধনের বেশী দিন মেদিনীপুরে থাকা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লজ্জিত ব্রাহ্মণ আর কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। আদালতে সাক্ষ্যাদির প্রয়োজন হইলে, অন্য লোক দিয়া পাঠাইয়া দিত। ব্রাহ্মণের লজ্জায় কৃষ্ণধন বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া, কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিবার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও যখন তাহাকে কাছে আনিতে পারিলেন না, তখন মেদিনীপুর তাহার কন্টকময় বলিয়া বোধ হইল। শেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া সে মনোভঙ্গের হেতু হইয়াছিলেন, তাহার পূরণ স্বরূপ তাহাকে উচ্চপদে উন্নীত করাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আর মনে মনে স্থির করিলেন, সকল নষ্টের মূল মহামায়াকে আর কখনও বাটীর বাহির হইতে দিব না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কাব্য বিশারদের কারাবাস।

আজ কয়েক বৎসর গত হইল, শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মান-হানী সূচক প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়া ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গনিবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় আদালত কর্ত্তৃক সেই হৃতমান পুনঃ প্রদান ব্যাপদেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; এ ঘটনা বোধ হয়, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। সেই সময়ে আমাদের বিখ্যাত বিখ্যাত সহযোগীগণ হৃতমান পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকাশ্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কিনা? এবং উক্ত প্রকারের পুনঃ প্রাপ্ত মান বাস্তবিকই মান পদ বাচ্য কিনা? এই বিষয় স্থিরীকরণার্থ বহুল প্রবন্ধাদি প্রকাশে অনেক কাগজ, কলম ও সময় নষ্ট করিয়াছিলেন। অনেক দিন এইরূপ ব্যাপারের অভ্যুত্থান না দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম,—'সাধারণ মানই মান—ধর্ম্মাধিকরণ কৃপায় যেটা পুনঃ প্রাপ্ত বলিয়া জানা যায়, সেটা বাস্তবিক মান নহে, একটা বীভৎস বীডম্বনা মাত্র, এবং তাই বুঝি এখন আর লোক সে অপ-মানের প্রত্যাশা করেন না।' আজ আবার সেই পাশ্চাত্য শিক্ষানু-করণ-লব্ধ ব্যাপারের পুনরভিনয় দর্শনে বুঝিলাম—সেই সকল বাক-বিতণ্ডা কালী কলম কাগজ—বাস্তবিকই বিনাকারণে অপব্যয়িত হইয়াছে।

কলিকাতা সিটিকলেজের প্রফেসার মান্যবর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী মৈত্রের ধরিয়া লওয়া মান হানী-কর কুরুচিপূর্ণ কবিতা পত্রস্থ করায় মহামান্য হাইকোর্টের জজ ও জুরীগণের (Unanimous Verdict) একমত বিচারে; মান্যবর হিতবাদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সুবিচারে হউক, আর কুবিচারে হউক, দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ ৯ মাস কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

"হিতবাদী" সম্পাদক কারাগারে প্রেরিত হওয়ায় কুসুমকুমারীর হৃতমান সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত

নহি। যদি হইয়া থাকে ভাল, কিন্তু এই বিষাদের মুখে পড়িয়া আজ যে সকল ঘরের কথা সাধারণ্যে জানাজানি হইয়া গেল, তাহার ব্যবস্থা কি হইল? সকল লোকেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতালোক প্রাপ্ত একথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং কেহ কেহ হয়ত এততেও মান পুনঃ প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছে না, তাহাদের পক্ষে কি? আলোক প্রাপ্ত জনের "মানহানী" আইনের এই গূঢ় রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না, কি করিব দুরদৃষ্ট!! এ ব্যাপারে কেবল আমরা কেন, বাস্তবিক ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন।

"হিতবাদী" সম্পাদকের পক্ষে যাহা হইয়াছে, তাহাতেই বিপক্ষগণ বোধ হয়, সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও যে না হইতেন তাহা বলিতে পারি না। যদি ১ মাস দণ্ড হইত, তাহাতেও তাহাদের যে পরিমাণ মানের জয় জয়কার হইত, ৯ মাসেও তাহাই ফিরিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী কি কমে ফিরে নাই, এজন্য বলিতেছি, হিতবাদী সম্পাদকের যাহা হইবা গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে—আর কেন? এস, সপক্ষ বিপক্ষ সকলে এস, স্ব স্ব উদারতা গুণে আজ মহারাণী ভারতেশ্বরীর ষষ্ঠী বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে সকল সংকল্প অনুষ্ঠিত হইবে, হিতবাদী সম্পাদকের কারামুক্তি যাহাতে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তৎপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করি। এস সাম্য মৈত্রী ভাব মনে জাগাইয়া তুলিয়া স্ব স্ব উদারতা প্রকাশ করি। সহৃদয় বন্ধুগণ, পাঠক-পাঠিকাগণ কেহই যেন এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ না হই। যে দেশের উপকার করে, সাধারণের উপকার করে, সেই পূজ্য; হিতবাদী সম্পাদক আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, এস সেই পূজ্যের জন্য আমরা আজ সোৎসাহে সমবেত হই।

স্বরলিপি।

ইমন্—কাওয়ালী।

কথা—৺রাজকৃষ্ণ রায়। স্বর—শ্রীযুক্ত রামতারণ সান্যাল।

আস্থায়ী।

অন্তরা।
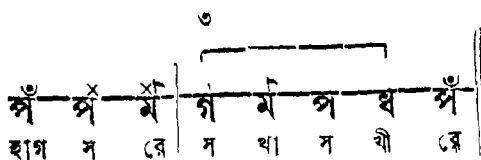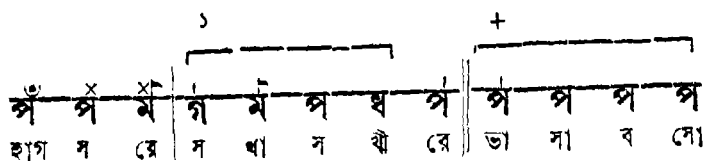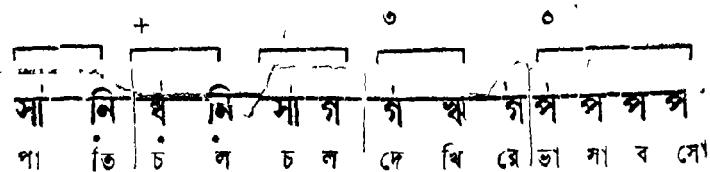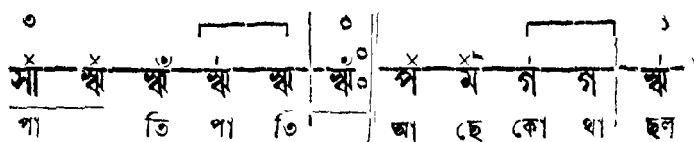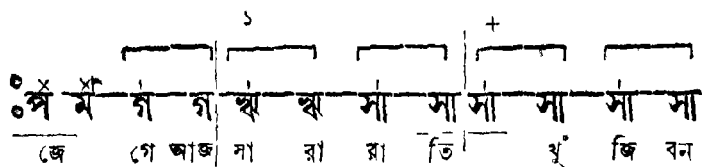
শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

স্বরলিপির গান।

ইমন্—কাওয়ালী।

ওলো ভাঙ্‌ব আজ লুকোচুরি
ধর্‌ব ফকিরে ;
নাগর পড়ে কিনা পড়ে দেখি
নারীর ফিকিরে।
জেগে আজ সারা রাতি, খুঁজি বন পাতি পাতি,
আছে কোথা ছল্ পাতি,
চল চল দেখিরে,—
ভাসাব সোহাগ সরে সখা সখীরে ॥

মতামত।

বঙ্গ-জীবন—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন সম্পাদিত। আমরা এই মাসিকপত্রিকা খানির ২য় ভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা একত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে কতিপয় নূতন ও কতকগুলি পুরাতন লেখক লেখনী চালনা করিতেছেন। আরও দুই এক সংখ্যা না পাইলে বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে মোটের উপর ইহার পরিচালন কার্য্য মন্দ হইতেছে না। আমরা পত্রিকা খানির দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

অমরাবতী এজেন্সি—আজ কয়েক বৎসর হইল, শ্যামবাজার রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে শ্রীযুক্ত চৌধুরী ফ্রেণ্ডস্ কর্ত্তৃক উক্ত এজেন্সি বা সরবরাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা উক্ত এজেন্সি প্রস্তুত ১ শিশি—লাল রবার ষ্ট্যাম্পের কালী, ১ শিশি—অদৃশ্য কালী ও উহা ব্যবহার করিবার একটী পেন নিবযুক্ত কলম ও এক ফায়েল ব্লুব্ল্যাক কালীর পাউডার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা উক্ত কয়েকটী দ্রব্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দ্রব্য কয়েকটী বাস্তবিকই সুন্দর ও সাধারণের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে। মূল্যও সম্ভবত সুলভ বলিয়া বোধ হইল। সাধারণে উক্ত এজেন্সির দ্রব্য একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আনন্দিত হইব।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } চৈত্র, ১৩০৩ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

(৪)

ইহার পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্যামসুন্দর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণধন বহুকালের পর স্ত্রী ও পুত্র লইয়া ছুটি উপলক্ষে দেশে আসিয়াছেন। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া অবধি কৃষ্ণধন আর কোথাও মহামায়াকে যাইতে দিতেন না। বাটীর বাহির হইলেই স্বামীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন—বলিয়া মহামায়াও আর কোথাও যাইতে চাহিত না। এই আট বৎসরে কৃষ্ণধন কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; মহামায়ার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছেন। এই কাগজ ও মাতামহ হইতে প্রাপ্ত, শ্যামসুন্দরের নিজের কিছু ভূসম্পত্তি, দুয়ের আয়ে, তাঁহার অবর্ত্তমানে মহামায়ার ও পুত্রের কোন ক্লেশ থাকিবে না ভাবিয়া, কৃষ্ণধন ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বহু-

দিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার এতটা [illegible] বিশেষ কারণ [illegible]র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া [illegible] তাঁহাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। সে কষ্টের কথা স্মরণ হইলে, জীবনের [illegible]মাধুর্য্যেভরা বাল্যস্মৃতিও তাঁহার মর্ম্মপীড়া আনিয়া উপস্থিত করিত। তাঁহার প্রিয়জনের মধ্যে আর কেহ যে সেই অবস্থায় পড়িবে, এটা তাহার মনে আসিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠিত। তাই তিনি মহামায়ার মুক্তহস্ততায় বড় তুষ্ট ছিলেন না। শুধু স্ত্রী বলিয়া নয়, আর এক বিশেষ কারণে তাহাকে মহামায়ার ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল।

অনাথ আশ্রয়হীন বালক কৃষ্ণধন, মহামায়াব পিতার দয়ায় সংসারে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কাছ হইতেই মহামায়া রূপ স্ত্রীরত্নলাভ করিয়া তাহারই ভাগ্যে সমাজে উচ্চস্থান ও চাকরীতে উচ্চপদ পাইয়াছেন। এই সব ভাবিয়া কৃষ্ণধন মহামায়ার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। মহামায়াব পিতা অনেক উপার্জ্জন করিয়াও বিশেষ বকম কিছু রাখিয়া যাইতে পাবেন নাই। মহামায়াও পিতার গোত্র ধরিয়াছে দেখিয়া তাঁহার রক্ষা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কৃষ্ণধন নিজের হাতে খরচ পত্রের হিসাব রাখিয়াছেন। এখন একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া আটবৎসর পরে, কৃষ্ণধন মহামাযাকে স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিলেন। শ্যামসুন্দরের বড় বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। দুই দিন বাদেই পুত্র পুত্রবধূ লইয়া তাহাকে সংসার রাজত্বের রাণী হইতে হইবে, পুত্রেব জন্য তাহাকে আবার অনেক পরিবারের সংস্পর্শে আসিতে হইবে বুঝিয়া কৃষ্ণধন মহামায়াকে যথেচ্ছা কাজ করিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ মহামায়ার হস্তে দিয়া, এবং উপার্জ্জনেব সমস্ত অর্থ মাসে মাসে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আপনি কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়াছে বলিয়া, গ্রাম সম্পর্কীয়া ঠান্‌দিদি, মাসী, পিসী, ননদিনীরদল মহামায়াকে চারিদিক হইতে

দেখিতে আসিল। কেহ মহামায়ার শরীরে শত চেষ্টা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। "আহা! তোর শরীরে [illegible] কিছুই নাই,"—বলিয়া প্রায় সমস্ত চোখটা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, সেই অন্ন-হীনার মুখের ভাবটা একবার অপাঙ্গে দেখিয়া [illegible] দেখিয়া লইল—মহামায়ার ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না। কেহ "তোর পানে আর চাওয়া যায় না" বলিয়া, দৃষ্টির সমস্ত ভাব মহামায়ার মুখের উপর চাপাইয়া রাখিল। কেহ মহামায়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষীণ হইয়া, 'আর কাহারও সহিত ভাব রাখিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধা, সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল। কেহ কৃষ্ণধনের শরীর রক্ষায় বড় অমনোযোগ দেখিয়া, তাহার নিদ্রাহীনতার কথা মহামায়াকে শুনাইল। আর আফিসের পরি-শ্রমটা দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে কত আক্ষেপ করিল। আর ভাগ্যহীন দগ্ধমুখ সাহেবই যে শান্ত নিরীহ কৃষ্ণধনের এই চাকরী-রূপ দুর্গতির কারণ, তাই তাহাকে অজস্র গালি দিল। কেহবা শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াই তাহার প্রতি মায়ের যত্নহীনতার সমস্ত চিহ্নগুলাই দেখিতে পাইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কেশরুক্ষ, গায়ে ধূলা—মহামায়ার মায়ার নিদর্শন বালকের অঙ্গের কোন স্থানে দেখিতে পাইল না। কাজেই মমতাহীনা মহামায়া তাহার কাছে দুইটা তিরস্কার খাইল। গ্রাম্যকুলকামিনীগণের এইরূপ অযাচিত আদরের ভিতরে পড়িলে, অতি বড় বুদ্ধিমতীও আত্মহারা হইয়া যায়, কিন্তু মহামায়ার এবারে বড় তাহা হইল না। তাহার দুই চারি দিনের ব্যবহারেই প্রতিবাসিনীগণ বুঝিলেন,—'এই আটবৎসরের ভিতরে মাগী কেমন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে।' কেহ কেহ বলিল,—"সাহেব বিবির সঙ্গে থাকিয়া ও তাহাদের ধরণ দেখিয়া মহামায়ার ভিতর হইতে হিন্দুয়ানি লোপ পাইয়াছে। মেজাজ সাহেবী হইয়াছে। লোক দেখান একটা নমস্কার করিতে হয় তাই করিল, প্রাণে আর ভক্তি নাই। নহিলে মাগীর হাত হইতে আর জল গলে না কেন?"

আসল কথা বহুদিন হইতে স্বাধীনতা ভোগের অভ্যাস না থাকায় কর্ত্তৃত্বলাভটায় মহামায়ার কিছু বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। তাহার উপর মহামায়া স্থির করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ করিবে না। কাজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তাহাকে কথায় কথায় স্বামীর কাছে ছুটিতে হইত। ক্রয়ের কথায়, দানের কথায়, লৌকিকতার কথায়, গৃহধর্ম্মের প্রতি কথায় মহামায়া স্বামীর কাছে অনুমতি চাহিতে লাগিল। তাহার অনুমতি গ্রহণের জ্বালায় অস্থির হইয়া, কৃষ্ণধন মহামায়ার হাত হইতে কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার ভয় দেখাইলেন। বলিলেন, "তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে, আমার অনুমতি লইবার অপেক্ষা করিও না।"

মহামায়া এই সময়ে স্বামীকে পথে পাইল, বলিল,—"হিন্দুর ঘরের স্ত্রী—স্বামীর আদেশ পালনই যদি তার ধর্ম্ম, তাহা হইলে মহামায়া স্বামীর কোন আদেশ পালন করিবে?—সেই তখনকার না এখন কার?"

মহামায়ার কথা শুনিয়া কৃষ্ণধনের সেই আটবৎসরের আগের কথা মনে পড়িল। কৃষ্ণধন বলিলেন,—"স্বামী যখন যেমন আদেশ করিবে তাহাই পালন কর, ধর্ম্মে পতিত হইবে না। আগে তোমাকে অনুমতি লইতে আদেশ করিয়াছিলাম, এই আটবৎসর তুমি পালন করিয়া আসিতেছ; এখন আবার অনুমতি লইতে নিষেধ করিতেছি, তুমি অসঙ্কোচে নিষেধ মানিয়া চলিয়া যাও।"

"যদি আবার তোমাকে বিপদে ফেলি?"

"কেন আমাকে কি বিপদে ফেলিতেই শিখিয়াছ! তুমি যা ইচ্ছা কর। তার জন্য যদি বিপদেই পড়ি, তোমাকে তিরস্কার খাইতে হইবে না। আমার বিশ্বাস স্বামীগতপ্রাণা মহামায়া যদি স্বামীর আদেশে বিপদও ডাকিয়া আনে, তাহাতে কৃষ্ণধনের শুভ ভিন্ন অশুভ হইবে না।"

মহামায়া। দেখ এখনও বুঝিয়া বল।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াই বলিয়াছি।

স্বামীর এই শেষ কথাটায় মহামায়ার বড় সাহস হইল। সে আর কোনও উত্তর না দিয়া স্বামীকে একটী গড় করিল।

কৃষ্ণধন ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার যখন কোম্পানীর কাগজ হইয়াছে, তখন নগদ টাকা সব উড়াইয়া দিলেও খাইবার পরিবার কষ্ট হইবে না। মহামায়াও ভাবিয়াছিল, স্বামী যত কেন বলুক না, যখনই একটু গোলমাল ঠেকিবে, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার মনে যা' খুসী তাই করিয়া মহামায়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছে।

সভ্যপাঠকারিণীর চক্ষে এ স্থানটায় কেমন কেমন ঠেকিতে পারে। কিন্তু কি করিব? এক একটা স্ত্রীলোকের সেই সেকালের নয়, এই একালের কেমন একটা স্বভাব যে, সুবিধা পাইলেই কর্ত্তাটীকে একটী আধটী প্রণাম করিয়া বসে, নানারকম পড়িয়া ভালবাসার সাম্যভাবটা বিশেষ করিয়া বুঝিয়াও তাহাদের জ্ঞান জন্মে না। পাঁচ জনের দেখিয়া শুনিয়াও তাহারা শিখিতে পারে না। স্বামী-বেচারীর তাহাতে বড় বিশেষ লাভ নাই, বরং সমানে সমান হইলে, প্রাণপ্রতিমার আদর আবাদারে দুই একটা তর্ক বিতর্ক চলিতে পারে। কিন্তু ওই একটী আধটী প্রণামের নেশায় পড়িয়া তাহাকে বিষম দায়ে ঠেকিতে হয়। জেলার বড় হুজুরের, জমীদার বেচারাদের নিকট প্রার্থনাটা যেমন আদেশের পিতামহী, দেখিতে বুদ্ধিহীনা, কিন্তু কার্য্যতঃ সুচতুরা নীতিজ্ঞার বেলায়ও ঠিক তাই। স্বামীর সহিত সমান পদবীরূঢ়া কোন পাঠিকা ঠাকুরাণী, আজও পর্য্যন্ত যদি জীবনের সঙ্গীটীর নিকট হইতে সমস্ত প্রাপ্য-গণ্ডা আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভুকে এই প্রণাম ঔষধটা একবার সেবন করিয়া দেখিবেন। বকেয়া বাকী শুদ্ধ আদায় হইয়া আসিবে। স্বামীটী ষোলআনা রকমেই আয়ত্তাধীনে আসিবে। তবে সেটী করিতে হইলে, আগে আত্মাভি-মানটী ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু হায়! এখন এত অগ্রসর হইয়া

তাও কি কখন করা যায়। অভিমান ত্যাগ!—তৎপরিবর্ত্তে হে স্বামীন্! তোমাকে শ্রীকৃষ্ণার্পণমাত্র করিলাম।

মহামায়ার অভিমান রাখিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কৃষ্ণধন কোন্ দেশে বাস করিত,—সে হট্টমালার দেশের গাই বাছুরে মাটী চষিত, কি লোকে হীরার ছাইয়ে দাঁত ঘসিত, কি প্রতি গৃহস্থের ঘরে রুইমাছ ও পটোল ভারে ভারে আসিত, মহামায়া কিছুই জানিত না। এমন সময়ে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শুদ্ধ তাই নয়, তাহার পিতৃগৃহ হইতেই কৃষ্ণধন মানুষ হইল, তাহার আদরের অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইল। হট্টমালার দেশ, তাহারই পিত্রালয়েব প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থানেই রাজত্ব কবিতে লাগিল। এমন কৃষ্ণধনের উপর এক আধ দিন আদেশ করিবার, কিম্বা একটু আধটু অভিমান দেখাইবারও কি অধিকার মহামায়ার ছিল না?—অধিকার সম্পূর্ণই ছিল। আর সে অধিকার দেখাইলে, কৃষ্ণধন সহিতে পাবিত কিনা কে বলিতে পারে? দারিদ্র্যনিপীড়িত, পরান্নভোজী, পবাবসথশায়ীর আবার গর্ব্ব কি? গৃহজামাতাব সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও কৃষ্ণধন মহামায়ার পিতার কাছে এক দিবসের জন্যও অনাদবপ্রাপ্ত হয়েন নাই। সেই সে কালের ব্রাহ্মণ, কুলীন জামাতার মর্য্যাদা রাখিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। মহামায়াকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন, যে আজও পর্য্যন্ত মহামায়া স্বামীর উপর অভিমান করিতে শিখিল না। মহামায়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পৈত্রিকধনে তাহার কি অধিকার ছিল। দুই এক পয়সা খরচ করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই কৃষ্ণধনের মুখ চাহিয়াই থাকিতে হইত। বাপের কাছে চাহিলে পাইত না। কিন্তু বুঝিতে পারিত না, কৃষ্ণধন কোথা হইতে পয়সা পাইত। মহামায়া শ্বশুরালয়ে আসিবার জন্য কৃষ্ণধনকে অনুরোধ করিত, বিশ্বাস ছিল সেখানে যাইলেই মনের মত খবচ করিতে পারিবে। কিন্তু জানিত না যে, সে হট্টমালার দেশে, স্বামীর এমন একটী তরুতলও নাই যে,

ক্রমশ বাপদেশে মুহূর্তের জন্যও রৌদ্রের আক্রমণ হইতে মাথাটাকে রক্ষা করিতে পারে। মহামায়ার পিতা কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃষ্ণধনের গ্রামে একটী ছোট অথচ সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এবং দৌহিত্র শ্যামসুন্দরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে গ্রামের সমস্ত লোককে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া দেন। মহামায়া সেই প্রথম শ্বশুর গৃহে আসিল। আসিয়া দিন কয়েক মনের মত খরচ করিয়া বাঁচিল। আর বুঝিল, এমন শ্বশুরঘর থাকিতে এতকাল বাপের বাড়ী পড়িয়াছিলাম কেন?—মহামায়া বাপের বাড়ী আর বড় একটা যাইতে চাহিত না। তাহাতে মহামায়ার পিতা মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। কালে যখন মহামায়া স্বামীর অবস্থার কথা সমস্তই জানিতে পারিল, তখন তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভক্তি গাঁথিয়া গিয়াছে।

কাজেই নব্যাপাঠিকা ঠাকুরাণীদের কাছে হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া, মহামায়া স্বামীকে ঢিপ করিয়া একটী নমস্কার করিয়া বসিল। উঠিয়া বলিল,—"যেমন তুমি আমাকে আমার অনিচ্ছায় স্বাধীনতা করিলে, আমিও তেমনি জব্দ করিয়া তোমাকে প্রতিশোধ দিব। তোমার সব টাকা খরচ করিব, তবে ছাড়িব।"

মনে মনে বলিল, তুমি যেমন কৃপণ, আমি তার শতগুণ কৃপণতা দেখাইব। তোমাকে ধানে চালে খাওয়াইব। কৃষ্ণধনের প্রাণটা নমস্কারে খুলিয়া গেল। কৃষ্ণধন আবার বলিলেন, "শুধু তাই কেন মহামায়া, এতকাল তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছি, আজ হইতে সেই কর্ত্তৃত্বভাব তোমার উপরে দিলাম। আজ হইতে আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম।"

(৫)

মাস খানেক মহামায়া চূড়ান্ত গৃহিণীপণা দেখাইল। মহামায়ার হাত হইতে যথার্থই জল গলিল না। প্রতিবেশিনীগণ, যাহারা মহামায়ার মুখ দেখিত, তাহার মুখের দুটী কথা শুনিতে সকল কাজ ফেলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিত, তাহারা এখন

মহামায়ার মুখ দেখিয়া অন্নাভাবের আশঙ্কা করিতে লাগিল। কথায় কর্কশতা অনুভব করিল। ক্রমে তাহারা মহামায়ার কাছে আসা বন্ধ করিল। তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইল না, তখন একত্র বসিয়া মহামায়ার স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা আরম্ভ করিল।

বর্ত্তমান কৃপণতায় সকলেই প্রথমে দুঃখ করিল। দুঃখ ক্রমে রাগে পরিণত হইতে লাগিল। রাগ হইতে গালি আসিল। সকলে একবাক্যে বর্ত্তমান মহামায়ার মুখে অগ্নিদেবের আবাহন করিল। আর তাহারা যে মহামায়ার কাছে যাইয়া তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্যের প্রতিষ্ঠা করিত, এটাও পরস্পরকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চরণধূলি স্পর্শ করিয়া কত রাজনন্দিনী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়াছিল ও তাহাদিগের আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া, নিজ নিজ পর্ণকুটীরে ফিরিয়া তাহারা নিস্পৃহতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, এটাও রমণী-কুলমধ্যে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। মহামায়া এখন এমন হইয়াছে, মহামায়া আগেই বা কি ছিল। বর্ত্তমান মহা-মায়াকে ছাড়িয়া তাহারা অতীত মহামায়াকে ধরিয়া বসিল। ক্রমে তাহারও মুণ্ডপাত করিল। শেষে তাহার রূপের, গুণের, স্বভাবের, বংশের অসংখ্য অসংখ্য দোষ বাহির করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। সেই মহিলাকুলমধ্যে দুই একজনের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ছিল। এক মহামায়ার কল্যাণে তাহাদের সেই পূর্ব্ব বিবাদ মিটিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বিলাসিনীর আত্মবিলাপ।

১

বিলাসিনী মোর নাম হৃদয় শ্মশান,
বিলাস-কলুষ-বিষ হৃদে পায় স্থান;
কলিজা ভেঙ্গেছে মোর,
ঝরে সদা আঁখি লোর,
তথাপি আছে গো বক্ষে বেঁধেছি পরাণ।

২

সিঁথিতে সিন্দূরবিন্দু করেতে কঙ্কন,
কিসের অভাব মোর পরেছি ভূষণ;
তীব্র করালের রেখা,
দিয়াছে আননে দেখা,
তথাপি নূতন রাগে রঞ্জিত আনন।

৩

নিত্যনবসাজে সাজি ফুলদিগো মাথে,
প্রাণতসাজেনামোর তাবসাথেসাথে;
নলিনাক্ষ আর নাই,
তথাপি কটাক্ষ চাই,
সোহাগের সোহাগিনী-তবুপথেপথে।

৪

ছিলাম রমণী আমি স্বভাব সুন্দরী,
আজি হেয়, ঘৃণ্য অমি নাম বারনারী,
নাহি মৃদু মৃদু হাসি,
যা দেখ এ বাসিহাসি,
জাগরণে হরে প্রাণ নিত্যবিভাবরী।

৫

মধু আশে আসে কাছে মত্তমধুকর,
মনে করে আমি বুঝি মধুব আকর,
মধুচক্র ভেঙ্গে গেছে,
ছলমাত্র তার আছে,
ফিরে যাও মধুলোভী মধুপনিকর!

৬

কেহআসেপ্রেমআশেকোথা'দরশন,
হে প্রেম! অনন্তমৃত-সঞ্জীবনী-ধন!
হৃদে মোর নাহি যাহা,
কেমনে প্রদানি তাহা?
ফিরেযাও স্থানান্তরে প্রেমিকসুজন!

৭

প্রাণপতি সহবাসে প্রাণের নন্দন,
অঙ্কেতে পাইয়া বালা পুলকিতমন;
কি কঠিন মম হিয়া,
দেখ মনে বিচারিয়া,
জননী হইয়ে বধি সন্তানে আপন!

৮

আছে কি গো মমসম পিশাচীললনা;
ধাতার এধরা-মাঝেদিতে গো তুলনা?
প্রেমিক রে ফিরে যাও,
পাতকীরে ভুলে যাও,
মায়াবিনী ছদ্মবেশা রাক্ষসী ভীষণা।

৯

হে কুলকামিনী শুন মোর নিবেদন,
পতিব্রতা সতী সাধ্বী সীমন্তিনীগণ;
ভালবেসো প্রাণনাথে,
রবে সদা সাথে সাথে,
দেখোজেনোনাহিকাড়েপ্রাণেররতন।

১০

হে যৌবন উদ্বেলিত ভাসমান জন,
উচ্ছিষ্টরূপের মোহে ভুলনা কথন;
ঘরেতে পাইবে যাহা,
কোথায় নাহিক তাহা,
পবিত্র প্রেমের খনি অঙ্গনা আপন।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

চিন্তা।

স্নায়ু বিধানের ক্রিয়াকে "চিন্তা" বলা হয়। স্নায়ু আমাদের দেহস্থ দ্রব্য বিশেষ,—কিন্তু উহার ক্রিয়া বা খেলা দেহস্থ দ্রব্য নহে; এই জন্য চিন্তা আমাদের বাহিরের দ্রব্য।

উদ্ভিজ্জ বিদ্যা দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, ফুল যে দ্রব্যের উপর উপবিষ্ট থাকে, তাহাকে "বৃত্তি" বলে, পুষ্পের নিম্নে যে অংশটুকু তাহাকেই বৃত্তি কহে। আমাদের মন যে অংশের উপর অবস্থিতি করে, তাহাকেও আমরা "বৃত্তি" বলিয়া থাকি। এখন দেখা যাউক, মন আমাদের কোন বৃত্তির উপর অবস্থিতি করে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই পাঁচটী আমাদের মনের মূলবৃত্তি। অর্থাৎ জগতের সমুদয় মানবের মন এই পাঁচ বৃত্তির উপর অবস্থিত। যে যাহা "বলে" তাহা এই পাঁচ বৃত্তির রংঙ্গে বলিয়া থাকে। ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যে মূলা খায়; তাহার মূলার ঢেকুর উঠে।" বস্তুতঃ ঐ পাঁচটী বৃত্তির তারতম্যানুসারে যাহার হৃদয়ে যে বৃত্তির খেলা অধিক হইয়া থাকে, সে সেই বৃত্তি অনুসারেই কথা বলিয়া থাকে। মানুষ বৃত্তি ছাড়িয়া

কথা বলিতে পারে না! যাহার বৃত্তি নাই, সে জগতেও নাই, সে মরা! এই জন্যই সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়া গিয়াছেন,—"বৃত্তির নাশকেই মরণ বলে।"

মানুষের বৃত্তি একটা! সেই বৃত্তির নাম "চিন্তা" বা ভগবান অথবা চিন্তামণি! তবে পাঁচটা বৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলিলাম কেন? তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। যদি আমাদেব পাঁচটী বৃত্তিব উপর মন বহিল, তাহা হইলে, আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। ঐ পাঁচটী বৃত্তি ছাড়া, এমন একটী মনের অবস্থা আছে যে, সেই অবস্থাকেই ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। যেমন সাতটী রংঙ্গের উৎপত্তি স্থান সাদা! সেইরূপ আমাদের ঐ পঞ্চবৃত্তির উৎপত্তি স্থান সাদা! অথবা উদ্ভিজ্জ জগতের দিকে দৃষ্ট করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, পুষ্প যে বৃত্তির উপর অবস্থিতি করে, তাহার কোনটী পঞ্চভাগে বিভক্ত, কোনটী দুইভাগে কিম্বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত; কোনটী বা অখণ্ড! যেমন গোলাপ পুষ্পের বৃত্তি কতকগুলি চির দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু ধুতুরা ফুলের বৃত্তির চির নাই, উহা অখণ্ড! এই অখণ্ড বৃত্তি বলিয়াছি, এই পুষ্প আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় বস্তু। যাহা হউক, গোলাপ ফুলের বৃত্তি ৪।৫ খণ্ডে বিভক্ত হইলেও উহা যে একটী বৃত্তি ভিতর হইতে চিরিয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়, সেইরূপ আমাদের মনের পাঁচটী বৃত্তি এক অদ্বিতীয় মনের ৪।৫ টী চিরমাত্র।

সাদা রং হইতে সাতটী মূল রং পাওয়া যায়, তাহার মিশ্রণের তারতম্য, অর্থাৎ ভাগের ইতব বিশেষ করিয়া মিশাইলে, তাহা দ্বারা নানাবিধ নূতন নূতন বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই নূতন নূতন মিশ্রিত বর্ণকে উপবর্ণ বলা যাইতে পাবে। সেইরূপ আমাদের পাঁচটী মূল বৃত্তির মিশ্রণে নানাবিধ নূতন নূতন বৃত্তি হইয়াছে, এই মিশ্রিত বৃত্তিকে "প্রবৃত্তি" বা উপবৃত্তি বলা যাইতে পারে। যেমন ২ ভাগ ক্রোধ এবং ২ ভাগ মোহ (মোহ

অর্থে মায়া বা স্নেহ) মিশ্রিত করিলে, "তিরস্কার" নামক উপবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সদ তিরস্কারের ভিতর "ক্রোধ এবং মোহ" বৃত্তির মিশ্রণই দেখিতে পাওয়া যায়।

"দয়া" ইহা একটী মানুষের উপবৃত্তি বা প্রবৃত্তি, ইহার ভিতর মোহ (মোহ অর্থে স্নেহ বা ভালবাসা) ৩ ভাগ, বিশুদ্ধ কাম (কাম অর্থে কর্ম্ম বা ধর্ম্ম) ১ ভাগ, পাওয়া গিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে প্রবৃত্তিগুলির ভিতর ইচ্ছা করিলে মূলবৃত্তিব বিকাশ সকলেই দেখিতে পাইবেন।

বৃত্তিগুলিব মিশ্রণের তারতম্যে একটী একটী মূলবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক মূলবৃত্তিগুলি নানাবিধ আকার ধারণ কবিয়াছে। বিশেষতঃ দেশ কাল পাত্রানুসারে এক মূলবৃত্তি কোথাও স্নিগ্ধভাব, কোথাও মধুরভাব, কোথাও ভক্তিভাবে দেখা গিয়া থাকে। সূর্য্য যখন উদয় হয়, তখন তাঁহাব কিবণ বড়ই স্নিগ্ধ—বড়ই সুন্দর! আবার ঐ সূর্য্য যখন দেশ কালানুসারে মধ্য গগনে উপস্থিত হয়েন, তখন সেই এক অদ্বিতীয় সূর্য্যকিবণেব উগ্রমূর্ত্তি হইয়া থাকে। যদি বল "কাছে" এবং "দূরে" বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যখন দূবে থাকে, তখন তাহাব স্নিগ্ধমূর্ত্তি; এবং পৃথিবী যখন তাহাব নিকটে যায়, তখন সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে বেশী পড়ে বলিয়া, তাহার উগ্রমূর্ত্তি। ইহা বলিলেও আমরা এক অদ্বিতীয় সূর্য্যকিবণ যে দেশ কাল পাত্রানুসাবে দুইভাবে উপলব্ধি কবি, ইহা সত্য! "উগ্র" এবং "অনউগ্র" ভাব যে সূর্য্যকিরণে আছে, তাহা নিশ্চয়ই। তেমনি এক মূলবৃত্তি ধরুন,—"মোহ" মোহ অর্থে ভ্রম; ভ্রম অর্থে ভুল বা মায়া, মায়া অর্থে স্নেহ, স্নেহ অর্থে ভালবাসা; এই ভালবাসা বা মোহ বৃত্তিটী দেশ কাল পাত্রানুসারে কিরূপ মূর্ত্তিধাবণ করে দেখুন।

সন্তানের উপর ভালবাসা আছে, সে ভালবাসার নাম স্নেহ; পিতাব উপর যে ভালবাসা তাহার নাম ভক্তি, স্ত্রীর উপর যে ভালবাসা তাহার নাম প্রেম বা পিরিত, স্নেহ, ভক্তি এবং প্রেম

এক অদ্বিতীয় মোহবৃত্তি অর্থাৎ ভালবাসা হইতে হইলেও উহাদের মূর্ত্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ঐ সকল মূর্ত্তির ভিতর কোথাও ভয় মিশ্রিত, —ভালবাসা, কোথাও করুণা মিশ্রিত ভালবাসা, কোথাও বিনিময় ভালবাসা ইত্যাদি মিশ্রিত ভাবে থাকে বলিয়া ঐগুলিকে "প্রবৃত্তি" বলা যাইতে পাবে। বিনিময়ের ভালবাসাকেই "স্বার্থ" প্রবৃত্তি কহে। জগৎ বিনিময়েব ভালবাসাতেই চলিতেছে। অতএব এখানে স্বার্থ শূন্য জীব নাই।

(ক) বৃত্তি প্রবৃত্তি ছাড়িয়া মানুষ যেমন কথা কহিতে পারে না, সেইরূপ স্বার্থ ছাড়িয়া, মানুষ কার্য্য করিতে পারে না। পিতা মাতা স্বার্থের জন্য পুত্রপালন করে; গৃহস্থেরা স্বার্থের জন্য বিড়াল পুষে,—পাখি পুষে,—কুকুর পুষে; সেইরূপ স্বার্থের জন্য পিতা মাতায় সন্তান পুষিয়া থাকে। মাষ্টার স্বার্থের জন্য ছেলে পড়ায়! রাখালেরা স্বার্থের জন্য গরু মাঠে লইয়া যায়। অনেকের পিতা বিবাহের সময় ছেলের দর বাড়িবে বলিয়া, ছেলেকে পাস করাইয়া থাকে। অর্থাৎ ছেলের গা'য়ে বিদ্যার মার্কা মারিয়া দেন। যাহারা মার্কা দেখিয়া মন্দ জিনিষও ভাল বলিয়া লয়েন, তাঁহারাই "মার্কা" মারা বিদ্যা ভালবাসেন। মার্কা মারা বিদ্যাই হইল অসভ্যতারূপ প্রবৃত্তির জীবন।

"ক" চিহ্নিত প্যারাটীর মধ্যে যে কথা বলিলাম ঐ কথা-গুলির ভিতর "আমার" কোন বৃত্তি বা প্রবৃত্তি লুকাইত আছে, বাছিয়া বাহির করুন! উদাহরণের জন্য ঐ প্যারাটী দেওয়া হইল।

যাহা হউক, বৃত্তি প্রবৃত্তির তারতম্য যেমন এক ভালবাসার নানামূর্ত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের সমুদয় বৃত্তি প্রবৃত্তি একরূপ নহে,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যেমন স্বার্থমিশ্রিত দয়া; প্রেমমিশ্রিত দয়া, ইত্যাদি নানাবিধ দয়ার অবস্থা আছে। এই বিভিন্ন অবস্থা-গুলি এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইরূপ এক "সত্যের" নানাবস্থা! সূর্য্যকিরণ স্নিগ্ধ ইহা সত্য, এবং উহা "উগ্র" ইহাও সত্য। মদ খাইয়া লোকে যথাসর্ব্বস্ব

নষ্ট করিতেছে, ইহা সত্য; আবার মদের দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষা হইতেছে, ইহাও সত্য! এখানে বেশ বোধ হইতেছে যে, দুই অবস্থার দুইটী পৃথক পৃথক সত্য! বিকারে রোগীকে মদের দ্বারা নাড়ী রক্ষা করান হয়,—অতএব তখন সে মদের উপর নির্ভর করিয়াই জীবিত থাকে; ইহা সত্য! আবার মদে নির্ভর করিয়া, অনেকে দরিদ্র হয়, ইহাও সত্য। কিন্তু এই দ্বিবিধ সত্যের ব্যবহার শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, আমরা সত্য দ্বিবিধ হউক, আর দশবিধ হউক, আমরা তখন এক অদ্বিতীয় সত্যে উপনীত হইব।

চিন্তার বুঝিলাম কি? কিছুই না। নদীর দুইদিকে কূল মধ্যে জল। কিন্তু চিন্তার মধ্যে একটু কূল,—আর দুইদিক ফাঁকা, কূল নাই,—অকূল। চিন্তা করিতে করিতে যে স্থানে একটু দাঁড়াই, একটু বিশ্রাম করি, সেই টুকুর চিন্তার কূল,—সেই টুকুর নাম বিশ্বাস!

পদার্থ কি? ইহা লইয়া যদি আমরা চিন্তা করি, তাহা হইলে, কেহ বলিবে, "শব্দবাচ্য" যাহা, তাহাকেই পদার্থ বলে; আচ্ছা, অশ্বডিম্ব তাহা হইলে কোন পদার্থ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিল, তাহা নহে, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই পদার্থ। আর এক জন বলিল "তাহা হইলে মনটী কোন পদার্থ? উহাকে ত ইন্দ্রিয়েরা উপলব্ধি করিতে পারে না। অথবা যে উপলব্ধি করে সে তাহা হইলে কি?" আর একজন বলিল "পদের অর্থকে" পদার্থ বলে। তাহা হইলে, "আকাশ কুসুম" পদের অর্থ কি? কিছুই না। অতএব উহা "কিছুই না" পদার্থ! এইরূপ বার কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া, বার কতক "তা'রপর" "তা'রপর" করিয়া চিন্তা এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, যে সে কূল ছাড়িয়া অকূলে মিশাইল; মানুষও চুপ করিল। কিন্তু ঐরূপ কূলহীন মীমাংসা করিলে, বোধ হয় জগতের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। বিশ্বাস করিয়া, পদার্থ লইয়া তাহার গুণধর্ম্ম ইত্যাদি

দেখিয়া, মানুষ তাহা দ্বারা অভাবনীয় উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। চিন্তা খানিক দূর তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, এমন স্থানে তোমাকে ফেলিয়া দিবে যে, সে স্থানে সে আর নিজে যাইবে না। "তুমি তখন মথুরায়! আর তিনি তখন গোকুলে!" ঠাকুরের কাণ্ডই এই। সঙ্গে করিয়া সংসারে আনিয়া, এইরূপ ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

জগতের ভিতর থাকিয়া জগতকে চিনিতে পারি নাই। চিন্তার ক্রোড়ে মানুষ হইয়াও চিন্তাকে বুঝিতে পারি নাই। আর, মনের সঙ্গে থাকিয়াও, মনকে পাই নাই। জগতে ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

চিন্তা, সুখ দুঃখের মাতা! সুখ দুঃখ আর কিছুই নহে; চিন্তার একদিগের নাম সুখ, অপরদিকের নাম দুঃখ। যেমন সময়ের একপৃষ্ঠা আলোক বা দিবা এবং অপর পৃষ্ঠা আঁধার বা রাত্রি। সেইরূপ চিন্তার এক পৃষ্ঠার নাম সুখ! পর পৃষ্ঠার নাম দুঃখ। যাহার যেমন চিন্তা, তাহার সেইরূপ সুখ দুঃখ! চিন্তাকে ভাল রাখ, সুখে দুঃখে ভাল থাকিবে। দয়াময় রামকৃষ্ণ। আমাদের চিন্তাকে ভাল কর। "শুদ্ধচিন্তা" দাও। প্রভো। এই প্রার্থনা আমরা করিতেছি;

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

২৫

রম্ভোরু রমণী মরি গুরু নিতম্বিনী!
কনক মেখলমালা,
কটিদেশে করে খেলা,
নড়ে চড়ে ঝলসিছে যেন সৌদামিনী!

নাভিদেশে নাভিপদ্ম আহা কি সুন্দর!
ছড়ায়ে পাপ্ড়িগুলি,
যেন ফোটে ফুলকলি,
অলিছোটে ভ্রমে পড়ে মরি মনোহর।

২৭

পৃষ্ঠদেশে লম্বমান কাল-ভুজঙ্গিনী,
ধাইছে লম্বিত বেণী,
চুম্বিতে চরণ খনি,
অথবা বিবর খোঁজে ভূমেতে ফণিনী।

২৮

রমণীর হৃদিভাব হৃদে না কুলায়,
বুক খানা ফুলে ওঠে,
যেন যুগ্ম তুবড়ি ফোটে,
ধরণীর হৃদিমাঝে যেন হিমালয়!

২৯

ঝর্ ঝর্ নির্ঝরিণী অনন্ত ধারায়,
ঢালিতেছে পয়োধারা,
জীবনাম্বু, ক্ষীরধারা,
পরিতৃপ্ত জীবগণ যাহে গো তৃষ্ণায়।

৩০

অথবা পূর্ণিমা দিনে অনন্ত জলধি,
কেঁপে ওঠে অম্বুরাশি,
ছুটে যায় দশদিশি,
উর্দ্ধরা করিছে ধরা বিপুলাবারিধি!

৩১

মরি মরি হে রমণি! এত ক্ষীররাশি,
কোথায় পাইলে তুমি,
পরিতৃপ্ত বিশ্বভূমি,
মূঢ় আমি গুণগান কেমনে প্রকাশি?

৩২

কে ঢালিল ক্ষীরধারা তব হৃদিমাঝে,
বুঝেছি বুঝেছি বালা,
কা'র এই মহাখেলা,
ক্ষীর-সিন্ধু-শায়ী যিনি অনন্তে বিরাজে!

৩৩

দাও হে করুণাসিন্ধু! ক্ষমতা আমায়,
বর্ণিতে সুন্দর সৃষ্টি,
থাকে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
পারি যেন সাজাইতে লাবণ্য-বালায়।

৩৪ [পাশে ?

রমণি রে! কেনা বদ্ধ তো'র বাহু
সুকোমল বাহুলতা,
হবে নর হৃদি ব্যথা,
ধরায় সকলি ব্যগ্র তো'র পাণি আশে।

৩৫

যখন বিবাহে নর ধরে পাণিতল,
পরশে অঙ্গুলিগুলি,
ছোট বড় চাঁপাকলি,
তুচ্ছ তা'র এ সংসার যা'ক রসাতল।

৩৬

কিবা কম্বুকণ্ঠে মরি দোলে মণিমালা!
হৃদি ফল ঢল ঢল,
তা'য় শোভে মুক্তাফল,
বিশ্ববিমোহিনী মরি যৌবনের খেলা।

৩৭ [আলিঙ্গিতে,

কা'র না আছে গো সাধ তো'রে
তো'রে যদি হৃদে পায়,
স্বর্গ-সুখ ভুলে যায়,
যুড়া'বার তুই মাত্র স্থল অবনীতে।

৩৮ [ছবি?

কেমনে চিত্রিব আমি তো'র মুখ
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
সে উপমা কোথা' রাজে?
তুমিই উপমা তব এ জগতে দেবি!

৩৯

কবির কবিতা তব খুঁতি মনোহর,
তদুপরি ওষ্ঠাধর,
লালে লাল সে অধর,
বঙ্কিম তাম্বুল রাগে ভুলে আছে নর!

৪০ [ধরে,

ফুল্ল কপোলের আভা বাক্যে নাহি
লাবণ্য উথলে যায়,
ফুল্ল গোলাপের প্রায়,
অথবা নলিনী যেন কবি হৃদি সরে!

৪১

সুন্দর নাসায় দোলে শুভ্র মুক্তাফল,
আরক্ত হয়েছে হায়,
কপোলের সু-আভায়,
গোলাপ কলিকা যেন করে ঢলঢল!

৪২

দোদুল অলকা চুল সমীরণ ভরে,
থেকে থেকে ঠোনা মারে,
রাঙ্গাগালা রাঙ্গাক'রে,
মৃদুহাসি গন্ধবহে কটু ব্যঙ্গ করে।

৪৩ [আকর,

সুন্দরি লো! তোর আঁখি সৌন্দর্য্য-
যা' কিছু সুন্দর আছে,
ধাতার এ বিশ্বমাঝে,
সকলি আঁখিতে তোর প্রাণ-মন-হর।

৪৪

হৃদয়-বারতা তব নয়নেতে লেখা,
কামিনি কটাক্ষ তোর,
ভেঙ্গেছে কলিজা মোর,
আঁখি তোর কথা কয় আছে মোর

৪৫ দেখা।

নানাকবি নানামতে দেয়লো উপমা,
তোমারে মৃগাক্ষী কয়,
কিন্তু মৃগ ভুলে যায়,
মোহিনি রে! হেরে তবনয়ন সুষমা।

৪৬

কুসুমে কুসুম ফোটে কাণে শুনাছিল,
বিকসিত মুখপদ্ম,
আঁখিদ্বয় নীলপদ্ম,
হেরিয়ে নয়ন পথে সুকবি হাসিল।

৪৭

কামিনীর কমনীয় কটাক্ষ-কশায়,
কারে না শাসিতে পারে,
হেন আছে কে সংসারে,
কেনা মুগ্ধ অঙ্গনার আঁখির আভায়?

৪৮

মদনের ফুলশর মর্ত্ত্যে যদি থাকে,
ভুরু-চাপে আছে তোর,
সে কটাক্ষ প্রাণ চোর,
যে শর প্রহারে নর পড়েছে বিপাকে।

৪৯

তুমি যদি আঁখি মুদ ওলো কুহকিনি!
অন্ধকার হৃদাকার,
ধরা যেন ছারখার,
প্রাণেতে ঝটিকা বহে ভবের ভাবিনি!

৫০

মদালস আঁখি তোর প্রেমে ঢলঢল,
সে আঁখি দেখিলে পরে,
ভুলে নর এ সংসারে,
সুরাপানে মত্ত যেন দেহ টল্ টল্!

৫১

ললাটে লোহিত-লেখা অতি মনো- [লোভা,
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা,
যেন গো করেছে ঘটা,
পূরব গগনভালে মরি কিবা শোভা!

৫২

আঁকিনু যুবতী ছবি সাধ্য অনুসারে,
যা কিছু রহিল বাকি,
নিজে পড়িয়াছি ফাঁকি,
কেমনে চিত্রিব যাহা নাহিক অন্তরে।

বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম্ম।

প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা সর্ব্বদিকপ্রসারিণী ছিল,—ভাষাসংস্কার কাব্যরচনা উপন্যাসপ্রণয়ন সমাজসংস্কার ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পার্থিবজীবন সংগ্রামের পর যখন তিনি সর্ব্বদিক হইতে সাফল্যের জয়পতাকা মস্তকে বন্ধন করিয়া জাতীয় কেন্দ্রক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন,—তখন তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বলবীর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধচিত্ত স্বদেশবাসী, তাঁহার কোন কার্য্যের প্রশংসা করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ তাহাকে ভাষা-সংস্কার-কার্য্যে অদ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করিল,—উপন্যাসরচনায়

অপূর্ব্ব কৌশলবিৎ বলিয়া স্বীকার করিল,—কেহ বা তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রশংসা করিল! বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য অটলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য—যে নানা উন্নতিসাধন করিবার জন্য—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন,—ইঁহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইল। যাহা হউক, অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মমতই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপপাদ্য প্রস্তাব।

আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বেই প্রশ্ন হইতে পারে,—'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টির অতীত কিন্তু জ্ঞানের অন্তর্ভূত যে মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন এবং যাঁহাকে জগদীশ্বর বলা যায়, তাঁহারই উদ্দেশ্যে ভক্তি এবং পূজাকেই "ধর্ম্ম" বলা যায়। এই ধর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—প্রথমতঃ স্বাভাবিক বা মানবীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যাদিষ্ট বা ঐশ্বরীক ধর্ম্ম। প্রথম ধর্ম্মেরদ্বারা মানব স্বকীয় বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে পরস্পরের উপকারসাধনে এবং সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হয়,—মানবের উন্নতির দ্বারা সমাজের উন্নতি, সামাজিক উন্নতি দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে; সুতরাং নিয়ম এবং শৃঙ্খলাস্থাপিত হইয়া, পরিশেষে জগৎপাতার মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে কোনও মহাপুরুষ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করতঃ যে সমস্ত উপদেশ দান করেন, সেই উপদেশ সমূহই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেগুলি পুস্তকে স্থায়ীভাবে স্থান প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র-গ্রন্থ নামে সম্মানিত হয়। প্রায় সকল সুসভ্যজাতিরই মধ্যে এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। দেখিতে পাওয়া যায় আমাদিগের আর্য্য-হিন্দুধর্ম্মও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে।

বেদ এবং হিন্দুজাতি অনন্তকাল হইতে জগতে বিদ্যমান ছিল। হিন্দু বলিলেই বেদোক্তনিয়মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়গণকে বুঝাইত—এবং একমাত্র বেদই তাহাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কিন্তু কালমাহাত্ম্যে অধুনা আর তদ্রূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যিনি বেদকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত অমোঘবাক্য বিবেচনা করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করেন, তিনিও হিন্দু—এবং যিনি নবপ্রণালী সৃজন করিয়া হিন্দুসমাজকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ রাখিতে চাহেন না, তিনিও হিন্দু। সুতরাং শাস্ত্রমতে এক্ষণে কে হিন্দু, কে অহিন্দু, তাহা স্থির করা অসম্ভব।

যাহা হউক, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মপ্রণালী বর্ত্তমান সময়ে আচরিত ধর্ম্মপ্রণালীতে পর্য্যবসিত হইয়া ধীরে ধীরে যে বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের সংঘর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সংস্কারকদিগের অভ্যুদয়ে এবং অন্যান্য নানাকারণবশতঃ হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক উদারতা অনেক সঙ্কীর্ণতালাভ করিয়াছিল।

আলোচ্য প্রস্তাবের অন্তর্গত নহে বলিয়া, হিন্দুধর্ম্মের এবং সমাজের ক্রমিক অধঃপতন বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দির প্রারম্ভে যখন সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া বণিকবেশী ইংরাজগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন লোকে বেদোক্ত ধর্ম্মপ্রণালী বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সামাজিক ব্যভিচারীতার পঙ্কিলহ্রদে নিমগ্ন হইয়া পারস্পরিক শত্রুতায় কালক্ষেপ করিতেছিল।

বঙ্গসমাজের যখন এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলতা পূর্ণরূপে বিরাজমান, তখন সুকৌশলী ইংরাজ-মিশনরীগণ বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশকে জয় করিবার জন্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম জাল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এতদ্দেশে ইংরাজিশিক্ষার প্রচলনের সহিত ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলমন্ত্র সুকুমারমতি বঙ্গবালকদিগের কর্ণে প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের বাহ্যাড়ম্বরে বিমুগ্ধ হইয়া অনেক ইংরাজিশিক্ষিত আচার ভ্রষ্ট বঙ্গীয়যুবক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পিতামাতার নিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে লাগিল।

হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার সময়, কীর্ত্তিমান্ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, স্বকীয় বৃহৎ সঙ্কল্প এবং অপরিমেয় অধ্যবসায় লইয়া স্বদেশকে বিদেশীয়ধর্ম্মের জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। হিন্দুসমাজ তখন বৈচিত্র্যময়ী বাহ্য-সৌন্দর্য্যশালী ইংরাজি আচার ব্যবহারদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, —তখন হিতাহিত জ্ঞান কবিবার ক্ষমতা ছিল না—এবং দূরস্থ ছায়াপুরীকেই সত্যের অমর-অট্টালিকা কল্পনা করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

এই বৈদেশিক জলস্রোতেব বিপুল প্রবাহ হইতে জীর্ণদেশকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বদেশীয় শাস্ত্রের সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করাকেই প্রশস্ত উপায় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। বামমোহন বুঝিতে [illegible]য়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হওয়াই [illegible]মাজিক অধঃপতনেব প্রধান কারণ। ইহাতে দেশীয় ব্যক্তিবং[illegible] কান দোষ পবিলক্ষিত হয় না। সে সময়ে সাধারণের বে[illegible] কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল না এবং শাস্ত্রেব যথার্থ্যতা হইতে ত[illegible]গের জ্ঞান বহুদূরে পড়িয়াছিল। স্বকীয় সুতীক্ষ্ণ ধ্যানদৃষ্টির সা[illegible]য্যে রামমোহন সে অভাব উপলব্ধি করিলেন,—হিন্দুসমাজ এবং ধর্ম্মকে আশুবিনাশ হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত জড়সংস্কারাপন্ন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন আর্য্যগণের সনাতন বৈদিকমত সাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য অকাতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন! স্বহস্তে বাঙ্গালা পদ্যের সৃজন করিয়া সেগুলি অনুবাদিত করিতে লাগিলেন,—ইহার সহিত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মেব অসারতা প্রতিপন্ন করিবাব জন্যও সচেষ্ট হইলেন। এই সুচেষ্টার সহিত তিনি স্বপ্রবর্ত্তিত উদার হিন্দুধর্ম্মপ্রণালীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া প্রচলন করিতে লাগিলেন। অনেকে এই নবপ্রচলিত উদাব উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিলেন,—সমাজ খ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যাচার হইতে [illegible] প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রামমোহনের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফলতালাভ করিতে পারিল না। রামমোহনের অকালমৃত্যুর সহিত অনুপযুক্ত-হস্তে ভারপ্রদত্ত হওয়াতে অনেক আভ্যন্তরীণ কলহ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে নানা সাম্প্রদায়িকতায় বিভক্ত করিয়া ফেলিল।

রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৺অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ৺কেশবচন্দ্র সেনের উপর ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। অক্ষয়কুমার সংস্কারকার্য্যের পক্ষপাতী না থাকিলেও ইংরাজি রীতিনীতির প্রশংসা করিতেন এবং কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর নবধর্ম্ম স্থাপন করিতে এবং পাশ্চাত্যপ্রথানুযায়ী স্বদেশীয় সমাজ সংগঠন করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। সুতরাং ইহা-দিগের হস্তে রামমোহনের উদার বেদোক্তধর্ম্ম যে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘোর সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে তাহাতে আর [illegible] কি? খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজের [illegible] অপকার করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এই কলুষিত [illegible] পরিবর্ত্তিত একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অপকার করি[illegible]গিল। সেই কারণবশতঃ প্রথমাবস্থায় যে কয়জন ব্যক্তি রামমোহ[illegible] উদারধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কালক্রমে তাঁহারা ইহার অধঃপ[illegible]ন দর্শন করিয়া উক্ত ধর্ম্ম এবং সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া [illegible]ড়লেন। আবার সমস্তদেশে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

ইহার ফলে অকস্মাৎ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিসভা হিন্দুধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া বক্তৃতাস্রোতে এবং সংকী[illegible]নে শান্তিপ্রিয়-ব্যক্তিবর্গের কর্ণবধিরপ্রায় করিয়া তুলিল, কিন্তু তাহাতে বাহ্যিক সৌষ্ঠব ভিন্ন মানসিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আদৌ উন্নত হইল না। সামাজিক কলঙ্ক-স্রোত পূর্ব্বের ন্যায়ই সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

স্বরলিপি।

পাহাড়ী পিলু—দাদ্‌রা।

কথা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ। সুর—শ্রীযুক্ত রামতারণ সান্ন্যাল।

অলি ব্যাকুল কাঁদি'ছে গুঞ্জরি' লো।
নাহি হেরি' কুসুম মুঞ্জরিল॥
চিত চঞ্চল ধাই'ছে সবোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মনব্যথা কহে সকাতরে,—
শূন্য সরোনীর নেহারি' লো॥

আস্থায়ী।

ঋ | প প | প | ম গ | ঋ সা || ম ম | প
কাঁ | দি ছে | | গু ঞ্জ | রি লো || না হি | হে

অন্তরা।

০ + ০ + ০

সাঁ	ম	মঁ	ম	প	ধ	নি	ধ	প	ধ	পা
রে	শূ	ন্য		স	রো	নী		র		নে

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩০৪ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

(৬)

এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কৃষ্ণধন কলিকাতায় আসিলেন। শ্যাম সুন্দরও পিতার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। মহামায়া বাড়ীতে একেলা পড়িল। বহুদিন পরে মহামায়া কৃপণতার ফল বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল—স্বামী পুত্র গৃহে না থাকিলে, তার গৃহে ও অরণ্যে পার্থক্য থাকে না। পূর্ব্বে তাহার গৃহ সর্ব্বদাই জন-কলকলে পূর্ণ থাকিত। মহামায়ার গৃহে নিত্য ভোজের আয়োজন হইত, মহামায়ার অন্ন, প্রতি আগন্তুককে যথেচ্ছা বিতরণ করিয়া প্রতিবেশিনীগণ কেহ সাবিত্রী, কেহ অন্নপূর্ণা, কেহ দ্রৌপদী, কেহ বা লক্ষ্মী,—বিবিধ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়া, নারী জন্মের সৌভাগ্যে আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করিত। কৃষ্ণধন কোথাও যাইলে, তাহাদের সঙ্গে আলাপে আমোদে, মহামায়া স্বামীর অদর্শন বড় একটা অনুভব

করিতে পারিত না। আজি কালি আর তাহারা কেহই আসে না। কাজেই একেলা থাকাটা মহামায়ার বড় কষ্টকর হইয়া পড়িল। মহামায়া তখন বুঝিল,—'একেবারে হাত বন্ধ করিয়া বড় [illegible] কার্য্যই করিয়াছি।'

'স্বামী গৃহে আসিলে আবার তাহার কাছে মুক্ত হস্ততার অনু-[illegible] লইব'—ভাবিয়া, মহামায়া কোনরূপে কয়টা দিন কাটাইবার জন্য হৃদয় বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয় বাঁধা পড়িল না। মহামায়া মনে মনে ভাবিল, মানুষই লক্ষ্মী; আগে সেই মানুষকে গৃহে স্থান দিতাম, আদর যত্ন দেখাইতাম, নিজের সুখের জন্য। তাহাদের কি? তাহারা যে আপ্যায়িত হইত, তাহার আদর গ্রহণ করিত, এটা তাহাদের অনুগ্রহ; আর মহামায়ার সৌভাগ্য। মহামায়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। সে পাল্কী করিয়া ননদীর গৃহে চলিয়া গেল। ননদীর নাম শারদাসুন্দরী, মহামায়ার বাল্য সখী। তাহার সম্বন্ধে এই স্থানে দুই একটী কথা বলিব।

কৃষ্ণধনের তিনকুলে কেহই ছিল না। তবে কোথা হইতে মহামায়ার ননদী আসিল? মহামায়ার পিতা, জামাতার দেশে গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, কৃষ্ণধনের কোন সম্পর্কের কেহ আছে কি না জানিতে চাহিয়াছিলেন। গৃহ ত নির্ম্মাণ করিবেন, কেন না, কন্যার শ্বশুর-গৃহ-বাসিনী হইবার বড় সাধ। স্বামীর গৃহ নাই শুনিলে, আদরের কন্যা মর্ম্মাহত হইবে; কাজেই কৃষ্ণধনের গ্রামে একটী ঘর বাঁধিতেই হইবে। কিন্তু সেখানে কাহার কাছে কন্যাকে পাঠাইবেন? কে বালিকা কন্যার অভিভাবকত্ব করিবে? তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান করেন। কৃষ্ণধন বাল্যকালেই পিতামাতৃহীন। শ্বশুরকে এ বিষয়ে নিজে কোনও সন্ধান দিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মনে ছিল, বাল্যে মাতৃ বিয়োগের পর, একটী রমণী তাঁহাকে কিছুকাল স্তন্যপান করাইয়াছিল। কিন্তু সেও অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, আছে কি না আছে, কৃষ্ণধন তাহার সন্ধান বলিতে পারিলেন না। কৃষ্ণধনের

শ্বশুর একজন আত্মীয়ের সন্ধানে ফিরিলেন। কিন্তু গ্রামস্থ কেহই আত্মীয় হইতে চাহিল না। কেহ গর্ব্ববশে, কেহ অভিমানে, কেহ বা আশঙ্কায় ঘরজামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিল না। বহু দিন খুঁজিয়া, মহামায়ার পিতা সেই আত্মীয়ার সন্ধান পান। তখন তাঁহার বড়ই দুরবস্থা। স্বামী-পুত্র বিয়োগিনী, দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, একটীমাত্র কন্যা লইয়া গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটী গ্রামে পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। মহামায়ার পিতা সন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন।

তৎপূর্ব্বে, সেদিনকার আহারের কথা লইয়া, কন্যা ও মাতায় কলহ চলিতেছিল। কন্যা শারদাসুন্দরী তখন দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। দরিদ্রতার শিক্ষায় সেই অল্পবয়সেই তাহার বিজ্ঞের জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাহার আহারের জন্য মাকে প্রতিবেশিনীগণের কাছে প্রায়ই হাত পাতিতে হইত। কন্যার সেটা ভাল লাগিত না। সে মায়ের এই অন্যায় কন্যাবাৎসল্যতার জন্য প্রায়ই তিরস্কার করিত। এবং নিজে চরকা কাটিয়া পৈতা বিক্রয় করিয়া পরের গৃহের ধান ভানিয়া, মাও নিজের অন্ন সংস্থানের আভাষ দিত। মা কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে ও আশঙ্কায় এই যৌবনোন্মুখী, অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যাকে বাটীর বাহির হইতে দিত না। নিজে কায করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত, কখন বা অপমান সহিত, তথাপি কন্যার ইচ্ছা পূর্ণ করিত না। সেদিনও মায়ে ঝীয়ে কলহ চলিতেছিল। বালিকা মাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহাকে কোথায়ও যাইতে দিবে না। মা বলিল—'যদি কোথাও যাইতেই না দিবি, তবে খাইবি কি?'

বালিকা বলিল,—'খাইতে না পাইলেই কি ভিক্ষা করিতে হইবে?'

মা। তবে কি করিব?

বালিকা। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাক্।

মা। সে কতক্ষণের জন্য? কালকে অর্দ্ধ উপবাস। আজ কিছু খাইতে না পাইলে যে, ঢলিয়া পড়িবি।

বালিকা। না খাইয়া মরিব, তবু তোকে ভিক্ষা করিতে দিব না।

মা। আমার সব মরিয়াছে, তুই মরিলি না কেন?

বালিকা। বেশ, তবে ঘরে বসিয়া থাক্। মৃত্যু আপনি আসিয়া আমাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে। মরিতেই যখন হইবে, তখন ভিক্ষান্ন খাইয়া আত্মহত্যা করিব কেন? মরিব ত ভগবানের উপর অভিমান করিয়া মরিব। এত লোকে আহার পায়, আর আমাদের কখন আধপেটা খাইয়া, কখন পূরা উপবাস দিয়া থাকিতে হয় কেন? এ কথা মনে হইলেও রাগ হয়। কিন্তু সে রাগ কাহার উপর করিব মা! আজ আমি স্থির করিয়াছি, যে আমাদের পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া বসিয়া থাকিব। যদি পাঠাইবার উদ্দেশ্য থাকে ত সে আপনি আসিয়া আহার যোগাইবে। নহিলে উদ্দেশ্য হীন জীবন রাখিয়া লাভ কি? যত শীঘ্র যাইতে পারি, ততই মঙ্গল। আজ আমি তোকে কোথাও যাইতে দিব না।

শারদা মাতার হাত ধরিয়া রহিল। মাতা কন্যার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, আর বলিল—"হাত ছাড়িয়া দে। ঘরে বসিয়া থাকিব, পরিশ্রম করিব না—কে আমাদের আহার যোগাইবে? —সেই অদৃষ্টই যদি আমার হইবে, তাহা হইলে একঘর সন্তান থাকিতে, আমি একা তোর চিন্তা লইয়া মরিব কেন?"

শারদা বলিল—'তবে খাইতে পরিতে পাই, এমন ঘরে আমাকে দেনা কেন—অনাহারে মরিতে চলিলাম, কৌলিন্য লইয়া কি করিব?'

বালিকার মুখে একথা শুনিতে অনেকেরই বাধ বাধ ঠেকিতে পারে, কিন্তু উদরের যন্ত্রণা যে অনুভব করিয়াছে, সেই জানে, অন্নকষ্টে লজ্জা-সরম রক্ষা করা কত কঠিন। দুর্ভিক্ষে লোকে ছেলে বেচিয়া খায়। কোথাও আহার পাইলে পুত্রকে ঠেলিয়া

নিজের উদর পূরণ করিতে বসিয়া যায়। শারদাও দারিদ্র্যের নিত্য-পেষণে কতকটা লজ্জাহীনা হইয়া পড়িয়াছিল। দুটী শাকের জন্য সে গাছে উঠিত, মৎস্যের জন্য জলে নামিত। কখন বা বালক বালিকাদের সঙ্গে কোন্দল করিত। নিজেদেব কোন -ক্ষতি দেখিলে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মা তাহাকে অতি অল্পদিন হইল আটক করিয়াছে। কাজেই বালিকা মুখরা হইয়া মায়ের সঙ্গে কোন্দল করিতেছিল।

এমনই সময়ে মহামায়ার পিতা, তাহাদের বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। বাটীর ভিতরের কলহ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাহারা কি বলিতেছে শুনিতে তাঁহার কৌতূহল হইল। তিনি কাণ বাড়াইয়া তাহাদের কলহেব আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। তারপর বালিকাব শেষ প্রশ্নে মা যখন দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল—'তা কখন পারিব না— তবে বসিয়া বসিয়া অনাহারে শুকাইয়া মব্, আমি তোমার জন্য বংশ-মর্যাদ্যা-লোপ করিতে পারিব না।' তখন সেই অপরিচিতার উপরে আপনা আপনি শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বে তিনি অতিথি হইয়া তাহাদের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর রহস্য করিয়া তাহাদিগকে মনোবেদনা দিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ধীবে ধীবে কবাট ঠেলিয়া বাটীব উঠানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা তখনও পর্য্যন্ত হাত দুখানি দিয়া মায়ের দুটী হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল। শেষের কথা-গুলি বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষু হইতে গলগল করিয়া জল বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ প্রকৃতিস্থা ছিল, যে কোন প্রকারে হৃদয় বাঁধিয়া কন্যাকে বুঝাইতে ছিল, কিন্তু কন্যার শেষ কথায় একটা ভবিষ্যতের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে যেন মাতৃহীনা কুমারী কন্যার বিষাদের ছায়ায় ঘেরা যৌবনশ্রীটি দেখিতে পাইল। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কাল্পনিক মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া দিল। চক্ষু সহস্র চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে

পারিল না। হাত কন্যার হাতে বদ্ধ, মুছিবার অবকাশ হইল না। অশ্রু দেখিতে দেখিতে গণ্ড বাহিয়া ছুটিয়া গেল। শারদা মায়ের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

তারপর?—তারপর এই নবাগত অতিথির আগমনে তাহাদের জীবনমৃত্যু প্রশ্ন মুহূর্ত্তমধ্যে মীমাংসিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অধিক ক্ষণ তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের পরিচয় লইলেন, নিজের পরিচয় দিলেন। আর কৃষ্ণধন ও তাহার কন্যার কথা তুলিয়া, তাদের গৃহের অস্তিত্ব রক্ষা ও নবসংসার প্রতিষ্ঠারূপ মহদুদ্দেশ্যের জন্য যে ঈশ্বর তাহাদিগকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছেন, এ কথাও শুনাইয়া দিলেন।

বালিকা ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার ভার লইলেন। ব্রাহ্মণ আহারসামগ্রী আনাইয়া, সেই স্থানেই সে বেলার মত রহি-লেন। অপরাহ্নে মা ও মেয়েকে কৃষ্ণধনের নবনির্ম্মিত গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

কোথাকার ভার কোথায় মিলিয়া এই নবসৃষ্ট আত্মীয়-তায় একটা সোণার সংসার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মহামায়া শ্বশুর-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার মমতাময়ী শ্বশ্রু আছে, আনন্দময়ী ননন্দা আছে। আর তাহাকে ঘেরিয়া হাস্য পরিহাসে আমোদ রঙ্গে দিবসের দীর্ঘতা নাশিকা সঙ্গিনী আছে।

মহামায়ার পিতা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শারদাসুন্দরীকে সৎপাত্রে ন্যস্তা করেন। তাহার স্বামী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। অল্পদিন পরে শারদাসুন্দরীর মাতা পরলোক গতা হন। মহাসমারোহে মহামায়ার পিতা তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইযাছিলেন।

এখন রমাপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করিতেছেন। হাঁসপাতালের ভার লইয়া তাহাকেও জেলায় জেলায় ঘুরিতে হয়। শারদাসুন্দরীও স্বামীর সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মহা-

মায়া দেশে আসিলে, শারদাসুন্দরীও দেশে আসে। কিন্তু এবারে আজিও পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। রমাপ্রসাদ নিজেও বহুদিন কৃষ্ণধনকে দেখেন নাই বলিয়া, ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন, ছুটি মঞ্জুর হইলেই নিজে শারদাকে লইয়া আসিবেন সংকল্প।

মহামায়া কিন্তু তার আগমনের অপেক্ষা করিতে পারিল না। শারদাসুন্দরীর দেশে আসিবার পূর্ব্বেই সে তার শ্বাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল।

(৭)

পাল্কি হইতে নামিয়া মহামায়া বাটীর উঠানে দুই-একপদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে পাছু হইতে মা বলিয়া কে তারে জড়াইয়া ধরিল। মহামায়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সে একটী সুবর্ণলতায় বিজড়িতা হইয়াছে। বালিকার মুখ দেখিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি অর্দ্ধ বিস্মৃত মুখ-ছবি দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল; আর মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয়টাকে নিপীড়িত করিয়া, সমস্ত ধমনীগুলাতে শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া, কি একটা অজ্ঞাত কারণ তড়িৎ-স্ফুর্ত্তি তাহার বিশাল লোচন দুটী জলে ভরাইয়া দিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না বুঝিতেই মহামায়ার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় চলিয়া গেল। যখন আত্ম সংযতা হইল, তখন বুঝিল, মেদিনী-পুরের সেই মেয়েটীর সহিত এই মেয়েটীর আকৃতিগত একটা সাদৃশ্য আছে। মহামায়া সাদৃশই স্থির বুঝিল, মেদিনীপুর হইতে সে বালিকা এতদূরে কেমন করিয়া আসিবে বুঝিতে পারিল না।

বালিকা রমাপ্রসাদের বাটীর উঠানে খেলাইতেছিল। মহামায়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই মাতৃভ্রমে তাহাকে মা বলিয়া, পাছু হইতে জড়াইয়া ধরিল। এখন মা নয় দেখিয়া লজ্জিতা,

তাহাকে ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মহামায়া তাহাকে ছাড়িল না। কোলে জোর করিয়া তুলিয়া লইল, এবং বার বার তার মুখ চুম্বন করিল। বালিকার বয়স আন্দাজ বার বৎসর। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাব স্ফুটনোন্মুখী যৌবনকান্তি মহামায়াকে বিমুগ্ধা কবিল। এমন মেয়ে যাবে 'মা' বলে সে কত ভাগ্যবতী। মহামায়ার ঈর্ষা হইল। রমণী জীবন বৃক্ষেব রসাল ফল—সুন্দরী রসময়ী দয়াবতী মায়ারূপিণী। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য সেই রস, সেই দয়ামায়া আববণে কখন কখন কেমন করিয়া যে এই কীটটী প্রবেশ কবে, দয়াময়ীবা নিজেই তাহাব উপলব্ধি করিতে পাবেন না। তাহার প্রবেশ পথ মানব দৃষ্টির অগোচব। তুমি অনুসন্ধান করিতে যাও, সেটী তোমার চোখের উপব দিয়া উড়িয়া যাইবে। একটু মধুর শব্দে তাহাব অস্তিত্বেব প্রমাণ দিবে, ধরা দিবে না। সখী সখীর দুঃখে কাঁদিয়া মরিবে, তবু তাব সুখ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে বাধা দিতে পারিবে না। পুত্রবৎসলা জননী, স্বামীনিগৃহিতা পুত্রবধূব জন্য পুত্রের সহিত বিবাদ কবিয়া অন্নজল ত্যাগ করিবেন, তবু তাব স্বামীব ভালবাসা দুচক্ষে দেখিতে পারিবেন না। ইতিহাস, বিজ্ঞানে, কাব্যদর্শনে সহস্র সহস্র নীতিশিক্ষায়ও ঈর্ষা ঠাকুরাণী সেই কোমল সিংহাসনেব দখল ছাড়েন না। তবে মূর্খার কঠোর ঈর্ষা, মুক্তকণ্ঠে বিধাতাকে গালি দেয়, বিদুষীর মার্জ্জিত রুচি ঈর্ষার অঙ্গে কবিতারসেব আবরণ দিয়া মধুব করিয়া তুলে। তোমাব সিবিলসার্ব্বিশ পাশ করা স্বামী দেখিয়া তোমার মূর্খা সখী স্বামীর সহিত কলহ কবে, তোমার বিদুষী সখী বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন।

বালিকার মুখের 'মা' কথা শুনিয়া তার মুখ দেখিয়া, কোলে করিয়া স্পর্শ সুখানুভাবিনী মহামায়া ঈর্ষায় গলিয়া গেল। এই চাঁদমুখ হইতে অজস্র নিঃসৃত 'মা মা' সুধা শুধু যে তার জননীর হৃদয় রাজ্যেই অবিরাম ঝরিয়া আসিবে, এটা তার সহ্য হইল না। ঈর্ষান্বিতা মহামায়া তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার।

জন্ত বালিকাকে জোর করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। প্রসভোক্তা বালিকা ক্ষুদ্র বলটুকু দুই একবার মহামায়ার এই স্বাধীনতা হরণরূপ দুর্ব্বোধ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প'রবে না মোর সাধের মালা?

প'রবে না মোর সাধের মালা?
আমি—সারাটি দিন ঘুরে ঘুরে,
সাজিয়েছি যে সোণার থালা,
তুমি—প'রবে না মোর সাধের মালা?

আমি—একলা মানুষ জগৎ ঘুরে,
বেড়াই খালি তোমার তরে,
দেখবো খালি হাসিমুখ
ত'ায় বিমল চাঁদের খেলা,
তুমি—প'রবে না মোর সাধের মালা?

বেড়িয়ে আমি কুসুম বনে,
তুলেছি ফুল কত যতনে,
খালি তোমায় দিব বলে
আমি—এসেছি এ স'াঝের বেলা,
তুমি—নেবে না মোর সাধের মালা?

আমি দিন গুণেছি বসে বসে,
কবে তোমায় দেখবো এসে,
দেবো তোমার হাতে তুলে
আমার এ সোহাগের ডালা,
তুমি—প'রবেনা মোর সাধেরমালা?

তোমায় ভালবাসি যেপ্রাণের চেয়ে,
দাঁড়িয়ে আমি তাইত নিয়ে,
আমার এ যতনের হার
আমি—গেঁথেছি দিয়েগোলাপবেলা,
তুমি—প'রবেনা মোর ফুলেরমালা?

তুমি—নাও না তুলে একটু হেসে,
শুধু একটু খানি ভালবেসে,
আর কিছুত চাই না আমি
আমার—ডেকে ডেকে ভাংলো গলা,
তুমি—প'রবেনা মোর সাধেরমালা?

শ্রীগণেশচন্দ্র সেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এই মহা অবনতির সময় বঙ্কিমচন্দ্র আপনার হৃদয়ের সমস্ত উদারতা লইয়া সামাজিক কোলাহলের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি রামমোহনের মহাশিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাষাসংস্কারের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকার্য্যেও মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত করিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, সে সময় বাঙ্গালা সমাজ প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ আদৌ পালন করিয়া চলিতেছে না এবং প্রাচীন মহা-মুনিদিগের শাস্ত্রোক্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা এবং সুযোগ অনেকেরই ছিল না। কোনও ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুযায়ী আচারকে দেশাচার বলিয়া গণনা করা হইত এবং তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, সমস্ত সমাজ তদনুসারে কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। এই প্রকারে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক অশাস্ত্রীয় নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেগুলির অসারতা এবং অপ-কারিতার প্রতি আদৌ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া সকলে তাহা অবলম্বন করিত।

যখন হিন্দুসমাজে এমন বিশৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব ও যখন অন্তঃ-সারশূন্য বাহ্যিক আড়ম্বরকেই ধর্ম্মের নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং যখন ইংরাজিশিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যযুবকবৃন্দ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম-পিপাসায় কাতর হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগের সংমিশ্রণসাধন করিয়া অতি উপাদেয় "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক স্বকীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাঞ্জল অথচ দার্শনিক পুস্তক প্রকাশিত করিলেন।

ধর্ম্মসংস্কারই হউক, ভাষাসংস্কারই হউক, সমাজসংস্কারই হউক

বা রাজনীতিসংস্কারই হউক—সকল প্রকার সংস্কারকার্য্যেই সূক্ষ্ম-দৃষ্টিশক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এই দুইটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। কোনও বিষয়ের দোষ গুণ—তাহা ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎই হউক, দেখিবার জন্য যেমন একপক্ষে সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন, সেই প্রকার সকল প্রকার বিষয় হইতেই গুণাংশ সঞ্চয় করিয়া লইতে হইলে মানসিক উদারতার আবশ্যক। কি উপন্যাস-রচনা বা কি ধর্ম্মবিষয়ালোচনা—সকল বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি মহৎ গুণের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—সেই কারণবশতঃ তিনি এমন সর্ব্বলোক-পূজ্য নিরপেক্ষ এবং বলসম্পন্ন ভাষা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়কালীন যে প্রকার সামাজিক দলাদলি চলিতেছিল, তাহাতে কাহারও পক্ষে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে অবস্থান করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত্র" এবং "ধর্ম্মতত্ত্বে" আমরা এই অসাম্প্রদায়িতার সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। কোথায়ও অভিমান বা আত্মগরিমার লেশমাত্র নাই—সরলভাবে নিজের ভ্রমাদি স্বীকার করিয়া এবং একাগ্রতার সহিত সত্যকে উচ্চ আসনে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বাদে অবিশ্বাস করিতেন—কৃষ্ণচরিত্রে সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু অপরপক্ষে তিনি যে আধুনিক মুণ্ডিতমস্তক ছাপাঙ্কিতদেহী বৈষ্ণবদিগের আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে; তিনি তাহাদিগকেও দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কেবল ভণ্ডামী এবং অনাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায় না।

এতদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেশাচার এবং শাস্ত্রীয়ধর্ম্ম এতদুভয়ের যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রকৃত ধর্ম্মমত অবগত

হওয়া যায়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজসংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন . উচিত এমন আমি বিশ্বাস করি না। * * * আমার একপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে বাঙ্গালী-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত। সত্যবটে লোকাচার অনেক সময়ে শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ—যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ সেই খানেই লোকাচার প্রবল। উপরোক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। * * * আমার নিজের বিশ্বাস যে ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং নীতিসম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religions and moral Regeneration) না ঘটিলে কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথাবি শেষ পরিবর্ত্তন করান যায় না।" *

বস্তুতঃ বহুকাল হইতে হিন্দুসমাজে শাস্ত্রের নামে যে অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। স্বার্থান্ধ কতিপয় ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া সময় সময় শাস্ত্রের নামে অজ্ঞব্যক্তিগণকে কদাচার পালন করিতে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছে। সেগুলির বিষম অপকারীগুণ থাকা সত্বেও, কালক্রমে তাহারা হিন্দুধর্ম্মাচরণের এবং সমাজের স্নেহক্রোড়ে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহাদিগের অযৌক্তিকতা বা অশাস্ত্রীয়তা দেখাইয়া দিলেও লোকে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেনা।

হিন্দুসমাজে এখনও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য কথায় কথায় শাস্ত্রের মত উল্লেখ করে

* শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণদেবের নিকট প্রেরিত ৺বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র—নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০১।

—কিন্তু হয়ত যাহাতে তাহাদিগের নিজের বিশেষত্ব বর্ত্তমান সে প্রকার প্রাত্যহিক আচারানুষ্ঠানের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় সমুদ্রযাত্রার প্রস্তাব উত্থিত হয়, তখন এই সমস্ত ভণ্ডদিগের বাহ্যাড়ম্বর সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা করা হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য ইহারা বহুশ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা 'শাস্ত্র শাস্ত্র' করিয়া চীৎকার করিয়া এই সদ্‌চেষ্টাকে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল, তাহাদিগের অধিকাংশই হয়ত অখাদ্য ভোজন এবং অপেয় পান করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে কুণ্ঠিত ছিল না, এবং অধিক নহে—শাস্ত্রমতে যে শূদ্র, ব্রাহ্মণের দাসরূপে নিযুক্ত হওয়া উচিত—এই সমস্ত নৈষ্ঠিক (?) ব্রাহ্মণগণ সেই সমস্ত শূদ্রের পদানত হইয়া তাহাদিগের পদলেহন করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিত না। প্রায় সকলেই হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন যে,—ইহা ব্রাহ্মণের দোষ নহে—কালের দোষ। কিন্তু এই "কালের দোষের" অর্থ দেশাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যদি একপক্ষে একটা ভয়ানক অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া দেশাচারের দোহাই দেওয়া হয়, তবে একটা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের সময় শাস্ত্রের কথা তুলিয়া তাহাতে আপত্তি করা কেন?

বঙ্কিমবাবু এতদ্‌সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"আমার বক্তব্য এই যে—সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে—দেখিতে হয়, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম;—একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীনগ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এরূপ আছে;—

"ধারণাদ্ধর্ম্ম মিত্যাহুর্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

ধর্ম্ম লোক সকলে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে। যদি মহাভারতকার মিথ্যা না বলিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আবাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হয়েন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম।

প্রকৃত এবং "সত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর কি মত ছিল, ইহা হইতেই তাহা বোধগম্য হইতেছে। তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে অতি উদারচক্ষে দেখিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, "স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে— ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন—হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে একরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোনও বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? একরূপ বিরোধ নাই।"

এই প্রকারে সমুদয় লৌকিক অসঙ্কীর্ণতা হইতে আপনাকে বহুদূরে স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র হিন্দুসমাজে আগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তিনি দেখিলেন, যেভাবে হিন্দুসমাজ প্রমাদপূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে, তাহাতে ইহা শনৈঃ শনৈঃ অবনতির পক্ষেই অগ্রসর হইতেছে। হীরকভ্রমে কাচগ্রহণ করিয়া চন্দনতরুভ্রমে বিষবৃক্ষের আশ্রয় লইয়া যে হিন্দুসমাজ আজ এমন চীৎকার ও উল্লম্ফন করিতেছে—এই কষ্টাশ্রিত উৎসাহ বহুকাল থাকিবে না— এবং অবিলম্বে মানসিক জড়তা আসিয়া সমস্তদেশকে অকস্মাৎ অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ এবং

হিতৈষী ছিলেন, সেই জন্য দেশের শোচনীয় দুরবস্থা দর্শন ক রিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বদেশবাসীকে প্রমাদের প হইতে ধ্রুবসত্যের অমল রাজমার্গে আনয়ন করিবার জন্য রিকর হইলেন। এতন্নিমিত্ত তিনি যে পন্থা অবলম্বন ক , তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

উচ্চ বেদীস্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীরস বক্তৃতাপ্রদান করিয়া ধর্ম্ম বা নীতির উপদেশ মানবমনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনামাত্র—অধিকাংশস্থলেই ক্ষণিক উৎসাহ ভিন্ন ইহা হইতে অন্য কোনও সুফল প্রসূত হয় না। শ্রোতা হয়ত বক্তৃতাবসানের পর উচ্চ করতালিধ্বনি করিয়া সভাক্ষেত্রের বাহিরে যাইতে না যাইতে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যায়; এবং বক্তৃতায় যদি নীরসতার অংশ অধিক থাকে, তবে বক্তারভাগ্যে নীরব গালিভক্ষণ ভিন্ন অন্য কোনও সুবিষয় লাভ ঘটে না।

এই দোষ পরিহার করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সরস উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি হিন্দুর পরম সমাদরের দ্রব্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কঠিন উপদেশসমূহ সকলের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে স্বরচিত উপন্যাসে প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন। কি চন্দ্রশেখর, কি দুর্গেশনন্দিনী, কি দেবীচৌধুরাণী, কি আনন্দমঠ, কি বিষবৃক্ষ, কি কপালকুণ্ডলা প্রত্যেক উপন্যাসের পত্রে পত্রে গীতার মহান্ ও নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ঘাটিত হইল। লোকে একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিল, তাহার সহিত গীতার উদার মত-সমূহ তাহাদিগের মনে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গেল। অন্যান্য উপ-ন্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া উদাহরণস্বরূপে কেবলমাত্র চন্দ্র-শেখরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি গ্রন্থের শেষ-ভাগে প্রতাপের উক্তিদ্বারা বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, নিঃস্বার্থ পরো-পকার এবং নিষ্কাম আত্মত্যাগই মানবের এবং সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। কিন্তু গ্রন্থের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই অমোঘ উপদেশ

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় উপন্যাসের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা গীতা হইতে গৃহীত এবং এতদ্দ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র গীতার অনুশীলন দ্বারা ই অধঃপতিত হিন্দুজাতির উন্নতি এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম এবং ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন হইতে পারে।

যে শিক্ষাপ্রণালী উপন্যাসে আরব্ধ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র কিছু-কালপরে তাহার সমষ্টিসাধন করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্বে" সুললিত-ভাষায় প্রকাশিত করিলেন। এই ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধতমসাচ্ছন্ন দরিদ্রদেশে উদারতার প্রভাতসূর্য্য আনয়ন করিলেন। সাম্প্র-দায়িকতা এবং কুসংস্কারের কঠিন মোহজালে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনোবৃত্তিসমূহ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিল—প্রমাদপূর্ণ লৌকিক আচারানুষ্ঠান ব্যতীত কাহারও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকতার সহিত সেই সঙ্কীর্ণতার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন যে, অন্ধের ন্যায় কদাচার পালন করিলে সামাজিক এবং পারলৌকিক উন্নতি হইতে পারে না—হিন্দুর প্রাচীন ও সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই এই হতভাগ্যদেশে সৌভাগ্যের দীপ্তসূর্য্য উদিত হইবে—এবং আত্মোন্নতি এবং নিষ্কামকর্ম্মই সে উন্নতি-লাভের প্রধানতম উপায়—সেই জন্য গীতার আশ্রয় লইয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া একাগ্রতার সহিত বলিতেছেন ;—

কাম্যানাং কর্ম্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

"যেদিন ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান এবং শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না—ইহা অসম্ভব নহে। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা

করিলেই হইবে। দুইই তোমাদের হাতে, এখন ইচ্ছা করিলেই তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।”

এই প্রকার বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের উন্নতির জন্য অসাম্প্রদায়িকতার সহিত এবং আবেগভরে সমস্তদেশকে কার্য্যকর উপদেশদান করিয়া গিয়াছেন। অতি ছিদ্রান্বেষীব্যক্তিও বিশেষ মনোযোগ-সহকারে অন্বেষণ করিলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্রে একদেশদর্শিতা বা বাহ্যাড়ম্বরের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না। বঙ্কিম যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা তাহার প্রাণের রচনা এবং স্বকীয় জীবনেও তাহা অবিচলিত-ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম যে কেবল উপদেষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তিনি শিষ্যও ছিলেন—তাঁহার উপদেশ এবং কার্য্যে কখনও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৫৩

কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিয়েছি রূপের,
গুণ-পাশে রূপ তুচ্ছ,
ক্ষীণ এই হংস-পুচ্ছ,
কেমনে গণিবে ঊর্ম্মি গুণ অর্ণবের?

৫৪

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যৌবনের ভরে,
কা'রে না অবজ্ঞা করে?
কা'রে যুবা ভয় করে?
একমাত্র ভীত তব ইন্দিবর ডরে।

৫৫ [মাঝারে,

তুমি না থাকিলে দেবি! সংসার
হটকারী যুবাদল,
যাইত গো রসাতল,
কে তা'দের প্রলোভনে বাঁধিত

৫৬ সংসারে?

যৌবন তরঙ্গ রঙ্গে হ'য়ে উদ্বেলিত,
হারা'ত সংসার জ্ঞান,
তুচ্ছ ক'রে ধন মান,
উচ্ছিষ্ট রূপের দাস হইত নিশ্চিত।

৫৭

কর্ম্মক্ষেত্রে জীবগণ করে পরিশ্রম,
যখন গৃহেতে আসে,
কে ব'সে তাহার পাশে,
সযতনে করিবে গো ক্লান্তি উপশম?

৫৮

সংসারের নানা কর্ম্মে হইয়ে বিব্রত,
কোথায় জুড়ায় নরে?
কেবা তা'র ব্যথা হরে?
কেতারেক্ষণিককরেআনন্দেতেরত?

৫৯

নানা উপাদেয় ভোজ্য করিয়া রন্ধন
সহাস্যে বীজনী করে,
সন্তোষে ভুঞ্জায় নরে,
নানামতে কেবা করে তুষ্টি সম্পাদন?

৬০

পুষ্পনিভ পরিপাটী শয্যা মনোহর,
কেবা করে বিচরণ?
কা'র হেন আচরণ?
সর্ব্বদাই সশঙ্কিতা তব তরে নর।

৬১

যখন মানব কোন ব্যথায় ব্যথিত,
কে তাহারে মিষ্টভাষে,
প্রাণ দিয়ে সদা তোষে?
কে তাহার হৃদি-ব্যথা করে গো

৬২ দূরিত?

অশান্তি পূরিত এ মরুভূ সংসারে,
তব প্রেম সুধা পানে,
জীবগণ বাঁচে প্রাণে,
শান্তিপ্রদায়িনীতুমিআহারেবিহারে।

৬৩

তুমি ফুটাও আঁখি অন্ধ মানবের,
জ্ঞান চক্ষু খুলে দাও,
সৎপথে নিয়ে যাও,
সহধর্ম্মিণী তুমি বিমুগ্ধ জীবের।

৬৪ [তা'রে।

নিন্দুক সে মিথ্যাবাদী নাহি স্পর্শি
যা'র আঁখি না ফুটিল,
প্রেম তব না বুঝিল,
সেজন পাপের ভরা বলিবে তোমারে

৬৫

কতশত উপকার পায় তব পাশে,
সেই সবে ভুলে যায়,
অকৃতজ্ঞ পশু প্রায়,
নূতন নরক তার হয় যমাবাসে।

৬৬

নিস্বার্থ প্রণয় নামে যদি কিছু থাকে,
রমণীর হৃদি মাঝে,
সে ত্রিদিব দ্রব্য রাজে,
সাধ হয় দিবানিশি পূজি লো তোমাকে।

৬৭

লো সুন্দরি! কি কহিব তোর প্রেম [আশে,
অমর দেবতাগণ,
ত্যজি স্বর্গ নিকেতন,
মানব মূরতি ধরি ধরাধামে আসে।

৬৮

অনন্ত ধারায় প্রেম-উৎস মধুরিমা,
বহে যায় অবিরাম,
মন্দাকিনী স্বর্গধাম,
পবিত্র করিছে যেন কি ক'ব মহিমা।

৬৯

প্রেম সঞ্জীবনী লতা মূরতি সাকারা,
পিয়ে তব প্রেম সুধা,
ঘুচে গেল হৃদি ব্যথা,
নূতন নূতন প্রাণ পেয়েছি আমরা।

৭০

মানবের কণ্টকিত হৃদয় কাননে,
তুমি লো পুষ্পিত লতা,
জগতের হিতে রতা,
ভুলে আছে নর তব সুরভি আননে

৭১

বীণা-বিনিন্দিত তব কণ্ঠের ঝঙ্কার,
পরাস্ত সে পিকরাজ,
বনে গেছে পেয়ে লাজ,
ঢালিছে অমিয় ধারা কর্ণে সবাকার

৭২

এ সংসারে আছে দুটী সৌন্দর্য্যের [সার।
শিশু মুখে সুধাহাস,
আর যুবতীর ভাষ,
না থাকিলে মানিতাম সংসার অসার।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

"চোখ গেল।"

কে তুমি বিহগবর! বালার্ক-কিরণে হাস্যময়ী উষার সুরভি নিশ্বাসের শন্‌শন্ শব্দে স্বীয় স্বর মিশাইয়া—সপ্তমে সুর চড়াইয়া সকরুণ কাতর-কণ্ঠে কূজন করিতেছ,—"চোখ গেল।" মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড

তাপে তাপিত তুমি যখন পাদপের পত্রান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া সুশীতল সমীর সেবন কর, তখনও ত তোমার ওই কাতরোক্তি শুনিতে পাই; আবার সুশীতল সান্ধ্যসমীর সেবিত তরঙ্গাকুলিত তটিনী-বক্ষেও তোমার ওই "চোখ গেল" স্বর প্রতিধ্বনিত হয়। বল, পাখি! কি দুঃসহ দাবাগ্নি তোমার অন্তর্দাহ করিতেছে, কি বিভীষিকাময়ী ভীষণ দৃশ্য দর্শনে তোমার সুনীল-নলিনাভ-নয়ন "গেল গেল" হইতেছে, তাই তুমি মর্ম্মভেদী স্বরে ডাকিতেছ, "চোখ গেল" "চোখ গেল"?

নিদারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ নিপীড়িত, জ্বালা-যন্ত্রণার কেন্দ্রীভূত এই সংসার শ্মশানে, মানবের মর্ম্মভেদী মরম-যাতনা—মোহের মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মারাত্মিকামূর্ত্তি নিরন্তর দর্শন করিয়া আমাদের অন্ত-স্থল বিদীর্ণ হয়, মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়—সে দৃশ্যে আমাদেব পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া যায়, আমাদের চক্ষু আর সহিতে পাবে না, অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাসে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু বনের পাখি! তাহাতে তোমাব কি? তুমি কেন সকালে সন্ধ্যায়, পর্ব্বতে প্রান্তরে, পাহাড়ে পুলিনে, শ্মশানে সৈকতে, নিরন্তর গাহিয়া বেড়াও, "চোখ গেল" "চোখ গেল"।

তুমি স্বাধীনতার সুধাধবলিত সুষমাময় সৌধে আজন্ম প্রতি-পালিত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে—সুনীল অনন্ত নীলচন্দ্রাতপেব নিম্নে বিচরণ করিয়া থাক, এই শোকাকুলিত সংসারের ভীষণ সংগ্রাম হইতে সুদূরে অরণ্য সুপক্ক ফলে উদরপূর্ত্তি করিয়া গিরি নির্ঝরিণীর কাচস্বচ্ছ সুশীতল সলিলে পিপাসা মিটাইয়া আপন কাকলীতে আপনি বিভোর হইয়া অপাব আনন্দে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াও। এই পাপ তাপদগ্ধ ধরার বিকৃত ধাবা সকল দেখিয়া তোমার চক্ষু যাইবে কেন? বল বিহঙ্গম! তোমার এ কূজনের কাবণ কি?

মানবজীবনের অভিনয়ে কালের পটপরিবর্ত্তনে যে কত ভীষণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া

আমরা কত কাঁদিয়াছি, কত কাঁদিতেছি; আর অন্তরের জ্বালায় কতবার বলিয়াছি,—আর দেখিতে পারি না "চোখ গেল"! ওইযে সৌধমালামণ্ডিত সোণার সহরখানি মহামারির মহানলে ভস্মীভূত হইতেছে, ওই যে অনশনে মৃতপ্রায় কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তি জঠর জ্বালায় বিকট আর্ত্তনাদ করিতেছে; ওই যে পতি বিয়োগ বিধুবাবালা সহকারচ্যুত মাধবীর ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছে, ওই যে অনাহারে মৃতপ্রায় সন্তান কক্ষে উন্মত্তাজননী বিকট চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, ওই যে পাপীর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া ধার্ম্মিককে অশেষ লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইতেছে—এ সকল মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া আমরা অনেকবার বলিয়াছি,—"চোখ গেল"; কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের চোখ একবারে গিয়াছে, তাই আর আমরা অরণ্যে রোদন করিয়া বলি না,—"চোখ গেল" "চোখ গেল"। নিরন্তর কাঁদিয়া যাহাদের চক্ষু গিয়াছে তাহাদের আর "চোখ গেল" বলিবার প্রয়োজন কি? আর বলিলেই বা শুনিবে কে? তুমি বনের পাখী বনে রোদন করিলে, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজীব মানবের কর্ণকুহরে তাহা প্রবেশ করিল; কিন্তু আমরা যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠজীব—দেবতা—বলি তাঁহারাও আমাদের এই কাতর উক্তি শুনিলেন না, তাই আমরা মনের দুঃখে আর তোমার মত অরণ্যে "চোখ গেল" বলিয়া চীৎকার করি না।

গগনবিহারি গায়ক! তোমার কল কণ্ঠের কূজনে যে কত রস আছে, তাহা অবোধ আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? তুমি শাখীর শাখায় লুকাইয়া লুকাইয়া কাতর কলকণ্ঠে আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া—আমাদের দুঃখস্মৃতি জাগাইবার জন্য ঐরূপ কূজন কর অথবা আমাদের পরশ্রী কাতরতা দেখিয়া বিদ্রূপাত্মক শ্লেষপূর্ণস্বরে আমাদিগকে সুনীতি-শিক্ষা দাও, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

আমরা মানব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব; আমাদের কার্য্যকলাপ সমালোচনা, ক্ষুদ্র তুমি, বনের পাখী তুমি, তোমার মুখে শোভা

পার না। আমাদের তর্জনী হেলনে কত প্রবল বলশালীকেও হীনবল, অবনত-মস্তক হইতে হয়, তাহা দেখিতে পাও ত? জানিতে পার ত? তবে কোন সাহসে আমাদিগকে শ্লেষপূর্ণস্বরে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হও? জান পাখি। দশচক্রে আমরা ভগবানকেও ভূত করিয়া রাখি, তোমার ক্ষুদ্র মুখের ক্ষুদ্র জিহ্বাটুকু বন্ধ করা আমাদের কতক্ষণের কার্য্য?

অবোধ পাখি। বীর আমরা, এই মরজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিয়ত জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, তাই আমরা প্রতিযোগীর প্রতিহিংসা-সাধনে নিয়ত তৎপর। কাব্যজগতে কাহাকেও যশলাভ করিতে দেখিলে আমরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রে সাজিয়া তাহার সম্মুখীন হই, ভগবৎ-প্রেমে কেহ প্রেমানন্দলাভ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরানন্দ করিয়া আনন্দলাভ করিতে চেষ্টা পাই, আর মায়ের মায়ায় একচটিয়া ক্ষমতা লাভ করিবার জন্যই মায়ের অন্য সন্তানকে মায়ের কোলে স্থান লাভ করিতে দেখিলে আমাদের "চক্ষু যায়" সেই জন্যই তুমি শ্লেষপূর্ণস্বরে আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া সর্ব্বদা গাহিয়া বেড়াও "চোখ গেল" "চোখ গেল"। পরস্ত্রীকাতরতা মহাপাপ,—তাহা আমরা অনেক পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক সভায় উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিয়াছি। তোমার ছোটমুখে ওসকল বড় উপদেশ আর আমাদের সহ্য হয় না, তাই বলি বনের পাখি! আর আমাদের কাণের কাছে কূজন করিয়া বলিও না, "চোখ গেল"। যদি নিতান্ত না ডাকিয়া থাকিতে পার, তবে যাও হিমাচলের উচ্চশৃঙ্গে,—দেবলোকের শৈলাবাসে গিয়া উচ্চকলকণ্ঠে কাতর কণ্ঠে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে থাক "চোখ গেল" ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া "চোখ গেল"।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কথা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ। স্বর—শ্রীযুক্ত রামতারণ সান্যাল।

কেমনে মন নিবারি।

যতনে যাতনা বাড়ে, তা বে কি ভুলিতে পারি।

বাসনা বারি-বিবাগে, মলিন বদন মনে জাগে,

অনুরাগে গলি সোহাগে——

ছিঁড়িতে নারিনু ডুরি, কি করি মন যে তা'রি।

আস্থায়ী।

অন্তরা।

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবিনমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

হিন্দু-সূর্য্য।

এই ভীষণ তরঙ্গাকুলিত ভবার্ণবের বিষম ভয়াবহ ব্যাথায় ব্যথিত হইয়া, বিবিধ ঘটনা-বৈচিত্রের বিচিত্র আবর্ত্তনে আন্দোলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, যখন আমরা তটান্তে মিলিত হই, তখনও চারিদিকে নিরাশার নিরবচ্ছিন্ন সৈকত-রাশি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের নেত্র-পথে পতিত হয় না। এই নির্জ্জন নিরবচ্ছিন্ন সৈকত-রাশির মধ্যে পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই,—ঊর্দ্ধে অনন্ত শূন্য দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; আর অন্তরে নিদারুণ শূন্য ধূ ধূ করিতেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন জীব-শূন্য সৈকতে কোন মহাপুরুষের পদাঙ্ক দেখিয়াই আমরা আশ্বস্ত হইয়া আশার কুহকিনী শক্তিতে যেন আবার নব জীবন লাভ করি—সেই সকল পদাঙ্কের অনুসরণে আবার জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি। মহাপুরুষগণের বিচিত্র চরিত-কাহিনী আমাদের শূন্য-প্রাণের এক-

মাত্র ধ্রুবতারা, তাঁহাদের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কলাপ আমাদের নিরাবাচ্ছন্ন অন্তরের একমাত্র আশা প্রদীপ, আর তাঁহাদের সুধাময় উপদেশাবলীই আমাদের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য হিন্দুকুল তিলক "হিন্দু-সূর্য্য" মহারাণা বাপ্পারাও। এই স্বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তনে-বিবর্ত্তনে কিরূপে সংঘর্ষিত হইয়া স্বকীয় সহিষ্ণুতায় ও অলৌকিক শক্তি-বলে ভারতের তদানীন্তন শক্তি-পুঞ্জকে সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত করিয়া রাজস্থানে সগর্ব্বে রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যখন ধর্ম্ম-মদে উন্মত্ত যবনগণ রক্তাক্ত অসিহস্তে 'কাফের'-কুল নির্ম্মূল করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত, যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত খলিফাওয়ালীদের অদম্য উদ্যমে সুদূরে স্পেন রাজ্য পর্য্যন্ত কম্পমান, যখন মহাবীর মহম্মদ-বিন্‌কাসিম-প্রমুখ মুসলমান বীর-কেশরিগণের অত্যাচারে সিন্ধুরাজ ডাহির সিংহাসনচ্যুত ও নিহত, যখন নিম্ন-বঙ্গের মগধাধিপ নরপতিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ইস্‌লাম আক্রমণের অপেক্ষায় নিয়ত ভীত ও সন্ত্রস্ত, তখন শিশু বাপ্পারাও পৈত্রিক রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া গভীর অরণ্যে অসভ্য ভীল জাতির আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছেন—চিতোরের মহারাণা-বংশের আদি-পুরুষ, সমগ্র মীবারেশ্বর তখন ভীল-বালকগণের সহিত অরণ্যে গোচারণে কালাতিপাত করিতেছেন।

চিতোর-সিংহাসন বাপ্পারাওএর পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, এবং ইহার প্রকৃত নামও বাপ্পারাও নহে। অতি প্রাচীনকালে রাজপুতানার পশ্চিমে সিন্ধু-রাজ্যের নিকট বল্লভীপুর রাজ্য ছিল। এই বল্লভীপুর, আদিত্য উপাধিধারী সূর্য্য-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কলিক্‌সেন এই স্থানের রাজা ছিলেন, তাঁহার পর ক্রমে মহামদনসেন, সুদন্তসেন, বিজয়সেন, পদ্মাদিত্য, হরাদিত্য, সূর্য্যাদিত্য, সোমাদিত্য, শীলাদিত্য প্রভৃতি নরপতিগণ এই বল্লভীপুরে রাজত্ব করিয়া বিগত জীবন হইলে পর

এই বংশে নগাদিত্য নামক এক নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অসভ্য "হূন"-জাতি-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। বাপ্পারাও এই নগাদিত্যের একমাত্র পুত্র। অসভ্য বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া শিশু "শৈল" বা "শৈলাধীশ" মাতার সহিত গভীর অরণ্যে ভীল-রাজের নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। ভীলগণ এই শিশুর রাজলক্ষণ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাকে ও তদীয় জননীকে পরম সমাদরে রক্ষা করিতে লাগিল। ভীলগণ শৈশবে "শৈলকে" আদর করিয়া "বাপা" (বাবা) বলিয়া ডাকিত, সম্ভবতঃ এই কারণেই ইহার নাম "বাপ্পা" হইয়াছে।

অসভ্য বর্ব্বর-জাতি-কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব বালক বাপ্পা, মাতার সহিত ভীলরাজের নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। গোচারণ তাঁহার কার্য্য। ভীল-বালকগণে পরিবৃত হইয়া রাজ-লক্ষণাক্রান্ত বালক গোষ্ঠ-লীলায় কালাতিপাত করেন। একদিন মধ্যাহ্নে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রক্ষণীয় যূথের একটী পয়স্বিনী গাভী দলভ্রষ্ট হইয়া একাকী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল, (পূর্ব্বে আর কয়দিন তিনি ঐ গাভীটীকে ঐরূপে যাইতে দেখিযাছিলেন।) অদ্য গাভী-টীকে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এবং কোন সঙ্গীকে না বলিয়া একাকী গাভীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন,—অরণ্য-মধ্যে আশ্রম সদৃশ একটী দিব্যস্থান, তথায় একস্থানে তাঁহার পয়স্বিনী গাভী দণ্ডায়মানা, আর তাহার স্তন হইতে ক্ষীরধারা স্বতঃ নিঃসৃত হইয়া, তন্নিম্নস্থ একটী ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির উপর পড়িতেছে; আর অদূরে এক জটাজূটধারী স্বর্গীয় মহাপুরুষ অজিনাসনে আসীন হইয়া, ধ্যান-স্তিমিত-নয়নে উপবিষ্ট আছেন। বাপ্পা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যোগীর যোগভঙ্গ হইল, তিনি হস্ত-সঙ্কেতে বালককে নিকটে উপবেশন করিতে আদেশ

করিলেন। বাপ্পার শরীরে রাজ-চক্রবর্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ বিদ্যমান দেখিয়া, সন্ন্যাসী সাদর সম্ভাষণে তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করতঃ, তাঁহাকে বহুবিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, এবং প্রতিদিন সেই সময়ে তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। বালক গাভী লইয়া বাটী আসিল; কিন্তু সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

মহাপুরুষের আদেশানুসারে বালক প্রত্যহ যথাসময়ে বিবিধ বন্যফল পুষ্প ও দুগ্ধাদি লইয়া সন্ন্যাসিসমীপে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই "একলিঙ্গ" মহাদেবের ও সন্ন্যাসীর পূজা করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ-শ্রবণান্তর সন্ধ্যাকালে গো-সমূহ লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিয়দ্দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদিন সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ বাপ্পাকে কহিলেন,—"আমার আর এস্থানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।" তিনি চিতোরের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"তুমি এই বিস্তৃত প্রদেশের রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া ওই স্থানে রাজ্যস্থাপন করিবে; এই মহেশ্বর "একলিঙ্গ"ই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা হইবেন, তুমি ইহার নামে—ইহার 'দিওয়ান' হইয়া, রাজ্যশাসন ও ইহার সেবা করিবে; আর তোমার উপাধি "রাণা" হইবে। অদ্য বিদায় লও, কল্য অতি প্রত্যূষে এখানে আসিও, আমি যাইবার সময় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।"

প্রাতঃ-সমীরণের প্রসাদে ক্লান্ত শ্রান্ত বালক বাপ্পা প্রদোষে শয্যা-পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অরুণোদয়ে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সেই মহাপুরুষ দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধ-পথে উত্থিত হইতেছেন। বাপ্পাকে দেখিবামাত্র রথ হইতে উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন,—"আর সময় নাই, সত্বর মুখব্যাদান কর!" বালক হতবুদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে যেমন মুখব্যাদান করিল, অমনি সন্ন্যাসী স্বীয় নিষ্ঠীবন তদীয় মুখে অর্পণ করিলেন; কিন্তু বালক ঘৃণা-প্রবৃক্ত তৎক্ষণাৎ তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিল। তখন সেই

স্বর্গীয় সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বলিয়া গেলেন,—“এই সুধামৃত উদরস্থ হইলেই তুমি অমরত্ব লাভ করিতে; কিন্তু নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইলে। তবে যে অস্ত্রের অভেদ্য হইবে, ইহা স্থির-নিশ্চয়।”

বাপ্পা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় এই সকল অসামান্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতঃ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে বিবিধ বন্য-ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া, ভক্তিভরে ভগবান্ একলিঙ্গের পূজা-প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে দেখিতে পাইলেন, এক অলোকসুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা; তিনি সহাস্যে বাপ্পাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“বৎস! এই অক্ষয় কবচ ও তরবারি গ্রহণ কর, অবিলম্বে চিতোরে গমন করিয়া তত্রত্য রাজসিংহাসন গ্রহণ কর, রাজা হইয়া এই একলিঙ্গের মন্দিরের পার্শ্বে “সিংহবাহিনী মূর্ত্তি” প্রতিষ্ঠা করিও—তিনিই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী হইবেন।” এই কথা বলিয়া রমণী অন্তর্হিতা হইলেন।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, বাপ্পা কথা প্রসঙ্গে মাতার নিকট চিতোরের কথা উত্থাপন করিয়া জানিতে পারিলেন, চিতোরের রাজা তাঁহার মাতুল।

পরদিবস প্রাতে তিনি মাতা ও কতিপয় ভীল বালকের সহিত চিতোর যাত্রা করিলেন। চিতোর-রাজ বাপ্পার মাতার মুখে সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া ও বাপ্পার অসাধারণ রাজসৌন্দর্য্য দেখিয়া বাপ্পাকে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের সামন্তপদে নিযুক্ত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই বর্ব্বর জাতি চিতোর আক্রমণ করিল, রাজা এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। বাপ্পা এই সংবাদ শ্রবণে কতিপয় অনুচরবর্গের সহিত অনায়াসে শত্রু-কুল নির্ম্মূল করিয়া চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং একলিঙ্গ ও সিংহবাহিনীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, মহাসমারোহে দেব দেবীর সেবা চালাইতে লাগিলেন। এই সকল দেবমূর্ত্তি ও তদীয় গিরি-দুর্গ আজিও “হিন্দু-সূর্য্য মহারাণা বাপ্পারাওএর” নাম ঘোষণা করিতেছে। ইনি ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরে রাজ্যস্থাপন করেন।

রাজপুত কবি ও ঐতিহাসিকগণ রাণার বংশকে "অযোধ্যাধিপ মহারাজ রামচন্দ্রের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন; তাঁহাদের গণনানুসারে "বাপ্পারাও" রামচন্দ্রের অশীতি পুরুষ অধঃস্তন।

কিয়ৎকাল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সমস্ত মিবার রাজ্য শাসন করিয়া, মহারাণা দিগ্বিজয়ে নির্গত হন এবং তদানীন্তন প্রবল ইরান্, তুরান্ কাবুলীস্থান, জেবুলীস্থান প্রভৃতি প্রদেশে স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীন করেন। কথিত আছে,—তিনি হিন্দু হইয়াও উক্ত পরাজিত ম্লেচ্ছ রাজগণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। পরাজিত নরপতির কন্যার পাণিগ্রহণ-প্রথা, প্রাচীন ইতিহাসের কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় তৎকালে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" চাণক্য পণ্ডিতের এই নীতিই সম্যক্ প্রবল ছিল।

যাহাই হউক বাপ্পারাও কিয়দ্দিবস পইবাণ দেশে যবন জাতির সহিত সস্ত্রীক বাস করিয়াছিলেন, এবং সেই ম্লেচ্ছ দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, দেশপ্রথানুসারে ম্লেচ্ছেরা তদীয় শবদেহ দগ্ধ না করিয়া সমাধিস্থ করিয়াছিল।

মিবারের রাজপুত রমণীও তাঁহার মহিষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই মহিষীর গর্ভজাত সন্তানেরাই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সমরসিংহ, ভীমসিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত নরপতিগণ এই মহারাণা বাপ্পারাওএর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সকল মহাবীরের বীরত্বকাহিনী ভারত ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মোগল সম্রাটের অভ্যুদয়ে যখন অনেক রাজপুত যবনের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন কেবল এই মহারাণা বাপ্পারাও-এর বংশধরগণ মুসলমান সংস্পর্শে আপনাদিগের বংশ কলঙ্কিত করেন নাই। এই জন্যই রাণার বংশ সমগ্র রাজপুতদিগের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানার্হ।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

মোহ।

যা'বে যদি যা'ক্ তবে, সবই চ'লে যা'ক্।
এ জীবন ধরা হ'তে,
যা'ক্ মরণের পথে,
হৃদয় হউক দগ্ধ,—সৃষ্টি শূন্য ফাঁক্।

ভালবেসে অবশেষে এই হ'ল সুখ,—
শিরে শিরে হলাহল,
মরমেতে অশ্রুজল,
মৃত্যু-হীন অন্তর্জলি, বজ্রে ভাঙা বুক।

তৃষ্ণায় ফাটি'ছে ছাতি, আঁধার ধরণী;
সমুখে সরসী জল,
অতি স্নিগ্ধ সুশীতল,
পরশে গরল তাহে উঠিবে অমনি!

নয়নের আগে ঝোলে আকাঙ্ক্ষার ফল,
উছল অমিয়-মধু,
দূর হ'তে দেখি শুধু,
ছুঁইতে যাইলে কাছে জ্বলন্ত অনল!

যুগ যুগান্তর ধ'রে র'বে একঠাঁই
চোখোচোখি তরুলতা,
বুকে বাসনার ব্যথা,—
আলিঙ্গনে দাবানলে পুড়ে হ'বে ছাই!

যুগপৎ স্মৃতি আর নয়নের দেশে
কে তুই দাঁড়ালি বল?
চোখে তো'র অশ্রুজল!—
ওকি বালা। কেঁদে তুই কাঁদাবি কি শেষে?

আবার আবার কিবে জ্বালিবি অনল?
পরশনে—আলিঙ্গনে,
পোড়া'বি কি দুইজনে?
অধর-অমৃতে পুনঃ পিয়াবি গরল?

থাক্ দূরে, আর নারে, ভাঙ্ এ স্বপন,—
আজি এ উন্মত্ত মোহে,
ছাড়াছাড়ি হ'ক্ দোঁহে,
সে রহস্য-কথা আর তুলো না কখন্।

সে গানের ছত্র যদি পড়ে কভু মনে;
ভেবো কোন সন্ধ্যাকালে,
কে গেয়ে গিয়েছে চ'লে,
তা'রি ভাঙা ভাঙা সুর রয়েছে শ্রবণে।

এ জনমে সে বাসনা পূরিবে কি আর?
যে বিনা চলে না দিন,
সে হ'বে বিস্মৃতি-লীন,
জীবন হারা'য়ে হ'বে জীবন-ব্যাপার?

যাই হ'ক, প্রিয়ে! তুই দাঁড়া একবার;
ওই মুখ চিরতরে,
দেখে ল'ব আঁখি ভ'রে,
যে মুখে হাসিত বিশ্ব, হাসিত সংসার।

দেখেনিয়ে প্রেম-কাব্য করি সমাপন;
একে একে স্মৃতিদলে,
ফেলে দি' জাহ্নবী জলে,
মরণে জীবন-ব্রত করি উদযাপন!

চাহি না ভুলিতে, তবু ভুলিবারে হ'বে।
আপনি আপন প্রাণ,
দিতে হ'বে বলিদান,—
হায় হায়! ভালবেসে কে ভুলেছে কবে?

জীবন্ত সে' প্রেম, সখি! নহে ভুলিবার;
তথাপি সংশয় যদি,
স্পর্শে কভু তব হৃদি,
আমার শ্মশানে তুমি যেও একবার।

চূর্ণ এক অস্থি-খণ্ড তুলে ল'য়ে, হায়!
অতীত স্বপন-সুখে,
একবার ধোরো বুকে,—
প'ড়ে দেখো, ওই নাম লেখা আছে তা'য়!

দোকানদারী।

সাংসার একটা প্রকাণ্ড বাজার; নর নারী সব ক্রেতা বিক্রেতা। তুমি সেই বাজারে ঘব বাঁধিযাছ, কেনা-বেচা তোমাকে কবিতেই হইবে। দোকান-পাট না বসাইলে, হাঁক-ডাক গলাবাজী করিতে না পারিলে, এখানে তোমায় কেহ চিনিবে না, আদর করিবে না। যেখানে ষোল আনা দোকানদারী, সেখানে তুমি একাকী কোন উচ্চতর উদ্দেশে চালিত হইয়া তাহার প্রতিবাদী হইলে, তোমাকে গলাধাক্কা খাইযা, সাশ্রুনযনে ফিরিয়া আসিতে হইবে; ইহা ভাবিয়া তুমি বিস্মিত হও কেন?

বাজারে যখন আসিযাছ, তখন তুমি ক্রেতাই হও, আর বিক্রেতাই হও, দোকানদারী তোমায় শিখিতে ত হইবে! ইহাতে ভালরূপ অভ্যস্ত হইতে না পার, এখানে তোমার আদর অভ্যর্থনা হইল না। যে যত পাকা দোকানদার, তাহার তত পসার প্রতি-পত্তি। পাকা দোকানদার হইতে হইলে, চক্ষের পরদা দু'খানি তুলিযা রাখিতে হইবে, ঝুটা মালের আমদানী করিতে হইবে; সেই হিসাবে গলা শানাইযা হাঁক-ডাকের সুর চড়াইতে হইবে। অন্যথা তুমি দোকানদারী করিতে পারিবে না। দোকানে ভাল মাল থাক, আর নাই থাক, মাল কাটতির দ্বারা উদর-পূর্ত্তির জন্য তোমাকে শতমুখে বিক্রেয় মালের গুণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। এক কথায়, নিজমুখে আত্ম-ঘোষণা করিতে হইবে; তিলকে তাল করিয়া তুলিতে হইবে। না পার, তুমি আর দশজনের বিষ-নয়নে পড়িবে, উপহাসের পাত্র হইবে। সুতরাং এ সংসারে তোমার স্থান হইবে না।

খাঁটী জিনিস বিক্রয়ের নিমিত্ত বাজারে দোকান বসাইবার আবশ্যকতা হয না, ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গলাবাজী হাঁকাহাঁকিরও প্রয়োজন হয় না। যাহা খাঁটী—তাহা—সাধারণের নীচ-স্বার্থ-প্রণোদিত উন্নত-আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-সঞ্জাত প্রবল কোলাহলের

কেন্দ্রস্থল—বাজারে—দোকানে মিলে না, তাহা—সংসার-বাজারের বহুদূরে—সাধারণ দৃষ্টির নিভৃত অন্তরালে—অতল-জলধি-হৃদয়ে লুক্কায়িত শুক্তি-কোটরস্থ রত্নের ন্যায় বিরাজ করে; বহু আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তবে লাভ করিতে পারা যায়।

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই যে মানব-সমূহ ছুটাছুটী করিয়া কেনা-বেচা করিতেছে, ইহার ভিতরে খাঁটী মাল চিনে কয় জন? দেখিতেছি—সকলেই নকল-প্রিয়, ঝুটা মালের খরিদার। কিন্তু কেহ কখনও চিনিলেও, দোকান সাজানের পরিপাট্যে, জিনিসের বাহ্য চটকে এবং দোকানীর হাঁক-ডাকের চোটে দিশে-হারা হইয়া প্রাণান্ত পণ করিয়াও সেই ছাইমুঠা সোণামুঠা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; এক কিনিতে আসিয়া, আর কিনিয়া লইয়া যাইতেছে; পদে পদে প্রতারিত হইতেছে।

এই প্রকাণ্ড বাজারের যে পটীতেই যাইবে, সেই খানেই দেখিতে পাইবে, খাঁটী মালের নাম গন্ধও নাই, কেবল ঝুটা মালের আমদানী—ছড়াছড়ি; দোকানদারীর বাড়াবাড়ি, হুড়াহুড়ি। প্রেমের পটীতে যাও, দেখিবে কত নর নারী প্রেম-পসরা মস্তকে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। আর তাহারাই কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদে প্রমোদে, হাসিয়া খেলিয়া দিনপাত করিতেছে। যে সেরূপ করিতে পারিতেছে না, সে কুন্দনন্দিনী কিম্বা কর্ডেলিয়া, অক্টেভিয়া কিম্বা এবেলার্ডের ন্যায় এককোণে নীরবে কাঁদিয়া ঝরিয়া যাইতেছে; তাঁহাদের খোঁজ-খবর কেহই লইতেছে না।

ঘোঁজের ভিতরে—যেখানে লোক-সমাগম বিরল,—সেখানে দোকান বসাইলে ব্যবসায় ভাল চলে কি? কখনই না। সেই জন্য বহুলোকের দৃষ্টিপথে—সদর—বড় রাস্তার উপর দোকান খুলিবার জন্য সকল দোকানীই ব্যস্ত। অধিকন্তু যদি ঘানীতে যুক্ত ভ্রাম্যমাণ বলদের কণ্ঠসংলগ্ন অবিশ্রান্তশব্দকরী ঘণ্টার ন্যায় একটা ঘণ্টার ব্যবস্থা করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার

দোকানে খরিদ্দারের কখনই অভাব হইবে না। সুতরাং এখানে নীরবভাবে আড়ালে কোন কার্য্য করিতে যাওয়া বাতুলের বাতুলতা-মাত্র। হৃদয়ের অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণায় ঘরের কোণে চুপে চুপে অঞ্চলে মুছিয়া ফেলা দুই বিন্দু চক্ষের জলের মর্ম্ম, এখানে কেহ বুঝিবে না। স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে যদি সংসারটা সন্ত্রাসিত—বিকম্পিত করিতে পার, তবেই তোমার দুঃখ-যন্ত্রণার গুরুত্বের কতকটা উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃ, প্রাণে দরদ হউক বা না হউক, চক্ষে জল না আসিলে, তেল দিয়াই হউক, বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে ক্রন্দনের ছলে খানিকক্ষণ চেঁচাইতে পারিলেই, তোমার কাজ হইল। দেখিবে, কতজনে কতভাবে চিরাভ্যস্ত 'আহা' 'উহু' বোলে তোমাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইবে। মোদ্দা কথা, নিছক দোকানদারী চাই।

বিদ্যাবুদ্ধির পটীতে দেখিবে, যে সব ব্যবসায়ীর গুদামে কিছু নাই, তাহাদেরই সাজসরঞ্জাম, হাঁক-ডাক বেশী বেশী। অশ্বমেধ ঘোড়ার কপালস্থিত জয়পত্রবৎ স্ব-লিখিত আত্মঘোষণা-প্রচারিণী বিজ্ঞাপনী আঁটিয়া সকলকে উত্যক্ত. ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অহঙ্কারদৃপ্ত উদ্ধত আস্ফালন উল্লম্ফন দেখিয়া, যাহাদের গুদামে বা ঘটে কিছু আছে, তাহারা শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা করিবার জন্যই বোধ হয়, শত হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিতেছেন।

সুনামের পটীতে দেখিবে, যাহার ঘরে সুনাম-অর্জ্জনের জন্য বিনিময় করিবার মত কোন জিনিষই নাই, সেই আপন নামের জয়ঢাকটা অপর একজনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া আপনিই তাহাতে সজোরে কাটি মারিতেছে, আর তালে তালে নৃত্য করিতেছে, অপরে বাহবা না দিলেও, নিজেই বাহবা দিয়া আসর মাত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। প্রকৃত দোকানদারী ইহাকেই বলে।

ধর্ম্মহাটায় গিয়া দেখ, যত ব্যবসায়ী, ঘরে যে পরিমাণে মাল মজুত আছে, তাহার দ্বিগুণের বায়না লইয়া, অপর সকলকে

স্তম্ভিত করিয়া বাহাদুরী লইতেছে। আর সেই ছিটা-ফোঁটা মালের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনোদ্দেশে গলাবাজীর চোটে আর লেখনীর ঠেলায় বিধাতার সৃষ্টি যেন উল্টাইয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে। সৃষ্টির গাঁথুনী বা বনিয়াদ বড় শক্ত, তাই সে চেষ্টা আজিও সফল হইতেছে না।

ভাই! এইরূপ সকল বিষয়েই। তাই বলি, যদি সংসারে সংসারী সাজিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই দোকানদারীতে নিপুণতা লাভ কর। সহজ-সাধ্য না হইলেও, চেষ্টা কর। বত্রিশখানা তাস চেনায় বড় কিছু বাহাদুরী নাই, যা কিছু বাহাদুরী ঠিক হিসাব রাখিয়া খেলাতে জয়লাভ করা। অনেক রকম যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পূরণ এবং কৌশল চাতুরীতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে, তবে লোকে সুদক্ষ সুনিপুণ দোকানদার হইতে পারে। দোকানদারীর কোড্ (Code) সম্পূর্ণ আলাহিদা। এই কোডের যে ভাল করিয়া অভ্যাস-আলোচনা করিবে, তাহারই এই সংসার-বাজারে জয়লাভ ধ্রুব-নিশ্চিতই। যে তাহা না পারিবে, তাহার সংসার-পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। অতএব, যখন দোকান খুলিয়া বসিয়াছ, তখন পেশাদারী করাই সুবুদ্ধিসম্মত এবং তাহাই কর, না পার, পাততাড়ী গুটাইয়া এ ক্ষেত্র হইতে ঝটিতি প্রস্থান কর, সময় থাকিতে দুকূল বজায় রাখিবার চেষ্টা কর।

স্মৃতি।

দূরে দূরে—তুমি আমি কতদিন হায়!
হ'বে কি না এ জনমে দেখা পুনরায়!
তবু সেই ভালবাসা হৃদয়ে জাগায়—
অযুত মধুর আশা—দীপ্ত কল্পনায়!
পাষাণ কঠিন চির—নির্ম্মম—নির্দ্দয়—
সংসার আঘাতে যবে বিক্ষিপ্ত হৃদয়;

একটু করুণ দৃষ্টি, একটী সদয়
সস্নেহ বাক্যের তরে চারিদিকে চায় ;
গত স্বপনের মত চির মধুময়
তোমারি সে চারুমুখ—ভালবাসা স্মৃতি
জীবনে বিশ্বাস আনে ; কি এক আশায়
ভ'রে দেয় আমার নৈরাশ্য-ক্লান্ত-হৃদি।
তুমি সই—আছে তব ভালবাসা স্মৃতি
রাবণের চিতাসম—কঠোর অবিধি!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

(৮)

সারদাসুন্দরীর সেই দিন দেশে আসিবার কথা। রমাপ্রসাদ নিজের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, সারদাসুন্দরীর জেদে তাহাকে আগে হইতেই বাটী পাঠাইলেন। তাহার আসিবার সংবাদ দুই স্থানেই প্রেরিত হইলেও, কিন্তু মহামায়া সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল। বাড়ীর দাস-দাসী সারদাসুন্দরীকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। রমাপ্রসাদের মা বৃদ্ধা বড় একটা বাহিরে আসিতেন না। কাজেই মহামায়ার এই অন্যায় আদর-পীড়নে বাধা দিতে শীঘ্রই সে স্থানে আসিবার বড় একটা কেহ ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া, বালিকা মহামায়ার চুম্বন তরঙ্গে সলজ্জ মুখখানি ভাসাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বাস ছিল, শীঘ্রই মা আসিয়া তাহাকে এই অপরিচিতার অঙ্ক-কারাগার হইতে মুক্তি-প্রদান করিবে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল, মা আসিল না। আর মহামায়াও নিজে কি করিতে আসিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছিল। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' —কেবল বালিকাকে মা বলিবার জেদ করিতে লাগিল। বালিকা চারিদিকে বারবার চাহিল—মা আসিবার কোন নিদর্শন দেখিল না। তখন মুক্তির অন্য উপায় না দেখিয়া, অগত্যা মহামায়াকে মাতৃসম্বোধনরূপ উৎকোচ প্রদান করিল।

এমন সময় বালিকার মাতা তথায় আসিয়া পড়িল। মা দেখিল, কন্যা এক অপরিচিতার কোলে উঠিয়া তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে। আর দেখিল, তা'র দুটী পদ্মপলাশে জল টল টল করিতেছে।

বালিকার মাতাও সারদাসুন্দরীর গৃহে নবাগতা। সেও কখন সারদাসুন্দরীকে দেখে নাই। কাজেই মমতাময়ী মহামায়াকে সে একেবারে সারদাসুন্দরী স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল—কতক্ষণ আসিলে বউ?

মহামায়ার কুটুম্বিনী সম্বন্ধে নূতন পুরাতনত্ব ছিল না, পরিচয় অপরিচয় ছিল না। যেখানে তৃপ্তি পাইত, সেই খানেই পরিচিতার মত ব্যবহার করিত,—পরিচয় হইতে হয়, পরে হইবে। মহামায়া বালিকার মাতার প্রশ্নে উত্তর না দিয়া বলিল,—"এটি কি ভাই তোমারই মেয়ে?"

বালিকার মাতার মুখে সহসা বিষাদের ছায়া পড়িল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, আধ জড়ান স্বরে বলিল,—

"কেমন করিয়া বলিব?"

মহামায়া তা'র মুখের দিকে বেশীক্ষণ চক্ষু রাখিবার অবকাশ পায় নাই। সে বালিকার মুখের সৌন্দর্য্য বারবার দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতে ছিল না, তা'ই বালিকার মাতাকে প্রশ্ন করিয়াই মুখ ফিরাইয়া, বালিকার মুখ আবার চুম্বিত করিল। তাহার প্রশ্নে মুখ না তুলিয়াই বলিল,—"বলিতে পা'র আর না পার, এখন হইতে এই দুষ্ট মেয়েটার "মা" বলার অর্দ্ধেক ভাগ আমায় দিতে হইবে।"

এই কথা বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বনাশী মহামায়া কত চিন্তাই করিয়া লইল্। মুহূর্ত্তমধ্যে রাশি রাশি চিন্তার আবরণে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে এবারেও বালিকার পরিচয় লইবার অবকাশ পাইল না।

বালিকার মাতা তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে মহামায়া বালিকার নাম জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল 'নলিনী'। মহামায়ার সর্ব্বাঙ্গ আবার শিহরিল। বালিকার মাতার ললাটের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সেখানে সিন্দূর দেখিল না। বাম-হস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল হাতে লোহা নাই। জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এ অবস্থা কতদিন হইয়াছে?"

"দুই মাস।"

"স্বামীর কি হইয়াছিল?"

"কি হইয়াছিল?"

মহামায়া দেখিল, অপরিচিতা যুবতীর সুন্দর মুখশ্রী সহসা রক্ত-রাগ-রঞ্জিতা হইয়া গেল।

"কি হইয়াছিল? কি বলিব ভাই?—বলিলে বিশ্বাস করিবে কি? একটা কালসর্প আর কালনাগিণী, আমার স্বামীর মস্তকে দংশন করিয়াছিল। ঘরে চল বসিয়া বসিয়া সমস্ত দুঃখ-কাহিনী বলিব।" বলিতে বলিতে যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

মহামায়ার পা টলিতে লাগিল। তা'রপর যুবতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল;—"আমার স্বামী মেদিনী-পুরের কাছারিতে কাজ করিতেন—"

মাহামায়া দাঁড়াইল—বালিকাটীকে কোল হইতে নামাইল। তার পর বলিল,—"একটা কায আছে, সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছি; আসিয়া সমস্ত কথা শুনিব।"

প্রয়োজনের কথা শুনিয়া যুবতী মহামায়ার হাত ছাড়িয়া দিল। মহামায়া বরাবর বাটীর বাহিরে আসিল—আবার পাল্কীতে উঠিয়া বাটী ফিরিয়া গেল।

মহামায়া চলিয়া গেলে, বালিকা মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"হাঁ মা! ও কে গা?"

মা বলিল,—"তোর আর এক মা।"

বালিকা বলিল,—"তবে এতকাল দেখি নাই কেন?"

মা বলিল,—"আমাদের অদৃষ্ট।"

তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল—দাঁড়াইয়া অপরিচিতার ফিরিবার আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল—অপরিচিতা ফিরিল না। তখন মা মেয়েকে ঘরে যাইতে অনুরোধ করিয়া, আপনি বাটীর বাহিরে গেল। সেখানেও অপরিচিতাকে দেখিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পল্লিগ্রামের পথ, দুই একজন কচিৎ আসিল—চলিয়া গেল অপরিচিতার আসিবার কোনও নিদর্শন দেখা গেল না। যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময় ক্রমে উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। বাড়ীতে পা দিয়াই, কোথায় ফিরিল? গৃহ-প্রবেশোন্মুখী 'আসি' বলিয়াই চলিয়া গেল, এখনও ফিরিল না কেন? সে কি সারদা-সুন্দরী? যুবতীর সন্দেহ আসিল। মহামায়াকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, মনে করিল। মনকে—সেই কোথায়—ফিরাইবার বহু চেষ্টা করিল—পারিল না।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন অপরিচিতাকে ফিরিতে দেখিল না, তখন যুবতী বাটী ফিরিতে মনঃস্থ করিল। দুই একপদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দূরে পাল্কীবাহকের কণ্ঠশব্দ তাহার শ্রুতি-গোচর হইল। যুবতী বুঝিল অপরিচিতা আবার ফিরিতেছে। সে আবার অগ্রসর হইল। বহির্ব্বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, বাটীর দাস-দাসী পাল্কীর সহিত ছুটিয়া আসিতেছে।

বাটীর উঠানে আসিয়া পাল্কী থামিল। দাসী যুবতীকে দেখিয়া মায়ের শুভাগমনের সংবাদ দিল। যুবতী আগুবাড়াইয়া আনিতে গিয়া দেখিল—একি! এই যে সারদাসুন্দরী।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৭৩

তুমি গো প্রসন্নময়ী ফুল্ল পারিজাত,
নর-পশু নাহি চিনে,
দলে তাই অযতনে,
তবুও বিলাও জীবে সৌরভ সুজাত।

৭৪

মধুর চরিত্র তব পবিত্র সরল,
মধুর তোমার কেশ,
মধুর তোমার বেশ,
মধুর মাধুরী হেন ধরায় বিরল।

৭৫

কাননে কুসুম ফোটে, কুন্তল কবরী
সাজাইতে সযতনে,
করে চেষ্টা প্রাণপণে,
ঘোর নিশাকাশে যেন তারকা সুন্দরী।

৭৬

অস্থিরা হয়েছে হায় কুসুমের মালা।
বলে "মাথে নাহি র'ব,
গলা ধরে দুলে যা'ব,
মুখপানে চেয়ে র'ব যেন মুগ্ধবালা।"

৭৭

ছিঁড়িল কুসুম দাম পড়িল চরণে,
কহিছে কুসুম কলি,
'পেয়েছি সুধার স্থলি,
এ চরণ ধ্যান মম শয়নে স্বপনে'।

৭৮

যামিনীতে জাগে যত তারকা-সুন্দরী,
হেরিতে তোমার হাসি,
নীলাকাশে হাসে শশী,
প্রমত্ত সবাই তা'রা অন্ত বিভাবরী।

৭৯

পাখী গায় শাখী পরে কাকলী লহরী,
কহিছে—কূজন তার,
এ সংসারে হবে সার,
পশে যদি শ্রুতিমূলে তোমার সুন্দরী।

৮০

মকরন্দ মধুপানে মধুপ মোহিত,
বলে ফুল "কোথা গেলি, ?
একা ফেলে পলাইলি,
গুঞ্জে গুঞ্জে পড়ে পদে করগো বিহিত।

৮১

কতরূপে বিরাজিতা মহিলা সংসারে,
তুমি গো দয়ার নদী,
তুমি না থাকিতে যদি,
অতিথি ফিরিত গৃহে বিমুখ অন্তরে।

৮২

মরি মরি পেতে তব দয়া ভালবাসা!
বিহঙ্গম ত্যজে বন,
আসে তব নিকেতন,
প্রেমের শৃঙ্খল পরে নাহি ভয় বাসা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

ভেক।

ভেখ নয—ভেক। ভেখের কথা আব এক সময বলিব; আজ ভেকেব কথাই বলিযা যাই। বোধ হয, ভেক যত ক্ষুদ্র-জীব, কথাটা তত ক্ষুদ্র হইবে না।

পল্লীগ্রামে একটা প্রকাণ্ড ছোট-বড় আম-জাম কাঁঠালের বাগানেব এক পার্শ্বে আমার বাড়ী, বাড়ীব সদবে পাড়াব বোসেদেব প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, পূর্ব্বে সেই পুকুবে অনেক জল ছিল, জকেবও বাস ছিল, আবাব জটেবুড়ীব ভয়ে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলে মেযেবা ভযে জলে নামিযা স্নান কবিতে পারিত না। এখন বোসেদেবও দশা যেমন, পুকুরেব দশাও তেমনি; জক বা জটে-বুড়ী থাকুক বা না থাকুক, জল কিন্তু নাই বলিলেই হয। পাটা সেওলায পুকুব ভবিযা গিযাছে, পাঁকও বড় কম নয।

আমাব ঘবেব জানালা হইতে পুকুবটী বেশ দেখিতে পাওবা যায। গ্রীষ্মকালে আমি বাড়ী আসিয়া সেই জানালাব নিকট বসিযা থাকি। এবাব বড় গ্রীষ্ম, জানালাব পার্শ্বে আম গাছেব ডালে বসিযা "ফটি-ক্‌-ক জল" পাখীগুলা মধ্যাহ্নে মনেব সাধে আকাশেব আবাধনা কবিতেছে, কতকগুলা ব্যাং বোসেদেব সেই পচা পুকুবেব পাঁকে ও পাটা-সেওলাব মধ্যে লাফালাফি, আব গ্যাঁ—এঁ্যা গোঁ—ওঁ কবিয়া চাবিদিক নিনাদিত কবিতেছে, আমি দেশেব দারুণ জলকষ্টেব কথা বাঙ্গালা কাগজেব সম্পাদক ভাযা-দিগের নিকট লিখিযা পাঠাইব ভাবিযা মহা আড়ম্বব কবিযা কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিতেছিলাম; এমন সময় ব্যাংএব ঐ ডাক শুনিযা হাঁ-কবিয়া আকাশ পানে চাহিযা রহিলাম, ভাবিলাম আব ভয নাই; কিন্তু ঘন ঘন আকাশেব দিকে চাহিযাও কোথাও বিন্দুমাত্র নবঘনের সঞ্চার দেখিতে পাইলাম না। ব্যাংগুলা কিন্তু বিকট চীৎকাব কবিতেছে, আমি একপ্রকাব বিরক্ত হইযা উঠিলাম, মনে মনে নিরীহ ভেক জাতিব উপর অবিরাম গালি পাড়িতে

লাগিলাম, এমন সময় আমার গদ্য পদ্য বিধায়িনী লক্ষ্মী-সরস্বতী-স্বরূপিণী নয়ন-মন-বিমোহিনী শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা গোদ অলঙ্কার ধ্বনিতে গৃহ-মন প্রকম্পিত করিয়া কিঞ্চিৎ মিঠে হাসি হাসিয়া ও সেই সঙ্গে প্রেম-মদালসিত-নয়নে অপাঙ্গে চাহিয়া নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তে আমার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ভাবিব না দেখিব,—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, যেমন হাঁ করিয়া বসিয়া ছিলাম, তেমনই স্থাণুবৎ বসিয়া রহিলাম। তন্বঙ্গী তখন নিকটে আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"শ্রীযুত কি এখন রাজস্ব কমিসনে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যের ভাবনা ভাবিতেছেন—আমরা কি কেও নই?"

আমি শশব্যস্তে বলিলাম,—"না গো না, ঐ বোসেদের পুকুরে ব্যাংগুলা ডাক্‌ছে, তাই শুন্‌ছি।"

সুমধ্যমা তখন কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"পোড়ারমুখো ব্যাংগুলো কেবল ডেকে ডেকেই মর্‌ছে, জল কোথায় তার ঠিক নাই। সেকালে ব্যাং ডাকলেই জল হ'ত, আর আজ-কাল দেখ না—মূলে মেঘেরই নাম নাই।"

এই বলিতে বলিতে সুহাসিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার এই কথায় আমার মনটায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কত কথা উদিত হইল, কি যেন ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরিয়া গেল। নিস্পন্দনয়নে প্রিয়তমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম, আমার ভাব দেখিয়া একটু চোখ টিপিয়া সুন্দরী বলিলেন,—"আবার কি পদ্য মনে পড়িল নাকি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ও গো না। তুমি ঠাট্টা কর কেন? ব্যাং ডাকলে এখনও জল হয়, তবে তেমন ডাকে কই?"

সুন্দরী অপেক্ষাকৃত উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি রকম?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম,—"হাঁ ভুলিযাছে, অবশ্য ভুলিযাছে, ব্যাংগুলা সুর হারাইয়াছে ঠিক সুরে ডাকিতে পারে না। মল্লার রাগে মেঘ হয়, জলও হয়; সেকালের ব্যাংগুলা মল্লারের আলাপ জানিত,

মল্লার গাহিত, তাই মেঘ হইত, জলও হইত; এখন উহারা তাহা নিশ্চয় ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা যেমন সকলই হারাইয়াছি, সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি, আমাদেব ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শিক্ষা নাই, সাধনা নাই, হৃদয় নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, প্রাণ ভরিয়া দেবতাকে ডাকিতে পারি না, দেবতাবাও দেখা দেন না, দুঃখও দূর হয় না। আমরা বলি—দেবতাদের দোষ, তাঁহাবা দেখেন না—দেখা দেন না—কিন্তু তা নয়—বুঝিযাছ কি? আমরা বাহ্যা-ড়ম্বরে ভুলিয়া বীজ-মন্ত্র ভুলিয়াছি, সন্দেহবাদী হইয়া ঈশ্বর বিশ্বাস হারাইয়াছি—সার ভুলিয়া অসারে মজিয়াছি, কেবল লোক দেখান উপাসনায় চটক দেখাইয়া বেড়াই, তাই দেবতার কৃপা-লাভ করিতে পারি না। আমবা যেমন অধঃপতিত হইয়াছি, ঐ হতভাগা ভেকগুলাও তেমনি অধঃপতিত হইয়াছে; উহারা কেবল জঙ্‌লা আলাপে মত্ত, হয় ত তাল-লয়-মান সকলই ভুলিয়া গিযাছে, সে জঙ্‌লা আলাপও বিশুদ্ধরূপে গাহিতে পারে না; মল্লাব ত আদৌ অবগত নহে, এখন বুঝিলে কেন দিনরাত ভেকগুলা ডাকিযা মরিলেও জল হয় না? শ্রীশ্যামলাল মজুমদাব।

স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কথা—শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ। সুর—শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

এস এস সবে সখিগণ মিলি' ভ্রমিব কুসুম-কাননে;
ভ্রমিব কুসুম-কাননে, তুলিব কুসুম যতনে।
মল্লিকা মালতী, বেল যুঁথি যাঁতি, ফুটিযাছে ফুল আব নানাজাতি,
হেলিছে, দুলিছে, মাতিছে, মহিছে, সুমন্দ মলয়-পবনে,
মলয মৃদুল বহনে।
কুহু কুহু কুহু কোকিল কুজন, হানি'ছে মরমে যেন পঞ্চবাণ,
বিনা প্রাণপতি বাঁচে কিলো সতী, দুরন্ত মদন-তাড়নে;
বাঁচে কি অবলা জীবনে।

আস্থায়ী।

সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নিঁ ধঁ ধঁ নিঁ সাঁ
এ স এ স স বে ০ স খি ০ ০
নি সাঁ ধ নি ধ প প ধ ধ ধ নি
গ ০ ণ ০ মি ০ লি ভ্র মি ব কু
নি নি নি নি সা ঋ সা নি সা সা গ
সু ম কা ন ০ নে ০ ০ ০ ভ্র মি
গ গ ম গ ম প ধ প ম গ গ ম
ব কু সু ০ ০ ০ ০ ম ০ ০ কা ০
গ ঋ গ ঋ সা ঋ সা নি সা নি ধ
০ ০ ন ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০
ধ নি ধ নি সা ঋ সা নি ধ প প
তু লি ০ ০ ০ ০ ব ০ ০ ০ কু
প ধ প ম প গ ম
সু ম ০ য ০ ত নে

প্রথম অন্তরা।

ম ল্লি কা মা ল তী বে ল
ফু তি জা তি
ফু টি যা ছে ফু ল আ
র না না জা তি হে লি ছে
দু লি ছে মা তি ছে মো
হি ছে সু ম ন্দ ম ল য় প
ব নে ম ল
য় মৃ দু ল ব হ নে

দ্বিতীয় অন্তরা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

# বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩০৪ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

(৯)

মেদিনীপুরের সেই ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ বায়ুরোগ ছিল। কৃষ্ণ-ধনের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইবে, এই বিশ্বাসে তাহার আনন্দ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে সেই কথা প্রতিবেশিগণের সকলকেই শুনাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালা পল্লীগ্রামের প্রতিবেশী, সেই কথা শুনিয়া যে বড় তৃপ্ত হইবে না, অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাহা ভাল বুঝিতে পারে নাই। যদি কেহ এই কথা শুনিয়া আত্ম-তৃপ্তির জন্য এইরূপ সম্বন্ধ-বৈষম্যের অসম্ভাবিতার উল্লেখ করতঃ তাহাকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তাহার সহিত কলহ বাধাইত। তা'রপর যখন সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণের মনক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহার উপর দুষ্ট প্রতিবেশিগণ তাহাকে দেখিলেই যখন রহস্য করিতে লাগিল,—তখন ব্রাহ্মণের

মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল ;—ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধের কথা কেহ তুলিলেই তাহাকে [illegible] [illegible] আরম্ভ করিল। [illegible] এমন হইল যে, কেহ যদি একটী ইঙ্গিত কবিত, তাহাও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণের সহ্য হইত না। ব্রাহ্মণ বাহিরেব লোককে গালি দিয়া নিবৃত্ত হইত না। বালিকা কন্যা ও অভাগিনী পত্নীকেও নিত্য তিরস্কাব কবিত। তাহাব বিশ্বাস হইয়াছিল, কন্যা বাটীর বাহিব না হইলে তাহাকে বাক্ষসী মহামাযা দেখিতে পাইত না, আব স্ত্রী নিমন্ত্রণ না যাইলে কন্যা শ্যামসুন্দরকে ফেলিয়া দিত না।

ব্রাহ্মণেব এ অবস্থা অধিক দিন বহিল না। ব্রাহ্মণ শীঘ্রই মাবা গেল। ব্রাহ্মণী কন্যাকে লইয়া দুঃখেব ভাব বহন কবিতে রহিল। ব্রাহ্মণেব বোগের চিকিৎসায বহু অর্থ ব্যয় কবায় ব্রাহ্মণী গহনাপত্র সব নষ্ট কবিয়াছিল. আট বৎসব অতি কষ্টে কন্যাটীকে পালন কবিতে তাহাব ধুলাগুঁডা যা' ছিল, সব ফুবাইল। আট বৎসবেব পব দেখিল, আব কোনমতে চলে না। তখন আত্মীয়েব সন্ধান তাহাব একান্ত প্রযোজনীয় হইযা পডিল। আত্মীয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাতুলবংশ নিস্ব, ব্রাহ্মণীব পিতৃকুল নির্ম্মূল। কুলীনদিগের অধিকাংশেরই মাতামহ মাতুলাদি লইযাই পবিচয়—ব্রাহ্মণী কোথায় যাইবে—কি কবিবে? আশ্রয পাইবাব জন্য অভাগিনী নিত্য ভগবানেব কাছে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পদিন হইল যোগ উপলক্ষে ব্রাহ্মণী কতকগুলি প্রতিবেশিনীব সঙ্গে কলিকাতায় আসিযাছিল। যাহাব কিছু নাই, সে কেমন কবিযা মেদিনীপুব হইতে এতদূবে আসিতে পাবিল?—এ প্রশ্ন কবিবাব পাঠকের অধিকার আছে। কিন্তু ধর্ম্মেব জন্য হিন্দু-নাবী কত কষ্ট সহিতে পাবে, আজও পর্য্যন্ত সমালোচনা, গবেষণা, গণিত, দর্শনে নির্ণয কবিতে পারে নাই। নিত্য-অনাহার-পীডিতা কেমন কবিযা অর্থ-ব্যয়ে অনুষ্ঠেয় ব্রত নিয়মাদি পালন কবে—এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব আজিও পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিব অগোচবে গুপ্তভাবে লুক্কাইত বহিযাছে।

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাতীরে রমাপ্রসাদের মা'র সহিত তাহার পরিচয় হয়। পরিচয়ে বৃদ্ধা একটী নিধি হাতে পাইল। এত আপনার জন এতকাল কোন অন্ধকারে লুকাইয়াছিল? বৃদ্ধা নিধিটীকে জোর করিয়া ধরিল, আর হাত-ছাড়া করিল না। মা ও মেয়েকে চক্ষুজলে সিক্ত করিয়া আপন আলয়ে ধরিয়া আনিল, আর মেদিনীপুরে যাইতে দিল না।

কুলীন যখন স্বকৃত ভঙ্গ হয়, তখন প্রায়ই বহু বিবাহ করিয়া বসে। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণের পিতা নিজে ভঙ্গ হইয়াছিল, আর সেই উপলক্ষে বিশ-পঁচিশটা বিবাহ করিয়াছিল। তাহার হিসাব তাহারই কাছে ছিল—সে আয়-ব্যয়ের তালিকা অন্যের জানা দূরে থাকুক, সপত্নীগণ আপনারাই তাহা জানিত না।

তাহাদের একটীর গর্ভে রমাপ্রসাদের মাতা, আর একটীর গর্ভে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুরে ও বৃদ্ধার পিত্রালয়ে বিংশক্রোশ ব্যবধান। ভ্রাতা ভগ্নী কেহ কাহারও অস্তিত্বও জানিত না। মাতৃকুলে বৃদ্ধার কেহ ছিল না। পিতৃকুলেও কেহ নাই জানিয়া বৃদ্ধা পরকে আপন করিয়া সংসার করিত। পুত্র, পুত্র-বধূ চিরদিনই প্রায় বিদেশে থাকিত, বৃদ্ধা কোন গঙ্গাহীন দেশের আঘাটায় মরণের ভয়ে তাহাদের সঙ্গে যাইত না। কাজেই দুই একটী প্রতিবেশিনীর ভার বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে লইয়াছিল।

গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কালীঘাটে আসিয়া বৃদ্ধা তাহার যুবতী ভ্রাতৃজায়া ও বালিকা ভ্রাতুষ্কন্যাকে পাইল। মেয়েকে কোলে তুলিয়া সহস্রবার মুখচুম্বন করিল, মাও কন্যার অপূর্ব্বলাভে একটু-আধটু ভাগ বসাইল,—বৃদ্ধা অত্যাধিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে মায়েরও মুখ-চুম্বন করিতে ছাড়িল না। তা'রপর ভাইএর অকালমৃত্যুর কথা শুনিয়া যত পারিল কাঁদিল—জন্মাবধি তাহার সহিত অপরিচিতা রহিল বলিয়া যত পারিল 'হায় হায়' করিল। তাহার পর এই অভাবনীয় ধন-প্রাপ্তির আনন্দের প্রতিদান স্বরূপ ষোড়শোপচারে মা কালীর পূজা প্রদানান্তর মা ও মেয়েকে ঘরে লইয়া আসিল।

বাটীতে আসিয়াই বৃদ্ধা এই আত্মীয়ার শুভাগমনের সংবাদ পুত্র রমাপ্রসাদকে প্রেরণ করিলেন। সারদাসুন্দরী, একে মহামায়া তাহার উপর আবার নূতন কুটুম্বিনী বাটীতে আসিয়াছে, এজন্য স্বামীকে দেশে ফিরিতে বড়ই পীড়াপীড়ি করিল। রমাপ্রসাদ নিজের এখনও যাইতে বিলম্ব দেখিয়া অগত্যা স্ত্রীকে পাঠাইলেন। সারদাসুন্দরী বাড়ী আসিয়াই একটী সুন্দরী যুবতীকে প্রত্যুদ্গমন করিতে দেখিল। বুঝিল—এইটীই তাহার নবাগতা মাতুলানী।

মাতুলানী কিন্তু সারদাসুন্দরীকে দেখিয়াই ম্লানমুখী হইয়া গেল। সে যে তখন নলিনীর নূতন মায়ের অস্তিত্ব মহামায়াতেই অর্পণ করিয়াছিল।

সারদাসুন্দরী অপরিচিতাকে দেখিয়াই বলিল,—"তুমিই কি আমার মামী?" মাতুলানী বিস্ময় বিমুগ্ধা, কথা কহিল না। সারদাসুন্দরী তাহার সকল কথাই শুনিয়াছিল। সুতরাং তা'র নীরবতায় বিস্মিত হইল না। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, অপরিচিতাকে একটী প্রণাম করতঃ তাহার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া চলিল।

(১০)

মহামায়া দুইখানি পত্র পাইল। একখানা খুলিয়া পড়িল—দেখিল স্বামীর পত্র।

"আমি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়াছি। বাটী যাইতে আরও দুই একদিন বিলম্ব হইবে। হাঙ্গামার কথাটা বাটী যাইলেই শুনিতে পাইবে। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, যাইতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইলে, অনাহারে শয্যায় ঢলিয়া পড়িও না। বাবাজীউ সুস্থ আছে, এক বন্ধুর বাড়ীতে পুত্রাধিক আদরে রহিয়াছে। তাহার কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার জন্য সেই বাসাই স্থির করিলাম। রমাপ্রসাদকে এই স্থান হইতে পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাইয়াছি। সারদা বাটী আসিতেছে। হরিপুরের বাটীতে আসিলেই

তাহাকে লইয়া আসিবে। তাহার আসিবার বিশেষ প্রযোজন আছে। আঁবুই মাকেও সেই সঙ্গে আনিতে পারিলে ভাল হয়।"

দ্বিতীয় পত্র সারদাসুন্দরীর, ফরিদপুর হইতে প্রেরিত।

"আমি মুঙ্গের হইতে এত শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি যে, তোমাকেও পত্র লিখিতে সময় পাই নাই। বাড়ীতে আসিয়া তোমার ওখানে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মা অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া, ফেলিয়া যাইতে পারিতেছি না। সেখানে শুনিযাছি দাদা কলিকাতায। আসিলেই শ্যামসুন্দরকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে। যদিই যাইতে দুইদিন বিলম্ব হয। ভাল কথা, তোমাকে আসিতেই হইবে। মা বলিলেন, তোমাকে অনেক দিন দেখেন নাই। কেন, আমি না আসিলে কি তোমার এখানে আসিতে নাই? আর এক কথা—বাড়ীতে আসিয়া একটী মামীশ্বাশুড়ী ও একটী ননদী পাইয়াছি। তাহাদের দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না—তাহারা এত সুন্দর! তোমাকে না দেখাইতে পারিলে ত তৃপ্তি নাই। তুমি যতশীঘ্র পার আসিবে।

'আসিবার এত জেদ করিতেছি কেন?—এমন ধারা অল্পভাষিণী লজ্জাশীলা মামীশ্বাশুড়ী বুঝি কোন ব'উ কোন জন্মে দেখে নাই। আমি কোথায তাহাকে লজ্জা করিব, না তা'র লজ্জা দেখিয়া আমাকে বিব্রত হইতে হইযাছে। তুমিই তা'র যোগ্যা সঙ্গিনী। দুইজনে মনে মনে কথাবার্ত্তা কহিবে, আর ইঙ্গিতে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে দুইটী উপন্যাসের সখী কেবল আলেখ্য শোভাকরী হইযা আমার চক্ষু সার্থক করিবে। আমি তাহাকে প্রথম দিন কোনও প্রকারে মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া মামী বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। পরদিন হইতে 'ভাই' বলা ধরিযাছি। সে এত মৃদু—এত ছোট—এত মিষ্ট। দেহযষ্টি স্পর্শভরে অবনত হইযা যায। আমার পক্ষে তাহাকে দূরে দূরে রাখিয়া দেখাই ভাল, সঙ্গী করা বড় সুবিধা হইবে না। জানই ত বারবৎসর পর্য্যন্ত আমি প্রাচীরে প্রাচীরে গাছে গাছে বেড়াইয়াছি। তারপর তোমরা

আবার আমার আস্পর্দ্ধা বাড়াইবার জন্য একটী স্বর্গস্পর্শী বৃক্ষের মাথায় তুলিয়া দিয়াছ। আমি মনের কথা চাপিতে জানি না, আর আজন্ম বানরী থাকিয়া কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হয় ভুলিয়া গিয়াছি। কি বলিতে কি বলিয়া শেষে কি তার মনোবেদনা আনিয়া উপস্থিত করিব? ভয় হয়, কেন না একেত বহুস্তের সম্পর্ক নয়—মা তাহাকে কন্যার মত দেখিতেছেন বলিয়া আমি তাহাকে ভগ্নীর মত দেখিতেছি—তাহার উপর হত-ভাগিনী এই বয়সে বঞ্চিতা হইয়াছে। এখানে আসিলে সমস্ত জানিতে পারিবে। তবে এটা না লিখিলে আমার পেটের ভাত হজম হইবে না,—মেদিনীপুরে যে সময় ছিলে, সে সময় কি সেই সর্ব্বনেশে মেয়েটাই তোমার চক্ষে পড়িয়াছিল? একটী চাঁদের কিরণ ছাঁকা রঙ মাখা, একটী ননীর পুতুল কি কখনও তোমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? তার কথাও কি কখন শুন নাই?

"যাক্ এখন আর সে কথায় কাজ নাই। মাথাগাও দাদা আসিলেই শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে করিয়া এখানে অবশ্য অবশ্য চলিয়া আসিবে।" [ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের প্রতি।

কাঁদ তুমি দীন দুঃখী—যাও ম'রে যাও,
জগতের ক্ষতি লাভ, নাহি কিছু তা'য়।
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া, কা'র মুখে চাও,
কে শুনিবে—কে বুঝিবে ও মর্ম্ম ব্যথায়?

পার যদি দাও ঢালি' শেষ রক্ত-কণা
নিভাইতে আত্ম-গ্রাসী পিপাসা স্বার্থের!
দরিদ্র—ভিখারী তোরা—হেয় আবর্জ্জনা;
তা'র কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আশা জীবনের।

তোরা(ও)ত মানুষ বটে—রক্ত মাংসে গড়া,
নাই কি তোদের মনে ঘৃণা—অভিমান?
তবে কেন পদাঘাতে ফেলিস্ না তোরা
সংসারের—মানবের অনুগ্রহ-দান?

একই বিধির সৃষ্ট—সে-ই যদি মারে
মারুক কি ক্ষতি তায়? তাঁ'রি মুখ চাই
হাসিতে হাসিতে সবে ছাড় এ সংসারে,
জুড়াইবে চিরতরে সব জ্বালা ভাই।

অথবা বিধির চির শুভ আশীর্ব্বাদ
শিরে ধরি' অগ্রসর হও এ জীবনে;
নীচ স্বার্থ অভিমান—সঙ্কীর্ণতা-বাঁধ
উন্নত হৃদয় বলে দলিয়া চরণে।

যে সংসার—যে মানব একদিন হায়!
দরিদ্র—কৃপারপাত্র ভাবিয়া তোমায়,
হেরিত ঘৃণার চক্ষে—সেই পুনরায়
নগণ্য ভিখারী মত লুটা'বে ও-পায়।

নাহি পার—দীন-দুঃখী—যাও ম'রে যাও,
জগতের ক্ষতি-লাভ নাহি কিছু তা'য়।
নাহি দয়া—নাহি স্নেহ, কা'র মুখে চাও
কে শুনিবে কে বুঝিবে ও মর্ম্ম ব্যথায়?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি না আমি?

অপরাধী কে?—তুমি না আমি?

প্রকৃতি-ক্রোড়ে বসিয়া সুকুমার শিশুটির মত দিব্য হাসিতে খেলিতে ছিলাম, কে আসিয়া আমায় অমৃত লড্ডুকের লোভ দেখাইয়া এখানে আনিল? তুমি?—কে তুমি? তোমায় চিনি

না কেন? সেই প্রথম দিন হইতে তোমার পশ্চাতে ছুটিতেছি, কিন্তু জানি না তুমি কে? চিনি না তুমি কে? যতদিন শিশু ছিলাম, লড্ডুকের লোভ ছিল, ততদিন সেই লোভে আমায় সর্ব্বদা ঘুবাইয়া লইয়া বেড়াইযাছ, আর আজ সেই শৈশব গিয়াছে, শৈশবের সে লড্ডুকের লোভ গিয়াছে; কিন্তু তবুও কেন আমি তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া মবিতেছি? কে তুমি, তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখাইযা, যৌবনের সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ স্নিগ্ধারুণ-কর-স্নাত প্রাতঃকালে আমায় মোহিত কবিয়াছিলে? কে তুমি, কেন তোমাব এমন ধাবা? সে'দিনও আমাব গিয়াছে, তবুও আমাব মোহ কাটিল না, তবুও তোমার পশ্চাতে ছুটিযাছি! যৌবনের সেই উদ্দাম আসঙ্গ-লিপ্সা-পবিপূর্ণ তপন-খব-কর-তাপে তাপিত মধ্যাহ্নকালেও আমায় তোমাব পশ্চাতে ছুটাইয়াছ! কি তোমার এমন কুহুক যে, আমায তোমার সঙ্গ-ছাড়া হইবাব উপায় বর্জ্জিত কবিয়া তুলিযাছে? ক্রমে আমার সে'দিন কাটিল, কিন্তু কৈ তুমিত ছাড়িলে না! তবু যে তোমাব পশ্চাতে ছুটিতে হইতেছে, এই অতৃপ্ত-বাসনা-জড়িত নৈরাশ্য পবিপূবিত যৌবনের সন্ধ্যাকালে কেন আমি তোমাব পশ্চাতে ছুটিয়া মবিতেছি? কে তুমি আমায় আকাশেব চাঁদ ধরিয়া দিবাব লোভ দেখাইয়া, ধূলিমুষ্টি হাতে দিয়া দূবে অবস্থিতি করতঃ হাসিয়া উঠ? আমাব সহিত এই ভৈরবীলীলা করিতেছ—তুমি কে?—কেন এ খেলা? ইহাব ভাব কি? জীবনের এতটা দিন গেল, এ সকল কিছুই বুঝিলাম না!!!

তুমি—তুমি যেই হও, তুমি শবতেব চাঁদ, রূপে ভুবন ভবিযা রাখিয়াছ, তোমায় দেখিলে আপন-হারা হইতে হয়; তোমাব চারিদিকে সুধার ছড়াছড়ি, তোমাব তীক্ষ্ন-কোমল হাসিতে, জগৎ প্রাণ হাবাইয়া ফেলে! তুমি শীতের সৌরতাপ, তাপে জগৎ জীয়াইয়া রাখ! তোমার স্পর্শে জীবেব সঙ্কোচ দূবে যায়, জীবেব জীবনই যেন অনুপ্রাণিত হইযা উঠে! তুমি বসন্তের কোকিল, তোমাব ডাকে জগতের নীরসতা ঘুচিযা যায, তোমার আহ্বানে

সুপ্ত-কাম জাগিয়া উঠে! তুমি নিদাঘের মলয় সমীর, তোমার ধীর-হিল্লোলে জগতের তাপ চলিয়া যায়, তাপিত জীব তোমার স্পর্শে শীতল হয়! তুমি প্রাবৃটের বারিধারা, জগৎকে অন্নশালী করিতেছ, জীব তোমার ধারায় প্রাণ-ধারণ করিতেছে! এ সকল তোমার স্বরূপত্ব আমি নিজেই উপলব্ধি-অনুভব করিয়াছি, সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছি; কিন্তু তবু তোমায় চিনিলাম না, সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না কেন? আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পাইলাম না কেন? কেন আমি তোমার পশ্চাতে ছুটি তাহাও বুঝিলাম না? তুমি এত দয়াময়ী, তবু তোমার প্রাণে এ কুটিলতা-টুকু কেন? তুমি কি জানিতে দিবে না তুমি কে? তুমি এমন কেন? তোমার এমন কেন?

দিন নাই, রাত নাই, তোমার পিছে ছুটিতেছি, ছুটিতে ছুটিতে কতবার তোমার অতি নিকটে পৌঁছিয়াছি কতবার মনে করিয়াছি এইবার তোমায় ধরিব; কিন্তু পারি নতাম ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুটির মত তুমি লাফাইয়া শত-হস্ত দূরে সরিয়া যাও। তোমার মধুর শীতল দেহের ছায়াটুকুলাভে আমার আগ্রহ যত, তোমার বঞ্চন-স্পৃহাও তত বলবতী। সারা জীবনটা তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছি, কোন দিন তোমায় স্পর্শ করিতেও পারিলাম না, তবু তোমায় ছাড়িতে পারি না কেন? ছুটিয়া ছুটিয়া সময়ে সময়ে রুদ্ধশ্বাসে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তবু তোমায় ছাড়িতে পারি না কেন? কুহকিনি! জানি না, কি মায়া-সূত্রে বাঁধিয়া তুমি আমায় বড়িশ-বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় খেলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ। তোমার বড়িশে-বিদ্ধ হইয়া এই অগাধ জল-সঞ্চারী রোহিত সারা জীবনটা খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর পারে না, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! আর খেলান কেন? এই বার ইহাকে উঠাও; কিন্তু কৈ সে ভাব তোমার দেখি না কেন? বড়িশ ছিঁড়িয়া পলাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, দুষ্প্রাপনীয়া জানিয়া তোমায় ছাড়িতে চাহিয়াছি, কিন্তু তুমি না ছাড়িলে তোমায় ছাড়িতে পারে কে?

তুমি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছ?—কিসের পরীক্ষা! কেন এ পরীক্ষা? যে তোমার জন্য পাগল, যে তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছে, যে মজিয়াই মরিয়াছে, তাহাকে আবার কি পরীক্ষা করিবে? সারা জীবনটা কলুর বলদের মত নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইলে, (এখনও সে ঘুর থামে নাই), ভুলিয়াও তোমার গণ্ডীর বাহিরে যাই নাই; উপায়, পথ, কিছু রাখও নাই, তবু কি তোমার বিশ্বাস হয় না? রঙ্গিনি! এ তোমার কি রঙ্গ? আমি সব ছাড়িয়াছি, যাহা কিছু ছিল, সবই তোমার নামে উৎসর্গ করিয়াছি; আমার আত্মদানের বাকী কি যে আমায় এখনও প্রতিদান হইতে বহুদূরে রাখিয়াছ? সারা জীবন তোমার পিছে ছুটিয়াছি, ধরিতে না পারি, চিনিতে না পারি, তোমার স্বভাব জানিতে বোধ হয়, আমার আর বড় বাকী নাই। তুমি ক্রীড়াময়ী, তুমি লীলাময়ী, তোমার খেলা হইলেই হইল; খেলার জীব তাহাতে মরুক আর বাঁচুক, আর তাহা দেখিবে না। তবে ইহাও বলি, তুমি খেলাইতে জান বটে, কিন্তু খেলার রস বুঝ কি? বড়িশ-বিদ্ধ মাছ যখন খেলাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে হয়, তাহা জান কি?

তুমি চিরক্রীড়াময়ী, তোমার খেলা কোনদিন ফুরাইবে না, কিন্তু আমি যে আর পারি না—আর যে এ ভাবে তোমার পিছে ছুটিতে পারি না। শৈশবের উৎসাহ, যৌবনের তেজ আমার চলিয়া গিয়াছে, এখন যৌবনের এ সন্ধ্যাকালে অল্পেই অবসাদ আসিয়া পড়ে,—উৎসাহ কমিয়া যায়, ঠিক হতাশ হই নাই বলিয়াই এখনও ছুটিতেছি—ছুটিতে পারিতেছি, কিন্তু আর কত-কাল এমন চলিবে? ক্রমেই যেন বুঝিতেছি, তুমি চন্দ্র, আমি বামন; তুমি সুধা, আমি অসুর; তুমি আমার প্রাপনীয়া নহ। এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে, ততই যেন আর ছুটিতে পারিব না বলিয়া বোধ হইতেছে। যেদিন তোমায় উদ্বেগে আশ্বাস, দুঃখে সুখ, দাহে শান্তি, ক্ষোভে তৃপ্তি বলিয়া

বিশ্বাস করিতাম, সেদিন যেন এখন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাই-তেছে। এখন মনে হয়—বুঝি তোমা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই আমি বাস্তবিক সুখী হইব; কিন্তু কৈ তা'ত পারি না। পাষাণি! ইচ্ছা না থাকিলেও তোমার আকর্ষণে বদ্ধ হইতে হয় কেন? যে তোমায় চাহে না তাহার প্রতি তোমার আকর্ষণ এত প্রবল কেন?

সময়ে সময়ে তুমি আমায় মরণের বিভীষিকা দেখাও; কিন্তু যে ভুলিয়াছে, যে মজিয়াছে, তাহার আবার মরণের ভয় কোথা? রাক্ষসী! যাহার হৃদয়ে চিরতুষানল জ্বালাইয়াছ, চিতার অনল ভিন্ন সে অনল নিভিবে না, তাহা কি জান না?

তোমার জন্য আমার কি না দুর্দ্দশা হইয়াছে? আমি তোমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছি, কর্ত্তব্য ভুলিয়াছি, যাহা দুর্লভ তাহারই জন্য ঘুরিয়াছি, যাহা দুরাশা তাহাই হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়াছি। কেন করিয়াছি, তাহা তুমিই জান। তোমার জন্যই এ সকল করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে যদি তুমি লোভ জাগাইয়া না তুলিতে, হৃদয়ে আশার বাতাস না বহাইতে, তাহা হইলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। মায়াবিনি! এখন বল দেখি, তোমারই জালে পড়িয়া আমি যে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, ইহার জন্য অপরাধী কে? তুমি?—না আমি?

যাহাকে এগুলি বলা হইল, সে নির্ম্মমা উত্তর দিল—"অবোধ! অপরাধ আমার না তোমার, তুমিই তা'র বিচার কর? তুমি পতঙ্গ, বহ্নি-শিখা দেখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, শেষে পুড়িয়া মরিবে, দোষ কি বহ্নি-শিখার? তুমি সর্প দেখিয়া বাল-স্বভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছ বলিয়া কি সর্পে দংশন করিবে না? আমি দোষী! কেন, এই সংসার মরুতে অসহায়, অনবলম্বন তোমাকে, আশ্রয়-অবলম্বন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছি বলিয়া? তোমায় যদি সুখের ছবি দেখাইয়া, এ মোহনরূপে ভুলাইয়া, এত ভরসা না দিতাম, তবে তুমি কি বাঁচিতে? তুমি মূর্খ;

তুমি বুঝ না যে—ভোগে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই; সুখ-তৃপ্তি যাহা কিছু তাহা তাহার কল্পনায়। যে সুখের ছবি অহঃরহঃ দেখিতেছ, তাহা যদি ভোগ কবিতে পাইতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ অনন্ত লালসা কি থাকিত? যে মুহূর্ত্তে তোমার ভোগ-স্পৃহা মিটিত, সেই মুহূর্ত্তে এই বিচিত্রতাময়ী সোণার পৃথিবীই তোমার চক্ষে শূন্যবৎ প্রতিভাত হইত,—অতি পুবাতন বোধ হইত, তুমি আব এক নিমেষও এখানে থাকিতে পারিতে না। এখন বল দেখি, এ বঙ্গিনী যে বঙ্গ দেখাইতেছে, এ কুহকিনীর যে কুহকে মুগ্ধ হইয়াছে, এ পাষাণী যে নির্ম্মমতায তোমায় দ্রব করিয়া ফেলিয়াছে, মায়াবিনীব সেই মায়াই এ জীবনে অবলম্বনীয় কি না?—সেই মায়াই তোমার এ জীবনে জীবন কি না? যতদিন এই মাযাবিনীব মায়িক জীবন তোমার থাকিবে, ততদিন অপরাধী কে, জানিতে চেষ্টা কবা তোমাব বাতুলতা নহে কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবাই এই মায়াব একটা খেলা নহে কি? যদি ক্ষমতা থাকে, আমাব সঙ্গ ত্যাগ কবিতে পাব, আমাব গঠিত, আমাব পবিচালিত এ জীবন ত্যাগ কবিয়া নূতন ধরণে আবাব জীবন গড়িতে পার, তখন ভাবিও অপবাধী কে?—তুমি না আমি? তখন জিজ্ঞাসা কবিও, অপবাধী কে?—তুমি না আমি?

মানুষেব প্রাণ আশাব প্রেমে, মাযাব জালে বদ্ধ হইয়া কত প্রলাপই বকে, তাহাব আব ইয়ত্তা থাকে না, কিন্তু "তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু!"

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

৮৩

কি অমিয়া আছে তব সুধামাখাস্বরে,
"বউ-কথা-কও" পাখী,
শাখার উপরে থাকি',
পিয়িতে সে সুধারাশি সাধিতেছে তোমারে।

৮৪

ওরূপ সম্ভবে অন্যে কিন্তু হে রমণি!
মাতা-রূপে তব স্নেহ,
না পাবে দেখা'তে কেহ,
পরাজিতা তব পাশে স্বর্গ-নিবাসিনী।

৮৫

দেখ, দেখ, তপোধন-ধ্যান নষ্ট করি।
অপ্সরী মেনকা-বালা,
প্রসবিয়া শকুন্তলা,
না জেনে পালিতে শিশু পলা'ল সুন্দরী।

৮৬

মূর্ত্তিমতী তুমি দেবি! স্নেহপারাবার,
তা'ই কহে সুধীজনে,
সনাতন শাস্ত্রে ভণে,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী সবার।

৮৭

অনুপমা অতুলনা সেই স্নেহরাশি,
এইমাত্র জানা আছে,
নাহি তাহা কারো কাছে,
না পাই তাহার পার, তাই ভালবাসি।

৮৮

কি যত্নে সন্তান হয় লালন পালন,
জননী ব্যতীত হায়,
পরে কি বুঝিবে তা'য়?
মায়ার নির্ঝর মাতা, শ্রেষ্ঠ অতুলন।

৮৯

সুকোমল বাহুলতা করি' প্রসারিত,
শিশু নাড়ী-ছেঁড়া-ধনে,
বুকে রাখে সযতনে,
অনিমিখে চেয়ে থাকে সদাই শঙ্কিত।

৯০

পীড়িত হইলে শিশু দেখ নিরখিয়া,
মাতা ব'সে তা'র পাশে,
মনে কত ভয় বাসে,
পাছে কাল ফুল-কলি পলায় ছিঁড়িয়া।

৯১

রাত নাই, দিন নাই, হের অবিরাম,
বরিষার ধারামত,
কাঁদে মাতা অবিরত,
সতত শিশুর তাঁর ভাবি' অকল্যাণ।

৯২

যগুপি দুর্ভাগ্য বশে হারায় শিশুরে,
বুকে করে মৃতদেহ,
কাছে যেতে নারে কেহ,
শিশুহারা সে সিংহীরে ডরে যমচরে।

৯৩

জ্ঞানহারা উদাসিনী ছোটে চারি- [ভিতে,
গণেশের মুণ্ড নাশে,
যেন ভয়ঙ্করা বেশে,
ছোটে ভীমা মহাশক্তি শনিরে নাশিতে।

৯৪

কিম্বা যথা শিশুহারা ক্ষুব্ধা কুরঙ্গিণী,
এদিক ওদিকে চায়,
ছোটে পাগলিনী প্রায,
ভেঙ্গেছে কলিজা আহা বনবিহাবিণী।

৯৫

অথবা সৌভাগ্যক্রমে যদি বাঁচে সুত,
পূজা, হোম, যাগ করে,
দান করে অকাতবে,
পেয়েছে গো হাবানিধি বৈভব অযুত।

৯৬

শিশু ওঠে মাব বক্ষে মবি কিবা শোভা,
অলকা ধবিয়া টানে,
মাতা ধবে শিশু কাণে,
খিল্‌খিল্‌ হাসেশিশু আহা মনোলোভা।

৯৭

অন্যে যদি ভৎর্সে শিশু কাঁদে উভরায়,
মাতা যদি মারে তা'রে,
শুধু হাসে সে অধরে,
দুষ্টছেলে জানে মাতা স্নেহের আলয়।

৯৮

জননী স্নেহের কভু না পাই উপমা,
পঞ্চানন পঞ্চ-মুখে,
অনন্ত সহস্র মুখে,
কীর্ত্তনে অক্ষম সেই স্নেহের মহিমা।

৯৯

ধরার যতেক বীণা হ'য়ে একত্রিত,
গায যদি ঐক্যতানে,
মাতাইতে "মা"ব গানে,
মাতাব স্নেহেব কভু হয় না বিহিত।

১০০

মাতাব মমতা-কথা বর্ণে সাধ্য কা'র?
সাবদা দুধের মেষে,
বীণা কবে গেযে গেয়ে,
নাহিশক্তি শুধিবারে সে মহিমা মা'র।

কিষণ।

প্রারব্ধ কর্ম্ম।

অকূল ভবার্ণবে ভাসমান, উত্তাল-তবঙ্গ-মালার ভীষণ-ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া, সামান্যজীব আমরা কূল পাইবাব নিমিত্ত সভয়ে সন্দেহ মনে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু উপায় কোথায়? সে তরি কোথায়, যাহার সাহায্যে আমরা অকূল-পাথার পার

হইয়া কূল পাইব? কলুষিত, পাপ-পঙ্কে মগ্নপ্রায়, জীবসমূহ বার বার অসহ্য যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছে, কিন্তু তবুও জীবের মোহ কাটিল না—জীব শান্তি পাইল না। আমরা অল্পবুদ্ধি, আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; বুঝিলেও অবোধের মত কার্য্য করি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতার কারণ কি? জানি সকল দিন সমান যায় না, তবে বার বার নিমজ্জিত হইয়াও আমরা বারেকের জন্য সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছি না কেন?

এ যন্ত্রণার অবসান কিসে হইবে? অর্থে? অর্থোপার্জ্জনে, অর্থ সঞ্চয়ে ও অর্থ ব্যয়ে? কৈ তাহাতে ত কিছুই হয় না। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন:—

"আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থে দুঃখভাজনে।" আরও দেখিতে পাই—"মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং, কুরুতনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।" আবার দেখ অন্যত্র—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।"

তবে নিস্তার কিসে? যশে? যশোলাভে? বহু যশস্বী হইয়াও আমাদের দুঃখ ত যায় না।

অর্থে, নামে বা যশে যদি এ দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার না পাইলাম, তবে এস, আমরা এ সম্বন্ধে পার্থিব বস্তু ছাড়িয়া অন্যত্র অনুসন্ধান করি। শাস্ত্র বলিতেছেন, উদ্ধার—কর্ম্মে ও কর্ম্মত্যাগে।

অল্প-বুদ্ধি অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন সামান্য জীব আমাদের কি কর্ম্মত্যাগ সম্ভবে? আর জীবের কর্ম্মত্যাগই কি সম্ভবপর? তাহা নহে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ফলত্যাগই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগ বলিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা উল্লেখ

করেন। তাহা হইলে কর্ম্মের ফলত্যাগই কর্ম্মত্যাগ। আরও দেখ, মানবের পরম হিতৈষিণী শ্রুতি বলিতেছেন ;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

তত্ত্বদর্শী সাধকের যখন পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইবে, তখন তাহার সমস্ত হৃদয-গ্রন্থিভেদ, সকল সংশযের ছেদ ও প্রারব্ধ-ভোগ ব্যতিরেকে সর্ব্ব কর্ম্মেরই ক্ষয হয। অতএব এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা প্রারব্ধ কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণলাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা ত সামান্য জীব, তত্ত্বদর্শী সাধক, যিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিযাছেন, যিনি জীবন্মুক্ত, তিনিও প্রারব্ধ কর্ম্মের, সৎই হউক আর অসৎই হউক, ফলভোগ করিতে বাধ্য। ঐ ফলভোগকালীন তাঁহাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এই উপলব্ধি হইতেছে যে, জীবের কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব—কর্ম্ম করিতেই হইবে; কর্ম্ম অনন্ত, কর্ম্ম অনাদি। কর্ম্মই জীবসমূহের একমাত্র অবলম্বন। এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, সংসারিমাত্রেই কর্ম্মের অধীন, আমরা কর্ম্মত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম্ম আমাদিগকে ত্যাগ করিবে না। ইহ জগতে কর্ম্ম করিতেছি, পর জগতেও কর্ম্ম করিতে হইবে; বিশ্রাম বলিযা কিছুই নাই। যখন আমরা বিষয কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিযা নিশ্চেষ্টভাবে বসিযা থাকি, তখনও আমাদের মানসিক কোন না কোন ক্রিযা চলিতে থাকে।

কিন্তু এ "কর্ম্ম"টা কি? এবং যাহার হাত হইতে সাধকেরও নিস্তার নাই, ঐ "প্রারব্ধ কর্ম্মই" বা কি?

শাস্ত্রকারগণ জীবের কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম সঞ্চিত কর্ম্ম, দ্বিতীয় আগামী কর্ম্ম, তৃতীয প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই তিন প্রকার কর্ম্মকে তিনটী লোষ্ট্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মনে করুন, একটী বালক তিনটী লোষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া একটীর পর একটী নিক্ষেপ করিতেছে। একটী নিক্ষেপ

করিয়াছে, একটী নিক্ষেপ করিবার জন্য উত্তলিত হস্ত; আর একটী এখনও সঞ্চিত আছে। এস্থলে ঐ নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করা যাইতেছে। যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার কার্য্যও হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল বালককে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; ইহার ভোগ ব্যতীত অন্য প্রকার নাশ নাই। যে দুইটী লোষ্ট্র এখন নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার কার্য্য এখনও হয় নাই; এ নিমিত্ত তাহার কোন ফল নাই। বালকও সেই দুইটী লোষ্ট্র যদ্যপি নিক্ষেপ না করে, কোন প্রকার ফলভোগের দায়ী নহে।

ইহাও প্রমাণিত হইল যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আসিয়া আমরা অনন্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। কর্ম্ম যেন রক্তবীজের ঝাড়। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা—কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এই সব কিছুই মানেন না। Charles Darwin প্রমুখ ক্রম-বিকাশ পদ্ধতির (Theory of Evolution) পক্ষপাতী মনস্বিগণ বলেন যে, এই পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হইবে। কিন্তু যদ্যপি প্রশ্ন করা যায় যে, এই সব যে হয় ও হইবে, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন—"This is its nature. This is the rule এই ইহার রীতি। ইহাই হইয়া থাকে ও হইবে। কিন্তু ইহাতে আমাদের দুঃখ-মোচনের কি হইল? কি প্রকারে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ হইবে? ঐ মতের পোষকতায় আমাদের কোনও লাভালাভ নাই। আমাদের দুঃখভোগ যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। হিন্দু বলিতেছেন,—কার্য্যের হাত হইতে যখন উদ্ধার নাই, তখন সৎ-কার্য্যই দুঃখার্ণব পার হইবার একমাত্র সেতু। যে সকল কার্য্যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহারই নাম সৎকার্য্য।—প্রথম দানে, আমরা সাধারণের জন্য হাসপাতালপ্রতিষ্ঠা পুষ্করিণীখনন, দেবালয়-নির্ম্মাণাদি নানা সৎকার্য্য করিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ত্তমান

ধর্ম্ম জগতের অন্যতম অধিনায়ক প্রেমাবতার সাধক প্রবর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন,—"মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যাইলেও, পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হইবে।" তাহাই যদি হয়, তবে উক্ত সৎকার্য্যে আমাদের কি উপকার হইল? যগুপি পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ কবিতেই হয়, তাহা হইলে যে আবার অসংখ্য কর্ম্মে আমবা ব্যাপৃত হইযা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিব না, কে বলিতে পাবে?

দ্বিতীয়—ধ্যানাদি অর্থাৎ সাধু হওযা। সে বড় মুস্কিলেব কথা। সাধু হওযা, বড় সোজা কথা নয। তপ, জপ, যোগ, যাগ, পূজা, হোম এ সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হওযা, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবে কি সম্ভবে? আমরা সংসাবেব নানাকর্ম্মে নিযুক্ত হইযা, এমন সময় পাই না, যে সমযে স্থিবচিত্তে ঐ সকল সৎকার্য্যে নিযুক্ত হই। যদিও সময় পাইযা কোন কার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিতে থাকি, সঙ্গে সঙ্গে "আমি একটা সাধু" এই অভিমান উপস্থিত হয়। তথন সেই অভিমান দুব কবা বড় দুরূহ; আব উক্ত কার্য্যেই যে আমাদের উদ্ধার ধ্রুব নিশ্চিত, তাহাও সন্দেহস্থল! তন্ত্রে জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানের একমাত্র আকব, পবমযোগী দেবাদিদেব মহাদেব বলিতেছেন,—"জপাৎসিদ্ধিঃ, জপাৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি; আবাব তিনিই অন্যত্র বলিতেছেন:—

"ন মুক্তির্জপনাৎ হোমাদ্ উপবাসাৎ শতৈরপি।"

বিষম বিপদ। কোনটী অভ্রান্ত, কোনটী ভ্রান্ত? আবাব কোনটীই ভ্রান্ত হইতে পাবে না—কাবণ, দুইটীই শিব বাক্য—এই কথা পণ্ডিতগণ বলিবেন। কিন্তু আমবা কোথায যাই? কি উপায় অবলম্বন করি?

ওসকল বুঝিযা উঠা আমাদেব ন্যায সামান্য জীবের কর্ম্ম নয়; আর বুঝিয়া উঠিলেও, উহাব মতে কার্য্য করা বড় কঠিন। এ সংসারে বাধা, বিপত্তি, প্রলোভন অনেক।

তৃতীয়—পরোপকাবাদি। তাহাতেই কি হইবে? কে বলিল যে, আমরা পরোপকার কবিয়া উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা

প্রত্যাশা করিব না? কে বলিল যে, যদ্যপি উপকৃত ব্যক্তি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া কি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিব, সেই চেষ্টায় রত থাকিব না? সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে মহা অনর্থ।

উক্ত তিন প্রকার সৎকার্য্যের কোনটীতে আমাদের কিছুই হইল না। তবে উপায় কি? তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? শাস্ত্র-কারগণ কি ভ্রান্ত? না, তাহা নহে।

একটা উপায় আছে, সেটা নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। আমরা যখন কোন কার্য্য করিব, তাহাতে স্বার্থের লেশমাত্র থাকিবে না—প্রত্যাশার নাম গন্ধও থাকিবে না! কোনও প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা করিব না! ইংরাজ কবি মহামনা Longfellow বলিতেছেন:—

"Let us then be up and doing,
With a heart for any fate."

উক্ত কবির আর একটী মহাবাক্যও আমরা এস্থলে উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। সেই কবিতারই অন্যত্র:—

"Act, act in the living present,
Heart within and God o'er head."

আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এই প্রকার কার্য্যেও বাধা-ব্যতিক্রম অনেক, প্রলোভন বিস্তর। নাম, যশ, অর্থ ইত্যাদির বিষয় কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, সবিশেষ জ্ঞাত হইব যে, আমরা এ সব প্রলোভনে মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু লুব্ধ দ্রব্য পাইতে কৃতকার্য্য হই না। কেহ হয় ত মৃত্যুকালে ঐ সকলের আস্বাদ পান, কাহার ভাগ্যে মৃত্যুকালেও ঘটে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ সকল দেখিয়া, বুঝিয়াও আমরা প্রলোভন লইয়াই ব্যস্ত। এই সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইলে শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। Swami Vivekananda says,—"Strength, strength it is that we want so much in this life, for what we call SIN and SORROWS have all one cause, and that is our WEAKNESS. With weakness comes ignorance, and with ignorance comes mesery."

যিনি এ জগতে আত্ম-ত্যাগ করিতে, আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই শক্তিমান্। আমি আপনার সৎকর্ম্মের প্রভাবে এই মর্ত্ত্যধামত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, আব সকলে পড়িয়া থাকিবে। এই প্রকাব নীতিতে চলিবে না।

পবমহংসদেব বলিতেন, "আমি একটি লোকের উদ্ধার জন্য কোটি জন্ম স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত।" দুঃখপাশ হইতে মুক্তিলাভ কবিবাব ইচ্ছা কবিলে নিস্বার্থ আত্ম-ত্যাগ, অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম কবা, আবশ্যক। কর্ম্মেব হাত হইতে নিস্তার নাই, পূর্ব্বেই বলিযাছি। আগুনে হাত দিতেই হইবে। স্বপ্নেও কর্ম্মেব হাত হইতে পবিত্রাণ নাই। মানস-বলাকা-শুভ্র, দুগ্ধফেননিভ, সুকোমল শয্যায শয়ন কবিযা, সুষুপ্তিকালে বাহ্যজ্ঞান বহিত হইলেও, স্বপ্নে আমবা কার্য্যেব অধীন! কিমাশ্চর্য্য মতঃপবম্।

কর্ম্মেও আবাব পদে পদে নৈবাশ্য, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত। কিন্তু প্রত্যাশা-শূন্য কর্ম্মে অপাব আনন্দ। কিন্তু কি প্রকাবে আমরা কর্ম্ম কবি? কি উপাযে শক্তিমান্ হই? কি প্রকাবে স্বার্থবিসর্জ্জন কবি? কি উপাযে আত্মত্যাগ কবি, কি উপাযে অহংত্যাগ কবিয়া অভিমান শূন্য হই? উপায আছে;—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিবেবা, ভবতি ভবার্ণবেতবণে নৌকা।"

সজ্জনসঙ্গতি অর্থাৎ সাধুসঙ্গই ভীষণ ভবার্ণব পাব হইবার একমাত্র নৌকা। আমাদেব সাবাটী জীবনেব মধ্যে যদি ক্ষণকালের জন্যও সজ্জন-সঙ্গতি হয, তাহা হইলেই উপায স্থিব হইযা গেল। আবও একজন তত্ত্বদর্শী মনীষী ইহজগতেব সাববস্তু অন্বেষণ কবিতে গিযা বলিযাছেন,—

"অসাবখলুসংসাবে সাবমেতৎ চতুষ্টযম্!
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"

কিন্তু আমাব বোধ হয, এই চাবিটীর মধ্যে সাধুসঙ্গ সকলের করায়ত্ত ও সহজসাধ্য, আব তিনটী সকলেব পক্ষে ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধু কে? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর

দিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি—"যে ভাল কে ভালবাসে ভালর জন্য ভাল করে, সেই ভাল অর্থাৎ সাধু।" আমরা যদি ভালকে ভাল বাসিতে পারি, ভালর জন্য ভাল করিতে পারি, তবেই নিস্তার, নতুবা শত শত জন্ম ধরিয়া এই ভীষণ পাপ-তাপ-সমন্বিত দুঃখের সংসারে, এই সহানুভূতি-বর্জ্জিত নির্ম্মম সংসারে, এই স্বার্থপরিপূর্ণ অনিত্য মায়াময় সংসারে গমনাগমন করিতে হইবে। অতএব এস, আমরা সকলে এমন একজন ভাল আদর্শ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করি, যাঁহার কৃপাবলে আমরা ভালর জন্য ভাল করিতে শিক্ষা করিব, ভালকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করিব, আমাদের স্বার্থত্যাগ হইবে, আমরা কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব, আমাদের অহংত্যাগ হইবে, আমরা অভিমান শূন্য হইব, আর আমাদের জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না।

কিরণ।

সমালোচনা।

মাতৃ-বিলাপ—এই বিলাপ কবিতায় লিখিত। মাতৃহীন বালক পূজনীয়া পরলোকগতা মাতার উদ্দেশে কয়েকটি শোকগাথা গাঁথিয়া পুস্তকাকারে জনসাধারণের উপহার দিয়াছে। পুস্তকের বিজ্ঞাপনীতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার যথার্থই বলিয়াছেন ;—

"নিদারুণ মর্ম্মভেদী মনোবেদনায়—
মাতৃহীন বালকের করুণ রোদন ;
কবিত্ব-চাতুর্য্য তা'তে থাকিবে কোথায় ?
ভাবের মাধুর্য্যে তথা কিবা প্রয়োজন ?"

মাতৃ-পূজায় 'কবিত্ব চাতুর্য্য' ও 'ভাবের মাধুর্য্য' যথার্থই কোনও আবশ্যক নাই। মাতৃ-পূজায় একমাত্র উপকরণ ভক্তি, তাহা 'মাতৃ-বিলাপের' ছত্রে ছত্রে পাঠক পাইবেন। তবে আর কি চাই ? ভক্তের একটি কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাতৃ-ভক্ত

বালক স্বপ্নে মাতাকে দর্শন করিয়া মার নিকটে যাইতে বাসনা করিল, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ! কিন্তু নিদ্রাভঙ্গেও মাতৃ-ভক্ত কি বলিতেছেন, শুমুন ;—

"তাই যদি সত্য হয়, হলেই বা স্বপ্নময়,
যাবৎ জীবন যেন দেখি এ স্বপন।
নিশি পোহায়ো না যেন, এস নিদ্রে! এস পুনঃ,
মাতৃ-ময়-স্বপ্ন পুন করি দরশন।।"

আমরা মন্মথনাথের মাতৃ-ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্ট হইযাছি।

নাগযজ্ঞ—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। নাগযজ্ঞের উপাখ্যান বোধ হয়, পাঠক পাঠিকাব মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই; অন্নদাবাবু সেই পৌবাণিক উপাখ্যানটী নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিযাছেন। এখানি বাজকীয় বঙ্গরঙ্গভূমিতে কিছুদিন অভিনয়ও হইয়াছিল, শুনিলাম অভিনযে সকলে লেখকেব লিপি চাতুর্য্যের প্রশংসা কবিযাছিলেন। পাঠকালে আমবাও তাহা না করিয়া থাকিতে পাবি নাই।

রামকৃষ্ণ প্রচার সমিতির বিজ্ঞাপনী—দক্ষিণেশ্বরের সাধকপ্রবর "শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেব মানবেব হিতার্থ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্য্যে যাহা তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা প্রচাব এবং মনুষ্যেব দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি কল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষযে সাহায্য কবিবার জন্য এই প্রচাব (Mission) সংস্থাপিত হইয়াছে।" এই সমিতির সাধাবণ সভাপতি আমেবিকা-ইংলণ্ড বিমুগ্ধকাবী বাগ্মী শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী (বাগ্‌বাজাব বসুপাড়া) কলিকাতা আশ্রমের সভাপতি। সাম্প্রদায়িকতা শূন্য হইলে এই প্রচারে আমাদের সমাজের বহুমঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—তাল পোস্তা। * (ঋ গ ধ নি)

কথা—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।　　　　সুর—শ্রীরামতারণ সান্ন্যাল।

মন আমার দিন কাটালি,　　　　মুল খোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে।
একলা এলে,　　　　একলা যাবে,
মুখ্ চেয়ে কা'র ঘুর্‌চ তবে॥
কে তুমি বল্‌ছ আমি　দেখ্ ভেবে আব ভাব্‌বি কবে—
ভাঙ্‌বে মেলা ঘুচ্‌বে খেলা চিতার ছাই নিশানা রবে॥

আস্থায়ী।

\+ ০ +
সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধঁ নি সাঁ | নি সাঁ সা
ম ০ ন আম আ ০ র | দি ন্ কা

০ + ০
সা সা | সা ঋ গ গ ঋ গ ম গ ঋ সা |
টা লি | মু ০ ল খো য়াল্ ই ই ০ ০ ০ |

\+ ০ +
সা ঋঁ গ ঋ সা সা ঋঁ ম | গঁ গ ঋঁ
ভা ও ০ ল্ অ ব্যা স্ আত | কল্ ল্লি ই

\+ ০
গঁ ঋঁ সাঁ | সা সা সা প ধঁ নি ধ পঁ |
০ ভ বে | এক্ লা এল্ এ ০ ০ ০ ০ |

\+ ০ +
প প ধ ম প ধ নি ধঁ প মঁ | ম
এক্ লা ০ যা ব্ এ ০ ০ ০ ০ | মুখ্

* মতান্তরে যৎ তাল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা হইলে পোস্তার ন্যায় মিষ্ট হয় না।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভাবতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } শ্রাবণ, ১৩০৪ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

ঈশ্বরোপাসনা।

সকৃৎ শ্রবণমাত্রেই অন্বয়ীপ্রমাণে (directly) যাহাদের স্বাত্মানুভূতি হয়, অবিদ্যাবিজৃম্ভিত অধ্যাসেব জ্বলন্ত প্রদীপ তাহাদের চকিতেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; অবাতবিক্ষোভিত অদ্বৈত মহাসাগবের অব্যক্ত অতলে তাহাদের জীবনতবণী জন্মের মত নিমজ্জিত হইয়া যায়; তাহাদেব দৃষ্টিতে স্থষ্টিই বা কোথায়, প্রলয়ই বা কোথায়? উপাস্যই বা কি উপাসনাই বা কার? "যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূত তদা কিং কেন কথং পশ্যেৎ" যখন সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়, তখন সে কি-দ্বারা কি দেখিবে? কিন্তু অনাদি অবিদ্যা গ্রাহগ্রস্ত অস্মদাদি জীবের পক্ষে ব্যতিবেকী ন্যায়ে (indirectly) পরমাত্মতত্ত্ব বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে অলীক ইন্দ্রজালরূপী পরিদৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চকে যদি একান্তই সৃষ্ট পদার্থ মানিয়া লইতে হয়, তবে বেদান্তের ত্রিবৃৎ মায়া অথবা সাংখ্য কথিত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিব গুণবিক্ষোভই এ সৃষ্টিবৈচিত্রের সুষ্ঠু কারণ বলিয়া অনুমান

করা যাইতে পারে। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, অখণ্ড পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, তখন তিনিই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাক্রান্তের ন্যায় হন। সাংখ্যও বলিয়াছেন, গুণের বিক্ষোভ হইলেই সৃষ্টির সূচনা হয়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, কি সাংখ্য, কি বেদান্ত উভয় দর্শনই সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে গুণবিক্ষোভ কল্পনা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধেব মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তবে এই গুণত্রয় যে অল্পাধিক পরিমাণে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে ওতপ্রোত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করাই এ স্থানে প্রতিজ্ঞা-সাধনার্থ নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। উক্ত-গুণপদার্থত্রয়ের ক্রমভেদে প্রকাশ-মানতা ক্রিয়মানতা ও জড়তা-ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ যে বলিয়া থাকেন, সদৃশ পবিণামে প্রলয় ও বিসদৃশ পরিণামে সৃষ্টি, তাহার অর্থ এই যে ত্রিবিধ গুণপদার্থের মধ্যে যতদিন বৈষম্যভাব থাকিবে, ততদিনই সৃষ্টি-কার্য্য বর্ত্তমান; উহাদের নিঃশেষ-সাম্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। "গুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টিঃ" ইতি সাংখ্যসূত্র। অবিদ্যাগ্রস্ত অস্মদাদির পক্ষে সৃষ্টি যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে, উক্ত গুণপদার্থত্রয়ের বৈষম্যভাব আমাদিগেব মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। আমরা দেখিতে পাই, তম আধিক্যে জড়তা, রজ আধিক্যে ক্রিয়মানতা ও সত্ত্বাধিক্যে প্রকাশমানতাব প্রাবল্য হয়। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের (Evolutionists) সৃষ্টিতত্ত্বরূপ ক্রমবিকাশমতের পরিপোষণোপলক্ষে ও প্রোক্তরূপ গুণত্রয়ের ক্রমোন্মেষণ, অনুমানের অযোগ্য হয় না। নিরতিশয় তম আধিক্যই জাত্যভাব। তজ্জন্যই ক্রমবিকাশবাদিগণ জগতের আদিমাবস্থা তমোময় কল্পনা করেন। ভগবান্ মনুও ইঙ্গিতক্রমে বলিয়াছেন, "আসীদিমং তমোভূতং" এ জগৎ প্রপঞ্চ সর্ব্বাগ্রে তমোভূতই ছিল। তৎপরে ক্রমোন্মেষিত চেতন জীব-জগতে রজঃ প্রাধান্যবশতঃ চেতন জগৎ কার্য্যময় এবং নিরতিশয় শুদ্ধসত্ত্ব পরাতত্ত্ব-বিবিদ জীবই স্বত্বপ্রবণ দৃষ্ট হয়। আমুমুক্ষু জড়জগৎ

সমস্তই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রঙ্গভূমি,—যেথানে কেহ স্থাণুরূপ চলচ্ছক্তি রহিত, কেহ জীবরূপে গমনশীল, কেহ বা প্রশান্তমনা সত্ত্বসংস্থ হইয়া ত্রিগুণের বিক্ষোভ অতিক্রমণ করতঃ সৃষ্টিনিবাশে কৃতপ্রযত্ন। প্রোক্তরূপ ন্যায়াবলম্বনে আমরা দেখিতে পাই, বিবেক-বান্ মনুষ্য সমাজেও উক্তরূপ গুণভেদে কেহ তমঃপ্রবলতা বশতঃ মহামোহাচ্ছন্ন; কেহ রজঃ প্রাবল্যে জড়জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে নিয়তই কর্ম্মপরায়ণ; কেহ বা সত্ত্বপ্রবলতা বশতঃ প্রকৃতির পরপারস্থিত পরম পুরুষলাভে অনন্যমনা ও নিয়ত ধ্যানশীল। উক্ত ত্রিবিধগুণের অল্পাধিক্যতা অনুসারেই জীবকল্পিত উচ্চাদর্শ (highest ideal) ও যে অল্পাধিক পরিমাণে পরাবর আদর্শ হইবে তাহাতে আব বিচিত্র কি? প্রত্যেক সমাজের ব্যক্তিগত উচ্চাদর্শই অল্পাধিক পরিমাণে ক্রমে সমাজগত ও জাতিগত আদর্শরূপে পরিণত হয়। এইরূপ প্রত্যেক জাতিগত আদর্শই পক্ষান্তরে সার্ব্বভৌমিক আদর্শরূপে পরিণত হওয়াই আদর্শ কল্পনার নিঃশেষ পরিসীমা। প্রোক্তরূপ সার্ব্বভৌমিক অত্যুচ্চাদর্শই লোকতঃ ন্যায়ে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু জীবগত, সমাজগত কি জাতিগত অত্যুচ্চাদর্শ বা ঈশ্বরজ্ঞান একরূপ হইতে পাবে না। যদি সকলের বুদ্ধিতে ঈশ্বর একরূপেই প্রকাশমান্ হইতেন, তাহা হইলে আর সাম্প্রদায়িকরূপ বাদ-বিতণ্ডার কোলাহল উত্থিত হইত না। জীবগত সমাজগত ও জাতিগত বিভিন্নগুণপ্রাবল্যই বিভিন্নরূপ উচ্চাদর্শ কল্পিত হইবার অদ্বিতীয় কারণ। ঘোর তমসাচ্ছন্ন জড়জগতের নিম্নস্তরস্থ কীটপতঙ্গ, কি পশুপক্ষ্যাদিজাতীয় জীবের স্বতঃপ্রবণ (instinctive) কার্য্যকলাপ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাহাদেব মধ্যে ঈশ্বর স্থানীয় এমন কোন অত্যুচ্চাদর্শ কল্পিত নাই, যাহা তাহাদের অনুসরণীয়; অথবা যদি এরূপ উচ্চাদর্শ একান্তই কল্পিত হইয়া থাকে, তবে তাহাও তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশের অনুরূপই হইয়া থাকিবে। আমরা তদুচ্চস্তর মনুষ্য জগতে আসিয়া কি দেখিতে পাই? তমসাচ্ছন্ন মানব তত্তদনুরূপ গুণেই স্বীয় আদর্শ গঠিত

করিয়া তমোগুণের নিরতিশয় সম্প্রসারণতারূপ তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। কল্পিত ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা-গণই তাহাদের ঈশ্বরানুভূতির পর্য্যাপ্ত পরিসীমা। এ কথা পঞ্চ-দশীকারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রজঃপ্রধান মানবগণ স্বনিহিত রজোগুণের বলবত্তা অনুসারে কল্পিত ঈশ্বরে বিভিন্ন শক্ত্যাদির আরোপ করিয়া তাহাদিগকেই জীবনের আদর্শ করিয়াছে। অস্ম-দেশীয় বেদোক্ত ইন্দ্র, সোম, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সবিতা ও দিক্-পাল প্রভৃতি মহাশক্তিসম্পন্ন দেবগণ এইরূপে আদর্শস্থানীয় হইয়া ঈশ্বররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্ত্বপ্রবণ মানবগণ তাহার কল্পিত উচ্চাদর্শে শান্তি, প্রেম, দয়া, বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতা প্রভৃতি স্বনিহিত-গুণেরই আরোপ করিয়া তাহাদের ঈশ্বরকে মনোভিমত গঠন করিয়া লইতেছে। ফলতঃ একপ বিচারের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, অস্ম-দাদির অন্তর্নিহিত গুণপ্রাবল্য বশতঃ আমরা যে উচ্চাদর্শকে ঈশ্বর-রূপে নির্দ্ধারণ করিতেছি, তাহা আমাদিগেরই মনঃপ্রতিবিম্বিত গুণাদির যৎকিঞ্চিৎ প্রস্ফুরণ মাত্র। সেই সেই গুণের সম্পূর্ণ বিকাশমানতা সম্পাদনই আমরা ঈশ্বর লাভের সীমান্ত তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র গুণ বৈষম্যেই কল্পিত আদর্শ বা ঈশ্বরের বৈষম্য হইয়াছে। তাই প্রত্যেকের ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যদিও কোন অবতার কল্প বিভূতিমান্ ব্যক্তিবিশেষকে আমরা অধিকাংশই উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর মানিয়া লই, তথাপি নিপুণভাবে ভাবিয়া দেখুন, জ্ঞানী "রাম" তাহার জ্ঞানদর্শনে প্রেমিক "শ্যাম" তাহার নারদীয় ভক্তি দর্শনে এবং হয়ত কোন উচ্চাধিকারী একাধারে জ্ঞানী ও প্রেমিক "যদু" তাহার জ্ঞান ও প্রেম দর্শনে তাহাকেই জীবনের উচ্চাদর্শ স্থির করিয়াছে। যতদিন না অন্তর্নিহিত গুণবৈষম্যের নিঃশেষ সাম্য হইবে, ততদিন এরূপ আদর্শ-ভান্ ছাড়াইতে জীবের সাধ্য নাই। ত্রিগুণোন্মূলিত হৃদয়বান্ মানবই সেই নিরপেক্ষ (absolute) সৎস্বরূপে অবস্থানের যোগ্য হয়। ইহাই ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণের যৌক্তিক ও আনুভাবিক উপপত্তি।

ঈশ্বরোপাসনাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উপাসনা বিষয়ে ঝটিতি হস্তক্ষেপ করা অসমীচীন বোধ হওয়াতেই উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ব্বে স্বমত ব্যক্ত করিয়া পশ্চাৎ শ্রুতিদর্শন ও পুরাণাদিতে ঈশ্বরের কিরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সংপ্রতি যথাশাস্ত্র তাহারই আলোচনা করিব।

অনাদি অজ্ঞান বশতই আমরা প্রত্যেকে নানাগুণান্বিত ও কর্ম্মতৎপর হইয়া জনন-মরণ-সঙ্কুল মহামোহান্বিত সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। এবং স্বীয় ভাবনানুরূপ উচ্চাদর্শ কল্পনা করিয়া তল্লাভকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছি। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও দেশকাল-নিমিত্ততাই বিভিন্ন গুণ-প্রবণতার কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। যে কোন কারণেই কেন আমরা প্রোক্তরূপ বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি না, আমাদের মনঃ কল্পিত অত্যুচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর যে সকলেরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ইহজগতে বিভিন্নধর্ম্ম মতের উচ্চাদর্শরূপ ঈশ্বরকল্পনাও যে কেন বিভিন্নতা দেখিতে পাই, তাহার কারণানুমানেও আপনাদের বোধ হয়, এখন কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বৈষম্যের সাম্য ও সামঞ্জস্য কোথাও দৃষ্ট হয় কি না, তাহাই বর্ত্তমানে আলোচনার বিষয়।

অপৌরুষেয় বেদ গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" বিভিন্ন পদার্থ কিছুই নাই। "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এক সৎকেই পণ্ডিতগণ নানাভাবে প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্নগুণাক্রান্ত মানব স্বকীয় গুণপ্রাবল্যানুসারে এক অদ্বিতীয় তত্ব হইতেই তদীয় কল্পিত ঈশ্বরকে তত্তদ্‌গুণান্বিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই জন্য গুণাক্রান্ত মানবের ঈশ্বর ও সগুণ বা তটস্থলক্ষণান্বিত। সগুণ ঈশ্বরকে শ্রুতি বলিতেছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ-

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তিনিই বেদের সগুণ ব্রহ্ম। বাদরায়ণ মুনি তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বলিলেন, "জন্মাদ্যস্যযতঃ" যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ বাক্যাতীত ও ভাবাতীত। তদ্‌ভাবপ্রকাশে ভাষার প্রসরতা নাই। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। শ্রুতি তাই "নেতি" "নেতি" বলিয়া সর্ব্ব নিষেধের শেষ সীমাকেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ করিয়াছেন। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলিলেই পর্য্যাপ্তি হইবে। অনাদি কর্ম্মপ্রভাবে আমরা বিবিধগুণরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া জন্ম মরণ স্রোতে প্রতিনিয়তই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছি। অন্তর্নিহিত গুণভাবকল্পিত বিরাট-মূর্ত্তিতে বা ব্যক্তি বিশেষে অধ্যস্থ করিয়া যখন আমরা জগতের সৃষ্টিকল্পনা করিয়া লই, তখনই স্বগুণ ব্রহ্মভাব যেন আমরাই প্রকটন করি। আত্যন্তিক গুণনিঃশেষে আবার যখন মনকে প্রাণে, প্রাণকে তেজে, তেজকে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দে বিলোপ করিয়া দেহাত্মভাব সমূলে উন্মূলিত করত অভেদে আত্মসাক্ষাৎ করি, তখনই নানাত্ব জ্ঞানের অভাব হেতু সর্ব্ব নিষেধের শেষ-সীমাবস্থিত আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। বেদ ও বেদান্ত-দর্শনে ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ ও নির্গুণাভাব কথিত হইয়াছে।

অস্মদেশীয় বিভিন্ন দার্শনিকগণ এ তত্ত্বের কিরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) নাস্তিকদার্শনিক ও (২) বেদপ্রমাণ-বাদী আস্তিকদার্শনিক। নাস্তিকদিগের মধ্যেও চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায় আছে। ইহাদিগের মধ্যেও দেহাত্মবাদ দৈহিক পরিণামবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ

প্রভৃতি অবান্তর দৃষ্ট হয়। ইহারা কেহই ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর উপাসনা প্রবন্ধে ঈশ্বরাপলাপকারী নাস্তিক মত উল্লেখের অযোগ্য হইলেও প্রসঙ্গের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষার জন্যই মাত্র উঁহাদের নাম করা হইল। মহাসমন্বয়াচার্য্য ভগবান্ শঙ্করস্বামী অকাট্যযুক্তিকৌশলে ইহাদের সমস্ত মতকেই একদিন খণ্ডন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসুগণ "এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" (ব্রহ্মসূত্রে ৩৩৫৩) এবং "ব্যতিরেকস্তদ্‌ভাবাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ (ব্রহ্ম-সূত্রে ৩৩৫৪) সূত্রদ্বয়ের শারীরকভাষ্যে চার্ব্বাক মত খণ্ডন দেখিতে পাইবেন। এবং উক্ত ব্রহ্মসূত্রেরই ২য় অধ্যায়ের ২য় পাদের অষ্টাদশসূত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎসূত্র পর্য্যন্ত শারীরকভাষ্যে বৌদ্ধমত নিরাশ করিয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য তর্কশাস্ত্রের যে কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহা মাত্র উক্ত অংশ পাঠ করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে।

অধুনা বেদপ্রমাণবাদী আস্তিকদার্শনিকগণ যে যেরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রসঙ্গোপলক্ষে উল্লেখ করি-তেছি। অস্মদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শন সকলেই বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন দর্শন ঈশ্বরাপলাপ করিয়াও শ্রুতি প্রমাণপর হইয়াই মাত্র আস্তিকদার্শনিক শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হন নাই। বেদের সগুণ ও নির্গুণভাব উভয়ই অধিকারিভেদে উত্তর মীমাং-সার অভিমত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ষোড়শ পদার্থবাদী ন্যায় বেদ-প্রমাণবাদী হইয়াও তর্কপ্রতিষ্ঠিত মত স্থাপনেই সমধিক যত্নশীল। এমন কি বেদের প্রমাণ্য ও ইহারা তর্কেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিবিচারে ইহারা পাশ্চাত্যদেশীয় দার্শনিকগণের ন্যায় অজ্ঞেয়বাদেই (agnosticism) সীমাবদ্ধ না রহিয়া অনুমান প্রমাণে ঈশ্বর নামক পদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন। সপ্তপদার্থবাদী বৈশেষিকদর্শন তাহার উপরই কিছু রং পরং তুলিয়া ন্যায়ের

অস্পষ্ট পরমাণুবাদই সবিশেষ প্রকটন করত উপাদান ও নিমিত্ত কারণ সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী কপিল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই বিপরিণামে দিক্‌দৃশ্যাদি পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াও পুরুষ বা আত্মাকে না নিমিত্ত না উপাদান কারণ বলিয়া যেন শুদ্ধাদ্বৈততত্ত্বগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কপিল পথানুগামী পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও যেন বেদান্তের নির্গুণভাবের সমধিক সন্নিহিত হইয়াছিলেন। একাত্মতত্ত্ববাদী বেদান্তদর্শন সর্ব্বোচ্চস্তরে উঠিয়া নিমিত্ত ও উপাদান, কারণ ও করণকে একই নির্দ্দেশ করিয়া যেন দার্শনিকতত্ত্বাচলের গরিষ্ঠ শেখরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, গৌতমই প্রথমে দার্শনিকভাবে দ্বৈততত্ত্বের সূত্রপাত করিয়াছেন; বৈশেষিক-গণও প্রায় তদ্রূপ; তবে তাহারা একটু সমধিক চিন্তাশীল বলিয়া আমার মনে হয়। সাংখ্যের পরিণামী চিন্তা প্রকৃতি পরপার-গামিনী। পতঞ্জলির ঈশ্বরতত্ত্বেও নির্ব্যাজ-অদ্বৈততত্ত্ব সূচিত হইয়াছে কিনা, স্থির সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ সর্ব্বোচ্চ দার্শনিকেরই বিশ্রাম স্থল। প্রাকৃতিক নিখিল পরিণামই ইহাদের মতে অদ্বৈততত্ত্বে অধ্যস্ত হইয়া মরুভূমিতে জলভ্রমের ন্যায় বিজৃম্ভিত হইয়াছে।

(১) নৈয়ায়িকের অনুমের ঈশ্বর উপাস্য কিনা গৌতমের ন্যায়সূত্রে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ১৬শ পদার্থের মধ্যে যে আত্মপদার্থ আছে, তাহা জীবাত্মপর বলিয়াই মনে হয়। এই নৈয়ায়িকদিগের মতে জীবাত্ম বিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষ-দায়ক-তত্ত্বজ্ঞান। জীবের দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের ক্রম-পরম্পরায় অন্তর্হিতিই ইহাদের মতে মোক্ষ। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (গৌতম-সূত্র)।

(২) কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে ও ঈশ্বর প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। কিন্তু নব্য বৈশেষিক পণ্ডিতগণ আত্মাকে জীব ও পরমভেদে দ্বিবিধ কল্পনা করিয়াছেন। আত্মমনঃ সংযোগ

ধ্বংশ হইলেই ইহাদের মতে মোক্ষ হয়; কিন্তু তদ্দশায় সুখের লেশমাত্রও নাই।

(৩) কপিলের মোক্ষ বিবেকজ্ঞানাধীন। প্রকৃতি পুরুষই বিবেক জ্ঞানের বিষয়। প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলেই জীবের প্রাকৃতিক বন্ধন থাকে না; কাযেই কৈবল্য নামক মোক্ষ হয়। অপরিণামী পুরুষ একরূপ বিধায় ইহার অবান্তর ভেদ নাই। কিন্তু প্রকৃতির নানাত্ব আছে;—যথা মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি বিকৃতি, কেবল বিকৃত ও অনুভয়রূপ। ইহার পুরুষই বেদান্তের ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিই মায়া। "মায়াতু প্রকৃতিং বিদ্বান্ মায়িনন্ত মহেশ্বরমিতি"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ইহারা চৈতন্যকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া মানিয়াছেন। "ন সাং সিদ্ধিকং চৈতন্তং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ" (সাংখ্যসূত্রে) অর্থাৎ চৈতন্ত পদার্থ ভূত সংঘাতাত্মক দেহের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম নহে। যখন প্রকৃতির বিপরিণামেই সৃষ্টি, তখন সাংখ্যমত ন্যায় ও বেদান্তের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যেন ইঙ্গিতে অদ্বৈতকে তত্ত্বেরই সূচনা করিয়া দিতেছে। ইহারা নিত্যেশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ তাহার প্রমাণাভাব। সম্বন্ধাভাব বলিয়া তাহার অনুমানও হয় না। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" "সম্বন্ধভাবান্নানুমানং" (সাংখ্যসূত্রে)। কিন্তু ইহাদের মতে অন্ত ঈশ্বর আছে। "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনাসিদ্ধস্ত বা"। এতন্মতে হরিহরাদি পূর্ব্ব কল্পের উপাসনা সিদ্ধ জীব। সিদ্ধজীবই পরকল্পে ক্ষমতা প্রাপ্ত ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৪) সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনমতে ঈশ্বর এক প্রকার পুরুষ বিশেষ। এই মূলপুরুষ জীবনামধারী পুরুষ হইতে সম্যক্ পৃথক। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (যোগসূত্র)। ক্লেশকর্ম্ম ও বিপাকাশয়াদি দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" সূত্রে ঈশ্বরোপাসনা ও সূচিত হইয়াছে।

(৫) ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগের বিচারেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বেদান্ত সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মাদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান এ দর্শনের অনভিমত। বেদান্তবিৎ যেমন বলেন জগৎপ্রপঞ্চের নিঃশেষ বিলয়ে মোক্ষ হয়, ইহারা বলেন জগৎ সম্বন্ধেব বিলয়ে মোক্ষ; সুতরাং ইহারা জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় ইহাবা সমধিক যত্নশীল নহেন; কাবণ ইহাদের মত এই যে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষের একমাত্র কারণ। সুতরাং শাস্ত্রান্তরালোচনা ইহাদের মতে নিতান্ত নিষ্ফলা।

(৬) বেদান্তের ঈশ্বর-ভাব পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এতন্মতেও তিনটী অবান্তরভেদ দৃষ্ট হয়। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদী অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীব ও ব্রহ্মেব অভেদ উপলব্ধিই ইহাদের নির্ব্বাণ মুক্তি। ইহারা বলেন "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ ইদমেবতুসচ্ছাস্ত্রং" ইতি বেদান্তডিণ্ডিম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার না কবিলেও ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার না কবিয়া সেবাসেবকানুরূপ উপাসনায় পক্ষপাতী। শুদ্ধদ্বৈতবাদিগণ জীব ও জগৎ উভয়কেই ব্রহ্মাতিরিক্ত ও সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ষড়্দর্শনোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম, দার্শনিকগণ কেহই একমত নহেন। সকলের ঈশ্বরদর্শনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকলেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনার্থ শ্রুতি হইতে অনুকূলা যুক্তি সংগ্রহ কবিয়া স্বমত-সমর্থনে যত্নবান্ হইয়াছেন; অথবা শ্রুতিব শ্লোক নিজাভিপ্রায়ানুসারে ব্যাখ্যা কবিয়া স্বীয় অভিমতের অনুরূপ ঈশ্বর ভাব প্রকটন করিয়াছেন। উপরি উক্ত দার্শনিকতত্ত্বাদি অধিকারিভেদে সর্ব্বত্রই সুষ্ঠু প্রযোজ্যমান হইয়াছিল; এবং তত্তৎ সময়ে ইহাদেব সম্যক উপযোগিতা অনুমান করিয়াই দার্শনিকগণ বিভিন্ন রূপ মতাদিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করত নানা গুণাত্মক মানবজাতিকে ক্রমে ক্রমে একাদ্বৈততত্ত্বে আনিতেই প্রয়াসশীল হইয়াছিলেন। ঘোর-তমসাচ্ছন্ন দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকগণ

বলিলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। তমঃপ্রধান মানব তাহাই বুঝিয়া বলিল, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" জড় পরিণামবাদী (modern evolutionists) এক জড়কেই আমি কারণ স্থির করিয়া চৈতন্যকে তাহার পরিণাম নির্দ্দেশ করিলেন। বিজ্ঞানবাদী তদুচ্চস্তরে উঠিয়া শূন্য বা আকাশতত্ত্বের উপর আর উঠিতে পারিলেন না। তদপেক্ষা বিবেকবান্ প্রত্যক্ষ প্রমাণবলম্বীগণ লৌকিক ন্যায়াবলম্বনে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এবং প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবাদ (Compte's positivism) প্রচার করিলেন না। জগতের সেরূপ অধিকারীরও অবধি নাই; অনেকে তাহাই অবলম্বন করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কোথা' যাই?

আমি চাহি ভুলিতে সংসারে,
সংসার-অতীত স্থানে যেতে।
সে' কেন গো চাহে বাঁধিবারে
শত স্নেহ মমতা-ডোরেতে?

কেনইবা কাতর নয়ানে
মুখ চাহি' ফেলে অশ্রুধার?
এত ক্ষুদ্র নিরাশ্রয় হৃদে
এত কি আশার আছে তার?

আমি বলি—'আমি চিরদুঃখী
দিবার মতন কিছু নাই'!
এত বলি, তবু চাহে মোরে;
সংসার ভুলিতে কোথা' যাই?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বাসনার অবসান।"

পরীক্ষা বিষম ঘোর,
দুর্ব্বল হৃদয় মোর,
নাহি জানি কেমনে মা! হইব গো পার!

পাঠা'লি কি এ সংসারে,
কাঁদাইতে তনয়ারে,
এই কি মা! মাতৃ-স্নেহ হৃদযে তোমার?

আমি কন্যা কাঙ্গালিনী,
তুমি মা! বিশ্বের রাণী,
ভব-ঘোরে ত্বরা ক'রে কর গো উদ্ধার;

দয়াময়ী তব নাম,
কেন দেবি! মোরে বাম?
ক্রন্দনে, নীরব মা গো থাকিওনা আর।

পেয়েছে বড়ই ক্ষুধা,
দে মা তোর প্রেম-সুধা,
অন্য কোন দ্রব্যে তৃপ্তি হবে না আমার।

কেমনে দুঃখিনী-বালা,
জুড়া'বে ত্রিতাপ-জ্বালা?
তুমি মা! না দিলে স্থান চরণে তোমার;

বিশ্ব-প্রেমে মাতাইয়ে,
রাখ তব পদাশ্রয়ে,
"বাসনার অবসান" হউক আমার!

শ্রীমতী মলিনা বসু।

* কোন ভদ্র মহিলার প্রথম উদ্যম।—বীং সং।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

(১১)

এক দুই করিয়া সারদাসুন্দরী মহামায়ার প্রত্যাশায় সাতদিন বসিয়া রহিল,—মহামায়া আসিল না! পত্র লিখিল—উত্তর পাইল না, বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতনও ত তত্ত্ব লইয়া একক্রোশ দূর হইতে 'পিশিমা পিশিমা' করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল না।—তবে মহামায়ার কি হইল?

সারদাসুন্দরী একদিন বৈকালে নলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে ছিল আর ভাবিতে ছিল। সু কু নানা চিন্তা সারদাব হৃদয়-পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল,—শেষে সব চলিয়া গেল, কেবল গোটাকতক কু পড়িয়া রহিল। তাহারা এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া তাল প্রমাণ কেমন এক রকম হইয়া দাঁড়াইল। সারদা বুঝিল, মহামায়ার নিশ্চয়ই কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সে আজ সাতদিন আসিয়াছে।—আসিবার কথা শুনিলে আগে হইতে যে পথ আগুলিয়া বসিয়া থাকে, সে মহামায়া সাতদিনের ভিতরে একটা সংবাদও লইল না!—মহামায়ার বিপদে তাহাব সন্দেহই রহিল না।—কিন্তু কি বিপদ!—ভাবিবার উপক্রমেই সারদাব চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বাল্যকালের কথা—নিজের দুর্দ্দশা—দুর্দ্দশার প্রতিকাব—মহামায়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ—প্রথম দর্শনেই ভালবাসাব নিগড়-বন্ধন—তাহাব আদর, যত্ন, মমতা,—তাহাব সহিত কলহ অভিমান—নানামুখ গামিনী স্রোতস্বিনী তাহাব হৃদয়ে একটা আবর্ত্ত তুলিয়া বসিল।—নলিনীর বেণীসংবদ্ধ হস্ত তাহার পৃষ্ঠে খসিয়া পড়িল—বালিকার কেশপাশ আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—বউদিদি কাঁদিতেছে। বালিকাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া, সারদা নিজের অন্যমনস্কতা

বুঝিয়া, মুহূর্ত্তেই ভাবপরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। বলিল—"কি দেখিতেছিস্?"

ক্রন্দন দেখিতে বালিকা এমনই অভ্যস্তা হইয়াছিল যে, সারদার চক্ষে জল দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না। পরন্তু সারদার প্রশ্নে তাহার মুখের স্বভাব সংলগ্ন হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল —বলিল—"দেখিতেছি তুমি কাঁদিতেছ।"

"আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কি তোর হাসি আসিল?"

"কি করিব? কান্না দেখিয়া দেখিয়া আমার হাড় জ্বলিয়া গিয়াছে। এখন লোকের কান্না দেখিলে আমার হাসি পায়।"

"বলিস কি!—তুই এই দুধের মেয়ে, বলিলি কি নলিনি?"—

বালিকা মুখ অবনত করিল। সারদা অঙ্গুলি-প্রান্ত দিয়া সেই অবনত মুখ আবার তুলিয়া ধরিল। নলিনী তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল। সারদা দেখিল কুসুমকোমলা বালিকার মুখে প্রবীণার গাম্ভীর্য্য মাখিয়া গিয়াছে। সারদা কিছু বিস্মিতা হইল।—জোর করিয়া মুখ তুলিয়াছিল—পলক তুলিতে ত আর জোর চলিবে না। সারদা আর একবার চাহিতে তাহাকে অনুরোধ করিল। বালিকা অনুরোধ রক্ষা করিল না। বালিকার অধরে হস্ত সংলগ্ন ছিল,—হস্ত খুলিয়া লইল।—বালিকা মুখ ফিরাইল। সারদা তাহার চুল ছড়াইয়া দিল, বালিকা কথা কহিল না। কেশকলাপ ইতস্ততঃ—পৃষ্ঠে মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল, তথাপি নলিনী কথা কহিল না, তখন সারদা বুঝিল, বালিকা লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্য আবার তাহার মুখ ফিরাইল—বারবার তাহা চুম্বিত করিল, আর বলিল—"তোর মা আমার মামী—আর তুই আমার ননদী—এবার হইতে তোর মাকে দেখিলে আমি ঘোম্টা দিব, আর তোর সঙ্গে গল্প-গুজব আদর সোহাগ, বিবাদ বিসম্বাদ—যাহা কিছু করিবার সমস্ত করিব। তুই আমার যোগ্যা সঙ্গিনী।—এখন বল্ দেখি—আমাকে ছাড়িবিনা।"

বালিকা আবার মুখ ফিরাইল—চোখ তুলিতে তুলিতে অধর-প্রান্তে আবার হাসির রেখা দেখা দিল। সারদার চক্ষুজল শুকাইয়া মেঘের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে বালিকাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ ভাল বাসিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহার স্বভাবের—একটা প্রতিবিম্ব বিধাতা মেদিনীপুরে আঁকিয়া রাখিয়াছিল -সেটা আপনা আপনি কেমন করিয়া তার ঘরে আসিয়াছে।—ইহাকে কোনও গতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে—প্রকৃতিদত্ত এই ক্রীড়নক লইযা, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাগুলা ভুলিবার উপায় হইবে।

"আমার মাথাখাস্ বল্ ভাই! আমাকে ছাড়িবি না।"—সারদা উপযাচিকা, বালিকার হাত দুইটী জোর করিয়া ধরিল।

বালিকা ননদীর পদে অনধিকারিণী ছিল—এ কয়দিন সাবদা তাহাকে কন্যা বাৎসল্যেই দেখিয়া আসিতেছিল—স্বভাবসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বিজ্ঞার মত ব্যবহার করিতেছিল। আর সেই গর্ব্বভরা আসন পরিত্যাগ করিয়া, বালিকাকে আপনাব সকল অধিকার ছাড়িয়া দিল। বালিকা ননদীর পদ পাইল, ননদীর তেজ পাইবে না কেন?—সারদার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"বলিতে পারি না।"

"কেন ভাই?"

"তা' বলিতে পারি না।"

"কেন, আমি কি তোদের অযত্ন করিয়াছি?"

বালিকা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। আবার মাথা হেঁট করিল, —অঙ্গুলি দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। সারদা তাহাব হাত টানিয়া ধরিল।—আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই?—আমার সঙ্গ কি তোর ভাল লাগিতেছে না?"

বালিকা উত্তর করিল না। সারদা তাহার গাল টিপিয়া ধরিল—আর বলিল—"দুষ্টমেয়ে তোকে ছাড়িবে কে?"

বালিকার মুখ আবার প্রশান্ত হইল—সেই ঈষদাবনত প্রশান্ত ও মুখের ঈষদুন্নমিত নয়ন সারদার পিপাসিত লোচনের উপর পড়িল,

—মুগ্ধা সারদাসুন্দরী মোহের সাগরে ডুবিয়া গেল।—বালিকা বলিল—"মা এ স্থানে থাকিতে চাহিতেছে না—কয়দিন ধরিয়া যা'ব যা'ব করিতেছে।"

অতি আগ্রহে সারদা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"মা বলে, তোমরা কুহকিনী—তোমরা আমাদিগকে আর একটা কি বিষম বিপদে ফেলিবার জন্য ধরিয়া রাখিয়াছ।"

"তোমরা!—এক কুহকিনী আমিই না হয় হইলাম, আর কুহকিনী কে? মা—আমার শাশুড়ী।"—কথাটায় সারদার আনন্দ উছলিয়া উঠিল, কিন্তু ভাবার্থ বুঝিবার একটা নূতন কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।" [ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মহিলা-মেলা।

"Virtue may be assailed, but never hurt,
Surprised by unjust force, but not enthralled:
Yea, even that which mischief meant most harm,
Shall in the happy trial prove most glory"

—Milton's Comus.

যাঁহার অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যে ও মন্ত্রণা-কুশলতায় মোগলের গৌরব-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগণে স্থাপিত হইয়াছিল, যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে হিন্দুজাতীর বীর্য্য-বহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ রাজপুত জাতিরও স্বাধীনতা-রবি চিরতরে অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যাঁহার ভুজবলের নিকট দুরন্ত আফগান জাতিও পরাজিত হইয়াছিল, যাঁহার বিচক্ষণতায় ও সুশাসনে শান্তি-শশী সুবিমল কিরণ দান করিয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শীতল করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যাঁহার যশঃ-প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, যাঁহার উদার রাজনীতি ও সমদর্শিতায় হিন্দুজাতি মুগ্ধ, যাঁহার "দিল্লীশ্বরো

বা জগদীশ্বরো বা" * নাম আজিও খ্যাত, এবং যাঁহার তেজস্বিতা মহত্ব, ও উদারতা প্রভৃতি সৎগুণাবলী রাজভক্ত হিন্দুজাতি কখনও ভুলিবে না, সেই মোগল-কুল-তিলক হুমায়ূন-তনয় আবদুল মোজাফ্যার মহম্মদ জেলালুদ্দিন আকবর গাজি বাহাদুর এই "মহিলা-মেলার" † প্রবর্ত্তক।

যখন সম্রাট আকবর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত ভারতের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তৎকালে তিনি প্রতিমাসেই এক একটী মহোৎসব করিতেন। এই প্রতিমাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিবসে উক্ত "মেলা" বসিত—এজন্য ইহার নাম "নওরোজা" ‡ কিন্তু সম্রাট আদর করিয়া ইহার নাম রাখেন—"খোসরোজ" বা "আনন্দের দিবস।" ¶ সম্রাটের প্রাসাদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই "নওরোজার" বাজার বসিত। এ বাজারে পুরুষ সমাগম আদৌ নাই; রমণীরাই ক্রেতা, রমণীরাই বিক্রেতা—এ বাজারে রমণীরাই সব। কোন কবি বলেন:—

"রমণীকে বেচে, রমণীতে কিনে,
লেগেছে রমণী-রূপের হাট।"

রমণীরা যাবতীয় শিল্প-চাতুরিযুক্ত নয়ন ও মন তৃপ্তিকর দ্রব্য লইয়া সারি সারি দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছেন! যে দিকে

* Vide. Badoni. Vol. II. P. 324.

† আইন-ই-আকবরীতে আকবর সাহেবের এই নাম দৃষ্ট হয় না। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্লকম্যান সাহেবের কৃত আইন-ই-আকবরীতে এই নাম দৃষ্ট হয়:—Abul Fath Jalaluddin Mahammud Akbar Padisha i Gazi.

Vide. Blochman's Translation of "Ain-i-Akbari. By Abul Fazl, Allami" Vol. I P. 186.

‡ "নওরোজা" বা "নোরোজা" শব্দের অর্থ "নূতন দিবস" অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিন, কিন্তু এখানে উহার অর্থ ভিন্ন প্রকার। এখানে ইহা "নবম দিনের উৎসব" এইরূপ করিতে হইবে। মহাত্মা টড্ ইহাকে "Ninth-day fair" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

¶ Vide, Blochman's, Ain-i-Akbari, Ain. 23. of Vol. I, Page. 276. & 277.

চাও, সে দিকেই রমণীর শোভা বিরাজমান। সম্রাট পত্নী ও তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ ক্রেতা ও রাজন্যবর্গের ললনাগণ বিক্রেতা। ভারতে সম্রাটের অধীনস্থ যাবতীয় রাজপুত রাজাগণের মহিলাগণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের মহিলাগণ এই বাজারের শোভা বৃদ্ধি করিয়া সম্রাটের মনে অতুলনীয় আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিতেছেন! এই আনন্দের দিনে আনন্দ-বাজারে সম্রাট আকবর সাহা ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। লাবণ্যবতী ললনাগণের রূপে আজ সম্রাটের প্রাসাদ আলোকিত, শিল্প-চাতুরিযুক্ত দ্রব্যের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রাজভবন উদ্ভাসিত, সমগ্র রমণীগণ এই অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিয়া পরম উল্লসিত, সম্রাটও ঐ সকল রমণীগণের সৌন্দর্য্য-গরিমা ও ঐ সকল দ্রব্য সকলের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া অনন্ত পুলকে পুলকিত। ছদ্মবেশ-ধারী সম্রাট এ বাজারে কোথায় বসিয়া গল্প কবিতেছেন, কখন বা কোন দ্রব্যের দর করিতেছেন, কখন বা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, কখন বা কোন সুন্দরীর সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন, কখন বা ললনাগণের প্রমুখাৎ রাজ্যের অবস্থা ও রাজ-কার্য্যের সমালোচনা ও রাজপুরুষগণের চরিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেছেন; যেন অনন্ত-সুখ-সাগরের তিনি আনন্দ উদ্ভাসিত তরঙ্গে ভাসমান হইয়াছেন!

এ বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাটের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। যে বাজারে আদৌ পুরুষ সমাগম নাই, তথায় সম্রাটই বা কেন ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করেন? যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এই বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট স্বীয় রাজনৈতিক অভিসন্ধির কুটীলতা, স্বীয় সূক্ষ্মদর্শিতা ও অসৎ চরিত্রের জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ—এই বাজারে রাজপুত-সামন্তগণ ও রাজন্য-বর্গেরা স্ব স্ব স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। যে সকল রাজপুতেরা যুদ্ধ করিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও অন্যান্য অধীনস্থ নরপতি-বৃন্দ এবং যাবতীয় মোগল আমীর ওমরাহ প্রভৃতি রাজপুরুষ

সকল স্বীয় অন্তঃপুরস্থ ললনাগণকে "খোসরোজের" বাজারে প্রেরণ করিয়া সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার ও সম্মাননা করিতেন। কোন কোন ভীরুস্বভাব রাজন্যবর্গ এইরূপ ভাবে রমণীগণকে সম্রাট ভবনে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিতেন। রাজপুতানার কোন কোন তেজস্বী নরপতিগণ অনিচ্ছা সত্বেও রমণীগণকে পাঠাইতেন। এই সকল তেজস্বী রাজপুত নৃপতি-গণের মধ্যে কেহ কেহ যদিও সম্রাটের করে স্বীয় ভগিনী ও কন্যা গণকে সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তথাপি সম্রাটের এবম্বিধ আচরণে অনেকেই নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন। এরূপ ভাবে হিন্দুর অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিয়া আকবর যে কেবল তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করাইতেন তাহা নহে, একেবারে চিরকালের নিমিত্ত তাহাদের শুভ্র বংশ-গরিমায় কলঙ্কলেপণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, স্ত্রী জাতি হিন্দুর মান সম্ভ্রম ও গৌরবের আধার। অতএব এই হিন্দুর অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিলে যে হিন্দুর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাকি থাকে না, ইহা জানিয়াই তিনি "মহিলা-মেলা" বা "খোসরোজের" প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি এই গর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া যে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক অভিসন্ধির গূঢ়মর্ম্ম নিহিত থাকিলেও এরূপ অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ইহাতে যে তাঁহার রাজনৈতিক অভিসন্ধির কুটীলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ছদ্মবেশে "মহিলা-মেলায়" পরিভ্রমণ করিয়া রাজ্যের শিল্পের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যতদূর জ্ঞান লাভ হউক বা নাই হউক, ঐ সকল রমণীগণের প্রমুখাৎ রাজকার্য্যের সমালোচনা ও রাজ-পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার রাজ্য শাসনে যে অনেকটা সাহায্য হইত, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। যে স্থানে আদৌ পুরুষ সমাগম নাই, কেবল রমণী, সে স্থানে যে রমণীরা কোনরূপ গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত

হইবে না, ইহা নিশ্চয়। রমণীগণ যে সাধারণ পুরুষগণাপেক্ষা দোষ গুণের বিচার ও কোন বিষয়ের ত্রুটি ধরিতে সবিশেষ সক্ষম, ইহা আপানার সকলেই জানেন বলিয়া বোধ হয়। বাজারের স্থানে স্থানে দুই তিন বা তদধিক রমণীগণ একত্রে বসিয়া নির্ভয়ে, অসঙ্কুচিত ভাবে, মনের সুখে যে সাংসারিক ঘটনাবলী বর্ণনা করিবে এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে সমালোচনা ও পুরুষ চরিত্রের আলোচনা করিবে, এ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। প্রকৃত পক্ষে "নওরোজার" বাজারস্থ রমণীরা রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় দোষ-গুণাবলী ও স্ব স্ব স্বামী ও আত্মীয়গণের চরিত্র কাহিনী পরস্পরে নির্ভয়ে বর্ণনা করিতেন। কতকগুলি রমণী যদি একত্রে বসিয়া গল্পারম্ভ করেন, তাহা হইলে কথায় কথায় যে নানারূপ কথা আসিয়া পড়ে, ইহাও নিশ্চয় ও তৎসঙ্গে নানা বিষয়ের দোষ গুণ বিচারও যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, বিশেষ রূপে বলিয়া দিতে হইবে না। রমণীগণের পক্ষে এরূপ হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহা রমণী-চরিত্রের সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আকবরও একজন সবিশেষ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ও যে সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ বিষয় বেশী বুঝিতেন ও অতি সহজেই হৃদয়াঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আকবর রমণীগণের প্রমুখাৎ রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় দোষ-গুণাবলীর স্বাধীন ভাবে সমালোচনা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন ও তাঁহাদেরই বর্ণিত, তাঁহার স্বকর্ণে শ্রুত অন্যান্য রাজ-পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া মনিব চরিত্রে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতেন; ও সেই সেই রাজপুরুষগণকে তাহাদের গুণানুসারে তদনুরূপ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। অতএব ইহা দ্বারা তাহার রাজ্যশাসনে যে অনেকটা সাহায্য হইত ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী C. I. E.

এমন অনেক বৃক্ষ আছে, যে রোপণ করে, সে তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না; রোপিত বৃক্ষে হয় ত এক পুরুষ পরে ফল হয়। বৃক্ষ রোপণ করিয়া, যত্ন করিলে, তাহার পথের বিঘ্ন ঘুচাইয়া দিলে, প্রায় নিষ্ফল হয় না। সেইরূপ মনে বাসনার বীজ রোপণ করিয়া দিলে, সে বাসনা, এজন্মে না হউক, পরজন্মে বা অপর কোন জন্মে তাহার ফল হইবেই হইবে। যে সাধক "ঈশ্বর দেখিব" "ঈশ্বর দেখিব"—কবিয়া হৃদয়ে বাসনার বীজ রোপণ করে, তাহার বংশে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই আসিতে হয়। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঈশ্বরকে বলিতেন, "যদি আমার পুত্র হয়, তাহা হইলে যেন তুমিই আমার পুত্র হইও!" এই বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, শেষে ভগবান, রামকৃষ্ণ রূপে তাঁহাব গৃহ আলোকিত করিয়া ছিলেন! সেইরূপ কাশিমবাজারে, কান্তবাবু শুভক্ষণে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, এক মুদীখানার দোকান খুলিয়া ছিলেন। সেই যে তিনি লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া বসিয়া ছিলেন, প্রাণের সহিত লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই ডাকাই মা' লক্ষ্মীর আসন টলিয়াছিল। তিনি স্বর্গ হইতে দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে ১৮২৭ সালেব অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জিলার ভাটাকুল গ্রামে এক দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদের এই মা' লক্ষ্মীর পিতা মাতা, তাঁহাব নাম দিয়াছিলেন "স্বর্ণময়ী।"

ওদিকে কান্ত ক্রমেই লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া, মুদীখানার দোকান হইতে বড় আড়ত করিলেন। এই সময় কান্ত মুদীকে কান্ত বাবু বা "শ্রীকৃষ্ণকান্ত নন্দী মহাশয়" বলিয়া লোকে ডাকিতে লাগিল।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের রাজা হন নাই। তখন ইংরাজেরা ছিলেন কুঠিয়াল। কলিকাতা ছিল কোম্পানির বড় কুঠি, এবং স্থানে স্থানে অনেক শাখা কুঠি ছিল।

কাশিমবাজারে ইংরাজদের যে কুঠি ছিল, এই কুঠির সম্মুখেই কান্ত বাবুর দোকান। কাশিমবাজারের কুঠিতে রেসমের কার্য্যই বেশী হইত। কুঠির এক জন কর্ম্মচারি সাহেবের নাম ছিল হেষ্টিংস্। এই সময়ে নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ হয়। শত্রুতা ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিল, এই জন্য নবাব আদেশ দিলেন ইংরাজ তাড়াইতে হইবে। যত কুঠির উপর কোপ পড়িল। ঘোষণা হইল, 'যে ইংরাজকে আশ্রয় দিবে তাহার সর্ব্বস্ব নবাব সরকার কর্ত্তৃক বাজে-আপ্ত হইবে এবং তাহারও সবংশে নিপাত হইবে।' অন্যান্য কুটির ন্যায় কাশিম বাজারের কুঠিরও বিপদ ঘটিল। কুঠির অনেককে প্রাণ দিতে হইল। হেষ্টিংস সাহেব প্রাণ ভয়ে কান্ত বাবুর আশ্রয় লইলে, কান্ত বাবু সাহেবকে অভয় দিয়া নিজের অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর সুবিধা ক্রমে সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

চিরদিন কখন সমান যায় না! ওদিকে লর্ড ক্লাইব আসিয়া নবাবের রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তাহার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই কাশিমবাজারের কুঠিয়াল হেষ্টিংস সাহেব বড় লাট হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় প্রাণ-রক্ষা কর্ত্তা কান্ত বাবুকে নিজের দেওয়ান করিলেন। এই বার কান্ত বাবুর নাম হইল,—**দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত।**

ইহার পরামর্শে জমিদারী প্রথার সূত্রপাৎ হয়। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চলিত করেন। লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস মহোদয় কৃষ্ণকান্তকে আজিমগঞ্জ, গাজিপুর জায়গীর দিয়াছিলেন। ১৭৭২ সালে ইনি দেওয়ান্ হন্। ১৪ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ সালে কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৭৮৮ সালে দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়। হেষ্টিংস ইহাঁকে রাজা করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু হন নাই। তৎপরিবর্ত্তে হেষ্টিংস মহোদয় ইহাঁর পুত্র লোকনাথ নন্দিকে রাজা করিয়া দিলেন।

রাজা লোকনাথ।—রাজা লোকনাথ পিতার শ্রাদ্ধে বিশলক্ষ টাকা খরচ করেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এত টাকা ব্যয় এ পর্য্যন্ত কেহ

কখন করে নাই। ইহাঁর একটী মাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার নাম হরিনাথ। ১৮২০ খৃঃ লর্ড আমর্হষ্ট হরিনাথকে রাজা করেন।

রাজা হরিনাথ।—রাজা হরিনাথ হিন্দু কলেজে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ইনি খুব দাতা ও লক্ষীর উপাসক ছিলেন। ১৮৩২ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহার এক মাত্র পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ। কুমার কৃষ্ণনাথকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকলণ্ড রাজা করেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ।—এই রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহে আমাদের লক্ষীরূপা মাতা স্বর্ণময়ী আশ্রয় গ্রহণস্বরূপে রাজা কৃষ্ণনাথের সহধর্ম্মিনী হইলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। রাজা সাবালক হন ১৮৪১ সালে। মৃত্যু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন, ইহার মধ্যে তাহার ২টী কন্যা হইয়াছিল।

রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায় যে, একটা ভৃত্যের অপঘাত মৃত্যুর জন্য মুর্শিদাবাদের ডেপুটী চন্দ্রনাথ, তাঁহাকে ফৌজদারিতে ফেলিয়াছিলেন। ইনি যাইলে কিছুই হইত না, কিন্তু তখনকার লোকের আদালতে হাজির হওয়া কিম্বা সাক্ষ্য দেওয়া বড়ই কলঙ্কের কার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল। বিশেষতঃ রাজা হইয়া, কি করিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিবেন!! এই কলঙ্কের ভয়ে তিনি কলিকাতার চিৎপুররোডস্থ মাতার ভবনে আসিয়া নিজের পিস্তল দিয়া আত্মহত্যা করেন (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর)। ইহাঁর মাতা হরসুন্দরী এখন জীবিতা আছেন। কাশীধামে বাস করিতেছেন।

রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হইয়া স্বামীর বিষয় সহজে হস্তগত করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে দুইবার এই জন্য বিবাদ হয়। জাল উইল করিয়া জ্ঞাতি শত্রুরাও মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রী রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের কৃপায় সমস্ত কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৭১ সালে "মহারাণী" উপাধিপ্রাপ্ত

হয়েন। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ রাজের নিকট হইতে এই সম্মান পাইলেন যে, বংশবংশানুক্রমে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ "মহারাজ" উপাধি পাইবেন। ভারতেশ্বরী ইহাঁকে "ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারত-মুকুট উপাধি দিয়াছিলেন।

বিগত ৭১ বৎসরের মধ্যে এমন কোনও হিতকর কার্য্যেই দেখা যায় না, যাহাতে তাঁহার সাহায্য গৃহীত হয় নাই। ইনি সরস্বতী ভগ্নিকেও রীতিমত সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন স্কুল কলেজ পত্র-পত্রিকা প্রায় দেখা যায় না, যাহাতে মহারাণীর দান গৃহীত নাই। আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "বীণাপাণি"ও তাঁহাব সাহায্য ও উৎসাহ পূর্ণ বাক্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল। আজ সেই ৭১ বৎসর ব্যাপী উৎসব ভাঙ্গিয়াছে; জননী স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতভূমি শোকে কাতব হইয়াছে। সমস্ত স্কুল কলেজ একদিন বন্ধ হইয়াছিল।

দারিদ্র্যদুর্ভিক্ষপীড়িত-দেশে, দুর্ভিক্ষেব সময় মা লক্ষ্মী সরিয়া পড়িলেন। মা গো! আব কিছুদিন থাকিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া গেলে ভাল হইত। আমাদেব হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী আজ গিয়াছেন, লক্ষ্মীর বব পুত্রেবা এখন অনেকেই আছেন, আশা আছে, তাঁহাদের দ্বারা লক্ষ্মীর সুনাম রক্ষা হইবে।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } ভাদ্র, ১৩০৪ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

যৌবন-বাসনা।

বিগত বসন্তে পুন বাসন্তী বসনে,
হাসি' হাসি' কেন আসি' দাঁড়াইলি পাশে
যৌবন-বাসনা মোর? কোন্ অভিলাষে
রচিলি এ ফুল-ফাঁস বাসর-শয়নে?
কোথা' সে প্রেয়সী তো'র? প্রেম-সম্ভাষণে
কে তো'রে ভেটিবে আজি নিধুবন-বাসে?
এ চির বিরহ নিশি-সঞ্চিত পিয়াসে
কে মিটা'বে, ওরে মন, মধু বরিষণে?
থাক্ বৃথা আকিঞ্চন! যে অমৃত পিয়া
জীবি'ছে জগৎ, মিটাইছে অনুক্ষণ
অন্তহীন অন্তরের ক্ষুধা, অন্বেষিয়া
সেই উৎস, আয় আজি ফিরি মোরা দোঁহে,
সে নিত্য বাঞ্ছিত ধনে লভয়ে যেজন
জ্বলে না সে কভু আর কামনার মোহে!

ঈশ্বরোপাসনা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক বলিলেন,—এ জগতের স্রষ্টা অনুমেয়; কারণ ইহা ঘটাদিবৎ কার্য্য। "ক্ষিতিঃ স কর্ত্তৃকা" "কার্য্যত্বাৎ" ঘটাদিবৎ" (গোতম সূত্র)। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরানুমান্ করেন। নিরীশ্বর বিবাদী সাংখ্যকার [illegible] জগৎ প্রপঞ্চকে একেরই পরিণাম বলিয়া অদ্বৈত তত্ত্বের সূচনা করিয়াও যেন দ্বৈত মতকে অলক্ষ্যে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। যোগ-সূত্রকার পতঞ্জলী ঈশ্বরকে যেরূপে পুরুষ কল্পনা করিলেন, তাহা প্রায় বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মেরই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বোচ্চাধিকারী বৈদান্তিক বলিলেন, এ সৃষ্টিই অধ্যাস। একাদ্বৈত তত্ত্বে মায়াবশতই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে; ইহা প্রকৃতির পরিণামের ফল নহে, সুতরাং ইহারা কার্য্য কারণকে অভেদ বলিয়াই স্থির করিলেন। ইহারা বলিলেন,—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসংস্থ হইয়া জীব ও ব্রহ্মকে অভেদে দর্শন করে। দেশকাল ও পাত্রভেদে ইহারা সকলেই সম্যক্ উপযোগী হইয়াছিল। সুতরাং কোন মতে দোষ দিয়া সমগ্র জগতে এক মত স্থাপনে প্রয়াস পাওয়া সত্য নির্দ্ধারণের প্রবল অন্তরায়; কিন্তু পক্ষান্তরে সর্ব্বোচ্চাদর্শ সর্ব্বসমক্ষে সংস্থাপন করিয়া যাহাতে এই বৈষম্য রাজ্যে সমতা স্থাপিত হইতে পারে, তাহার প্রয়াস পাওয়াও যে, জগতের কল্যাণকর, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতে পাই, বহুত্বই দুঃখের কারণ। শ্রুতি বলেন, "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"। একত্বরস্থিত মানব সম্বন্ধ শূন্য বা নিরশেরস্তুতর নিরপেক্ষী, সুতরাং সুখ দুঃখাদি আপেক্ষিক দ্বন্দ্ববিকারের সে আশ্রয়ভূমি নহে। এই একতত্ত্বরূপ মহাপ্রস্থানে অগ্রসর হইবার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত মতগুলিই যেন এক একটী আবশ্যকীয় আলম্বনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন হিমাদ্রির

তুঙ্গ শৃঙ্গারোহনোৎসুক পর্য্যটক ক্রমনিম্ন অধিত্যকাদি অতিক্রম-নান্তে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয, মানবও তেমনি ক্রমে জডবাদ দেহাত্মবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, দ্বৈতবাদ, পরিণাম বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদরূপ ক্রমোন্নত শৈলাবোহণান্তে পবিশেষে অদ্বৈততত্ত্বরূপ মহাপ্রস্থান প্রাপ্ত হইযা থাকে। এস্থলে একপ এক পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করা বাইতে পাবে যে, যিনি জডবাদী, দেহাত্মবাদী কি পবিণামবাদী তাহাব পক্ষে সমবসাদ্বৈত তত্ত্বে উপস্থিত হওযা কিরূপে সঙ্গত হইতে পাবে? কাবণ তাহাব সহজাত গুণ ও কর্ম্মাদিই তাহাকে সসীম জডবাদে, দেহাত্মবাদে, কিম্বা পবিণাম বাদে আবদ্ধ ববিযা রাখে। সুতবাং একতত্ত্বরূপ মহাপ্রস্থান প্রাপ্তি তাহাব পক্ষে নিতান্ত দুর্ঘট। কিন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে একপ বলা যাইতে পাবে যে, যত্ন করিলেই বিভিন্ন মতাদিরূপ সীমাবদ্ধ প্রদেশ অতিক্রম কবিযা আত্ম-তত্ত্বাচলেব গবিষ্ঠ শিখবে আবোহণ বরা যায। সেই যত্নতৎপবতাবই নামান্তব—উপাসনা।

উপাসনা কাহাকে বলে, তাহাব আলোচনান্তব উপাসনাব ক্রম-ভেদগুলি প্রদর্শন ববিতে চেষ্টা কবিব।

বেদান্তসাবে লিখিত আছে,—“উপাসনানি সগুণ ব্রহ্ম-বিষযক মানস ব্যাপাযরূপাণি শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি”—আর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে অভিনিবেশরূপ শাণ্ডিল্য বিদ্যাদিকেই উপাসনা কহে। ছান্দোগ্য ভাষ্যে শঙ্কবস্বামী বলিযাছেন,—“উপাসনং তু যথা শাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন সমান চিত্তবৃত্তি সন্তন লক্ষণম্” অর্থাৎ কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্ম কল্পনা কবিযা তাহাতে যে চিত্তবৃত্তি বিন্যাস, তাহাব নাম উপাসনা। এইরূপ উপাসনাতে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্ত্তাদি কাবক ও ক্রিযাফল আবোপিত হয; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানে তাহাব নাশ হয; অদ্বৈতাত্মজ্ঞানে এইরূপ কল্পনাব নিরাশ হয। ইহাই উপাসনা ও আত্মজ্ঞানেব প্রভেদ। প্রোক্ত-রূপ উপাসনা দ্বাবা চিত্তশুদ্ধি হয, অর্থাৎ চিত্তেব গুণত্রয়াদিব প্রাধান্য নষ্ট হইয়া বস্তু-তত্ত্ব প্রকাশ পায। সুতবাং উপাসনা আত্ম-

জ্ঞান সাধনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৭ম সূত্র "আসীনঃ সম্ভবাৎ" সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করস্বামী বলেন,—"উপাসনং নাম সমান প্রত্যয় প্রবাহ করণম।" সমান প্রত্যয় প্রবাহিত করা—অবিচ্ছেদে ধ্যায়ান করা—চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করাই উপাসনা।

বেদে উপাসনার ত্রিবিধ অবান্তরভেদ আছে। যথা—

(১) অহংগ্রহ (২) তটস্থ ও (৩) অঙ্গনাশ্রিত।

উপাস্যের সহিত আপনার অভেদ বুদ্ধি স্থাপন করিয়া ভাবনা করার নাম "অহংগ্রহ" উপাসনা। প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ফল অপরোক্ষানুভূতি। শ্রুতিও এই বিদ্যাফলের সাক্ষাৎকারতা দেখাইয়া বলিয়াছেন,—"যস্য সাদদ্ধান চিচিকিৎসাস্তি দেবোভূত্বা দেবান প্যেতি"—যাহার অহংব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম এতদ্বিধ সাক্ষাৎকার হয়, আমি ব্রহ্ম কি না এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকে, তাহারই প্রাপ্তি হয়। যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তদ্ভাব ভাবিত হওত অভেদ হইয়া যায়, সে দেহ পাতের পরে পর তদ্ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। গীতাও "সদাতদ্ভাব ভাবিতা" বলিয়া শ্রুতির বাক্যকে অর্থবান্ করিতেছে। যাবৎ না আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে। ব্রহ্ম "আমার মনোময়" "আমার প্রাণময়" ইত্যাদিও অহংগ্রহ উপাসনার অন্তর্গত। এইরূপ অহংগ্রহোপাসনা বৈকল্পিক অর্থাৎ নানা হইলেও তাহাদের ফল অবশিষ্ট "বিকল্পোঽবিশিষ্ট ফলত্বাৎ" ৩।৩।৫৯ (বেদান্ত সূত্র)। এই উপাসনার পক্ষ সমর্থনো-পলক্ষে নিম্নলিখিত শ্রুতি স্মৃতি বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে "আত্মেপেপাসীত"। "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাবো বিমুঞ্চথ"। "আত্মে বেদং নিত্যমুপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত"। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই উপাস্য নাই।

(২) তটস্থোপসনাকে প্রতীকোপাসনাও বলা হয়। কোন প্রতীকে অর্থাৎ বহিরালম্বনে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করার নাম

তটস্থোপাসনা। সূর্য্যে, বায়ুতে, বরুণে কিম্বা নামে ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া যে উপাসনা করা হয়, তাহা এই উপাসনার অন্তর্গত। এই প্রতীকোপাসনা হইতেই অবান্তর ভেদে অস্মদ্দেশে মূর্ত্তি পূজার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রতীকানুসারে ইহার ফল ভিন্ন ভিন্ন।

(৩) যজ্ঞাঙ্গ ও উদ্গীথ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই অঙ্গাশ্রিতোপাসনা। যেমন "ওঁ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপসিত।" "ওঁ" এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবেক, অথবা যজ্ঞকালে "ইন্দ্রাব স্বাস্থ" "হোতাত্তম" বলিযাই ইন্দ্র এবং ওঙ্কারের ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং এ উপাসনা যজ্ঞেরই অঙ্গ বিশেষ। "অঙ্গেষু অর্থাশ্রয় ভাবঃ" ৩।৩।৬১ (বেদান্ত সূত্র)। এবং যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া কামনা অনুসারে ফল প্রদান করে মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুণভেদেও অধিকারিভেদে উপাসনাও বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে বামদেবাদি ঋষির ন্যায় সকৃত শ্রবণ মাত্রেই যাহাদের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাদের উপাস্যই কি, আর উপাসনাই বা কার? তন্নিম্নাধিকারী শুদ্ধসত্ত্ব মুমুক্ষুগণই অহংগ্রহ উপাসনার একমাত্র অধিকারী। আপনাতে ব্রহ্ম বুদ্ধি স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা পরিশেষে তাহারা আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতপ্রযত্ন হয়। এই উপাসক সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে তটস্থ উপাসনার নির্দ্দেশ আছে।

যাহারা গুণ বৈষম্য বশতঃ আপনাতে ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপাদনে অসমর্থ, জননীর ন্যায় পরম হিতৈষিণী শ্রুতি কোন প্রতিকাবলম্বনের জন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন। যে আলম্বনে যাহার অভিরুচি হয়, ঈশ্বরজ্ঞানে তাহার উপাসনা করিলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে। এই জন্য কেহ সূর্য্যে, কেহ প্রাণে, কেহ ওঙ্কারে, কেহ বরুণে, কেহ বা তদপেক্ষা স্থূল পদার্থ শিলা ও প্রতিমাদিতে উপাসনা তৎপর হইযাছে। সকাম হইয়া কোন বিশেষ ফল প্রাপ্তির

জন্যই যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা উদাহৃত হইয়াছে। এই উপাসনায় কামনানুরূপ ফল প্রদান করে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে,—"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোক সংগ্রহঃ।" ধর্ম্ম জানিবার পরম প্রমাণ শ্রুতি, দ্বিতীয় প্রমাণ স্মৃতি এবং কৌলিক ও লৌকিকাচারই তাহার তৃতীয় প্রমাণ। যে শ্রুতি ধর্ম্মে অদ্বিতীয় প্রমাণ, তাহা অধিকারী ভেদে ক্রমে জ্ঞানোন্মেষণ জন্য কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত তমঃপ্রবল, সংসার ত্রিতাপে পরিক্লিষ্টমনা, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম তৎপর করাই হিতৈষিণী শ্রুতির কর্ম্মাধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তরঙ্গায়িত ত্রিতাপের প্রবলাঘাতে যাহারা নিরতিশয় বিতাড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে যদি স্থায়ী সুখের আবাস স্বরূপ কোন স্থানের আভাস দেওয়া যায়, এবং তল্লাভার্থ যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মে তৎপর হইতে উপদেশ করা যায়, তখন তাহারা সহজেই উক্তরূপ কর্ম্মাদিতে লিপ্ত হয়, কারণ অপরিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তিই তাহাদের পরম পুরুষার্থ। তাই শ্রুতি কর্ম্মাধ্যায়ে বলিতেছে, "শতাশ্ব মেধযাজী ইন্দ্রোভবেৎ", "অশ্বমেধেন স্বর্গ কাম যজেত"—শতাশ্বমেধ দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। বিবেকী মানবের উক্তবিধ স্বর্গাদিসুখ অস্পৃহনীয় হইলেও অবিবেকীর পক্ষে উহাদের বিস্তর প্রযোজনীয়তা দৃষ্ট হয়। যাহারা ধারণাক্ষম, তাহাদের নিকট হঠাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ সারসসমীপে মুক্তা ছড়ানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। "অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ। মহানিরয় জালেষু স তেন বিনিযোজীতঃ॥" অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অজ্ঞের নিকট সবই ব্রহ্ম বলিলে তাহাকে মহানিরয় পতিত করা হয় মাত্র। সেই কারণে তমঃপ্রবল মানবদিগকে ক্রমে ক্রমে ধারণাশীল করিবার জন্যই শ্রুতি ১ম কর্ম্মাধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতি বলিলেন, কর্ম্মের ফল শীঘ্র পাইবে; সুতরাং স্বর্গাদি সুখের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। শ্রুতিপথানুগামিনী স্মৃতিও বলিতেছেন,—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রংহি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।" অর্থাৎ ইহলোকে কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্র উৎপন্ন হয় বলিয়াই, লোকসমূহ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষণস্থায়ী সুখে বিমুখ মানবগণ ধরাধামে অতি বিরল বলিয়াই বেদের কর্ম্ম কাণ্ড, জৈমিনির সময়ে মুখ্য ধর্ম্মজনক কর্ম্ম বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। মহা-জড়ভাবাপন্ন মানবদিগকে কর্ম্মাধিকারে উৎসাহিত করিয়া যখন তাহা-দিগকে সকাম কর্ম্মপরায়ণ করা হইল, জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি উপাসনারূপ দ্বিতীয় কাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বলিতে-ছেন, সাবহিত হইয়া কর্ম্ম করিও, নতুবা তোমার দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অনবহিত প্রমত্ত রাজাদিগের নরকাদি ভোগ তাহা-দিগকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিলেন। স্মৃতি ও শ্রুতির কথা অনু-সরণ করিয়া বলিলেন, "অর্থহীনে দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনে তথাত্বিজং। আত্মানাং দক্ষিণাহীনে নাস্তি যজ্ঞো সমরিপুঃ॥" (তিথিতত্ত্ব) অর্থহীন যাগাদি কর্ম্মে রাজ্য দগ্ধ হয়, মন্ত্রহীনে ঋত্বিককে দগ্ধ করে। দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ আত্ম হননকারী হয়। সংপ্রতি কর্ম্মনিরত লোকদিগকে শ্রুতি আরও বলিতেছেন, যদিও কর্ম্মকাণ্ড-কথিত যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু ভোগান্তে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বানুরূপ সুখ দুঃখের আশ্রয়ভূত হইতে হয়। মানবগণ কর্ম্মতৎপরতা বশতঃ স্বাভাবিকী জড়তা অপনয়ন করিয়াছে, সুতরাং তাহার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পশ্চাদ্‌পদ হইবার আর উপায়ান্তর নাই। তখন কর্ম্মতৎপর মানবের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হয়, যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের লালসায় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মতৎপর হওয়া গেল, তাহার ফল দীর্ঘকাল ভোগ্য হইলেও অনন্তকালের জন্য নয়। এবং কর্ম্মাদির অসম্পূর্ণতায় নানা-বিধ পাতকের সঞ্চয় হইয়া মহা দুঃখকর হইয়া থাকে। অতএব কি উপায়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে, ইহাই তাহার জিজ্ঞাস্য হয়। কর্ম্মলব্ধ ভোগ ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অনভিনিবিষ্ট মানবগণ যখন

কর্ম্মকাণ্ডের এরূপ দোষ দর্শন করিতেছেন, তথনই প্রত্যর্থ সমন্বয়-কারিণী গীতা, কর্ম্মাধ্যায়ে বেদান্ত কর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইয়া জীবরূপী অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তস্মাদশক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার। অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ" (৪।১৯)। কর্ম্ম-ফলে কামনা বর্জ্জিত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্ম করিলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু নিত্য অতএব অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাদি পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষেরই কারণ হয়, যেহেতু কাম্য কর্ম্মজনিত পাপ পুণ্যের ন্যায় সে সকল কর্ম্মে পুণ্য পাপাদির সঞ্চয় হয় না। "অগ্নি হোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ।" (৪।১।১৬) সূত্রেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহিলা-মেলা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

মানবচরিত্রে জ্ঞানলাভ ও রাজ্য-শাসনে সাহায্য পাইবার নিমিত্ত এরূপ উপায় অবলম্বন করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতীব বিরল হইলেও, ইহা আকবরের মহত্ব ও উদারতার পরিচয় নহে। মানবচরিত্রে জ্ঞানলাভ ও রাজ্য শাসনে সাহায্য পাইবার নিমিত্ত, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্থির করিতে সবিশেষ কষ্টও পাইতে হইত না; কিন্তু তথাপি তাঁহার সে পথ অবলম্বন না করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করতঃ এ পথ অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, যেরূপে হউক হিন্দুজাতির অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিয়া, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে স্ববশে রাখেন। তিনি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন যে, রাজ-ভক্ত হিন্দুজাতিকে পদানত করিয়া রাখিতে পারিলে ও তাঁহা-

দের সহিত বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহাব সবিশেষ মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক যে তাহা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। আকবরসাহ হিন্দু নর-পতিগণেব সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, "খোসবোজ" তাঁহাব সূক্ষ্মদর্শীতাব পরিচয় স্থল হইয়া দাঁড়াইযাছে। তৃতীযতঃ, যখন "নৌরোজার" বাজাবে সম্রাট আকবব-সাহ মনেব উল্লাসে ছদ্মবেশ ধাবণ কবিয়া এইরূপভাবে পবিভ্রমণ কবিতেছিলেন, তখন একটী গম্ভীব-প্রকৃতি-সম্পন্না, পবমরূপবতী, যুবতী বাজপুত বমণী, তাঁহাব নয়নপথেব পথিকা হইলেন। সম্রাট কিয়ৎক্ষণ এই বমণীব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলে বুঝিতে পাবি-লেন যে, ইনি নিশ্চযই কোন তেজস্বী বাজপুত-কুল-সম্ভূতা। এই রমণী বাঠোব-কুল-চূডামণি পৃথ্বীবাজের বনিতা ও মিবাবের প্রসিদ্ধ শক্তাচং বংশেব স্থাপয়িতার দুহিতা। এই বমণী "মহিলা-মেলায" ধীর পাদবিক্ষেপে নানা দোকান পবিদর্শন কবিযা বেড়াইতেছেন। ইনি উক্ত শিল্প-দ্রব্যাদিব সৌন্দর্য্য অবলোকন কবিযা বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়কাবিণী বমণীগণকে শীলতা ও লজ্জাব সীমা অতিক্রম কবিতে দেখিয়া বড়ই দুঃখিতা হইলেন। তাঁহাব এই মানসিক ভাবেব বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হওযাতে তাঁহার প্রতিকৃতিবও সবিশেষ পবিবর্ত্তন প্রকাশ হইল। সম্রাট্ তাঁহাব এই পবিবর্ত্তন দেখিয়া অতীব বিস্মযান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাব এতাদৃশ অকস্মাৎ পবিবর্ত্তনেব কাবণ স্থির কবিতে সক্ষম হইলেন না। এই বীবঙ্গনা "মিবার দুহিতা" (Daugter of Mewar) * এই জঘন্য স্থানে অধিক-ক্ষণ থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া তদ্দণ্ডেই সেই স্থান পবিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন। লজ্জাই বমণীগণেব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে সেই লজ্জার অপব্যবহাব, সে স্থানে কি তেজস্বিনী, শীলতা-ময়ী, লজ্জাশীলা বমণী থাকিতে পাবেন? সে স্থান যে তাঁহার নিকট প্রকৃত নবক বলিয়া বোধ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

* Vide Todd's Rajasthan. Vol I.

তেজস্বিনী রাজপুত রমণীর প্রতি সম্রাট এতক্ষণ অনিমিষলোচনে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ও প্রাণ তাঁহাতেই সমাকৃষ্ট। তাঁহাকে গমনে উন্মত্তা দেখিয়া সম্রাটও বিচলিত হইলেন, এবং যাহাতে তিনি রাজ-প্রাসাদের বহির্ভাগে গমন না করেন, তাহার উপায় বিধানে বদ্ধপরিকর হইলেন।

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"—এ কথাটী কাহারও অবিদিত নাই; এ কথাটী যে কতদূর সত্য তাহার উদাহরণ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আকবরসাহের চরিত্রেও নিম্নলিখিত ঘটনায় এ কথাটীর যথার্থতা সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান হইবে। সম্রাট আকবর এই রমণীরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। সম্রাটের এই লোভের সঙ্গে সঙ্গেই পাপ চিন্তা উদিত হইল। কিরূপে এই রমণীর সতীত্ব-রত্ন হরণ করিবেন, কিরূপে তাহার মধুমাখা প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, সেই সুযোগের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রাজপুত রমণী যে কতদূর তেজস্বিনী তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই, তাই তিনি এই পাপ কর্ম্মে অগ্রসর হইলেন। তিনি এ রমণীর তেজস্বিতার অতি অল্পমাত্র আভাস পাইলেও পাশবিক বৃত্তির প্রবলতায় আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। অতএব অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া, সম্রাট উন্মাদের ন্যায় পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করণার্থ সচেষ্ট হইলেন। অহো! যেহেতু চন্দ্রেও কলঙ্ক, গোলাপেও কণ্টক, সেই জন্য এ হেন উদারচেতা, সূক্ষ্মদর্শী, মহানুভব নররাজেরও চরিত্র কলঙ্কিত। পাশবিক বৃত্তির কি অসাধারণ ক্ষমতা। এ হেন পরম বিজ্ঞ সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকেও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার অবসর না দিয়া আত্মহারা করিয়া ফেলে।

যখন এই রমণী "নৌরোজার" বাজার হইতে বহির্গত হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বহির্গমনের পথ বড়ই জটীল দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি আকবরকে তাঁহার গতিরোধ করিয়া পথে দণ্ডায়মান দেখিতে

পাইলেন। সহসা সম্রাটকে এরূপ ভাবে দেখিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়েব উদয় হইল। যখন তেজস্বিনী রাজপুত রমণী বুঝিলেন যে, সম্রাট তাহাব রূপে মুগ্ধ হইয়া দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত তাঁহার গতিরোধ করিযাছেন, তখন তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এস্থলে—এ নরকে তাঁহার আগমন অন্যায় হইযাছে।" যাহা হউক, উপস্থিত ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত তিনিও বদ্ধপরিকরা হইলেন। তখন রমণী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে সম্রাটকে দ্বার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, দিল্লীশ্বরকে অসময়ে অতর্কিত ভাবে সম্মুখে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। তাঁহাকে দ্বার ত্যাগ না করিতে দেখিযা ক্রোধে রমণীর নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কে যেন তাঁহার কর্ণে বলিয়া দিল,—"মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—।" যেন এই আশ্বাসবাণী কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এবং এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি প্রভাবে আত্ম-সম্মান রক্ষার্থ সচেষ্টা হইলেন। যেন মিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বজননী ভগবতী ("মাতা") মৃগেশবাহিনী হইয়া তাঁহাব সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তেজস্বিনী রমণী স্বীয় অঙ্গাবরণ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া সম্রাটের বক্ষোপরি ধারণ করিলেন, যেন "মাতার" ইঙ্গিতে তিনি নব-পিশাচকে সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে অগ্রসরা হইলেন। তখন রমণী সেই নিদারুণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া, সম্রাটকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন;—"রে নরাধম। তুই ম্লেচ্ছ হইযা পবিত্র ক্ষত্রিয়-কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইযাছিস্? তোর ন্যায় নরাধমের এই অস্ত্র দ্বারা সমুচিত শাস্তি হওযা কর্ত্তব্য।" সম্রাট সেই রমণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ ও সেই ভীষণ ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিযা ভয়বিহ্বলচিত্তে দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সম্রাট স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, যে ললনার সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে তিনি বিমোহিত, যাঁহার মাধুর্য্যময়ী

মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন, এই ভীষণ ভৈরবী মূর্ত্তি সেই রমণীরই অন্তঃস্তলে লুক্কায়িত ছিল! সামান্য নারীজ্ঞানে যাঁহার উপর অত্যাচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই নারীই এখন আত্মসম্মান রক্ষার্থ তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকেই সমুচিত শাস্তি বিধানে উদ্যতা। সম্রাট আকবর সেই রমণীর ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিস্পন্দ ভাবে কিয়ৎ-ক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন; পরে সেই রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রমণী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাটও আর কোন দুঃশীলতা বা ঔদ্ধত্যর পরিচয় না দিয়া মনে মনে রমণীকে তাঁহার তেজস্বিতা ও বীরত্বের নিমিত্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আক-বরসাহ বীরপুরুষ, তিনিও বীরের সম্মান জানিতেন, তাই তিনি সেই বীরাঙ্গনাকে প্রভূত সম্মান সহকারে বিদায় দিলেন। সতী রাজপুত রমণীও সসম্মানে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। পরে যথা-সময়ে সম্রাটের সাধের আনন্দ বাজার ভাঙ্গিয়া গেল।

আকবর! তুমি না ভারতের একচ্ছত্র নৃপতি? তুমি না ভারতের ঘোরতর দুর্দ্দিনে সুখের সঞ্চার করিয়াছিলে? তোমার গুণে হিন্দুজাতি মুগ্ধ, তবে কেন এ হেন অসৎ কর্ম্ম-জনিত কলঙ্ক ও দুর্নাম চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে? তুমি এ হেন সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যকে শাসন করিয়া অনন্ত যশোরাশি লাভ করিয়া গিয়াছ, কিন্তু স্থিরচিত্তে একবার ভাবিলে না যে, কি কুকর্ম্মই করিতেছ? তুমি যে এতদূর কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পশু বিশেষ এ চিন্তা রাজভক্ত হিন্দুর মানসে স্থান পায় না। তুমি কি এতদূর ধৈর্য্য-বিহীন অপদার্থ যে, সামান্য সুখের নিমিত্ত স্বীয় অনন্ত যশোরাশিকে কলঙ্কিত করিবে? "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" এই বাক্যটীর মর্ম্ম যে তোমার ন্যায় সুবিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সমদর্শী, উদারচেতা, ধার্ম্মিক নরপতির অগোচর ছিল, তাহা মনে হয় না। তবে কেন স্বেচ্ছায় শমনকে আহ্বান করিতে অগ্রসর হইলে? তুমি কি এতাদৃশ অদূরদর্শী?—না তাহাও নহে; ইহা নিশ্চয়ই তোমার দুর্ব্বলতার

জলন্ত প্রমাণ। যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনে সমর্থ নহেন, যে ব্যক্তি পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থে আত্মহারা হয়, যে ব্যক্তি স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেরূপ অসচ্চরিত্র ব্যক্তির স্বহস্তে রাজ্য-শাসনের ভার লওয়া কোনমতে যুক্তি-সিদ্ধ নহে। আকবর! তোমার সাধের "খোসরোজে" সমস্ত রাজন্যবর্গ তোমায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়াই স্বীয় অন্তঃপুরস্থ ললনাগণকে প্রেরণ করিতেন; কিন্তু তুমি যে এতাদৃশ পাশবিক প্রকৃতির লোক, ইহা বোধ হয়, সকলেরই অগোচর ছিল; কারণ তাহা হইলে তোমার "খোসরোজ" স্থাপন করা সুকঠিন হইত। তোমার এতাদৃশ হীন-চরিত্র হিন্দুর গোচরীভূত হইলে, তাঁহারা কখনই তোমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন না, বরং তোমার উচ্ছেদ সাধনেই যত্নবান হইতেন; তাহা হইলে তোমার উন্নতি সুদূরপরাহত হইত—ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ। হিন্দুজাতি তোমার জন্য যত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ততকষ্ট কেহ কখনও বিধর্ম্মী রাজার জন্য করেন নাই। হিন্দুরাজ মানসিংহের জন্যই তোমার রাজ্যের বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্যই তুমি শত শত্রু জয় করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য সুখভোগ করিয়াছ; হিন্দু তোডরমল্লের জন্যই তোমার রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, হিন্দুর বলে বলীয়ান হইয়াই তুমি ভারতে অদ্বিতীয় নৃপতি হইলে, হিন্দুর জন্য আজিও তুমি প্রাতঃ স্মরণীয়। ধিক্ আকবর! তোমায় ধিক্; তুমি সেই হিন্দুর বংশগরিমায় কলঙ্ক রোপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? যাঁহারা তোমায় বিশ্বাস করিতেন, যাঁহারা তোমায় শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতেন, তুমি তাহাদিগের উপকার ভুলিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না? রাজভক্ত হিন্দুর মর্ম্মাঘাত করিয়া যে কলঙ্ক কিনিয়া গেলে, তাহা অতীত সাক্ষী ইতিহাস চিরকাল জগতের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়ের প্রসঙ্গে।

এসেছ বিদায় নিতে,
আমারে ফিরা'য়ে দিতে
কাটা তুলে চলে যেতে চাও।
কেন তবে আস হেথা,
ব্যথা—মনে পড়ে ব্যথা,
চলে যাবে!—ভুলে যেতে দাও।
বুঝা'তে এসেছ আজি,
শশাঙ্ক বাদলে ভিজি,
মাখে নাক মেঘের বরণ,
দেখা'তে এসেছ আজি,
রমণি! প্রণয়ে মজি',
ছোঁব নাক প্রেমের বেদন!
শুধু দুটো "আসি" কথা,
এতে কি সাধিবে ব্যথা,
ভাঙা কি খাতিরে জুড়ে যায়?
এ বল, না বুঝিবে কে,
কেন আছ নত মুখে?
প্রেম গেলে, প্রেম-অভিনয়।
আজি হে অকালে হেন,
অদৃষ্টে জাগান কেন?
চলে যাবে!—ধ্রুব নাহি টলে!
যে ক'দিন বাকী আছে,
কেন তা'রে ডাক কাছে,
বাজ সহে—বাজ পড়ে গেলে।
শুধু—"ধ্রুব"-অভিশাপ,
দেবের জ্বরের তাপ,
মরণের দুর্ব্বাসা তাপস,
তা'ই বুঝি গালে গালে,
কুসুম কৌমুদী স্তলে,
মায়া ঢাকে ঝরং অবশ!
জীবন বাসরে তা'ই,
মরণে ভুলিয়ে যাই,
মৃত্যু তাই ভাষাহীন হলো!
দূরে যাক্—দূরে যা' তা',
ছেড়ে দাও "যা'ব" কথা,
যেতে হ'লে,—গিয়ে বলা ভাল।
আমি না ডাকিব পিছু,
আমি না বলিব কিছু,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, হোক্ ব্যবধান!
তোমার আসন হেথা,
ঢাকিতে—আঁধার কোথা,
ভালবেসে,—বড় হয় প্রাণ!
আলো হেথা চিরঞ্জীবী,
মুছে নাক কোন ছবি,
বৃদ্ধে খুজে শৈশব-আগার,
তারা খসে অন্ধকারে,
শূন্যতা নাহিক সারে,
হাঁহাঁ করে আজড় আঁধার!
এই—ঘন বন ভূমি,
ছায়ারূপে রবে তুমি,
স্মৃতিময়ী—প্রতিমা—আমার।
গত-দিন ভুলে যেও,

নূতনে নূতন হয়ো,
জীবন ত—স্মরণের হার!
আঁধার তরঙ্গ রোলে,
ধরণী রয়েছে ঝুলে,
জ্যোতির্ম্ময়—মিলন—প্রলয়!
আমরা ধরায় থাকি,
সে গুণ হৃদয়ে রাখি,
শূন্যে ঝোলা—জন্ম পরিচয়।
হয়েছে "বিজয়া" রাখা,
আর কেন হেথা থাকা,
নাবি বা রাখিতে চোখে জল!
অকাঁদারে ভোলা যায়,
সুখ শেষে প্রেত হয়,
ক্ষুণ্ণ-প্রেম – আঁখি-ছল-ছল্!
কি দিব পাথেয় ভাবি,
জন্মজন্মান্তর সবই—
ফিরে গেছে ও চরণ—চুমি',
জীবনের মোক্ষ লয়ো,
ইন্দিরা বৈকুণ্ঠে রয়ো,
কর্ম্মবন্ধ—মোরে সঁপি তুমি।
প্রেমে দীক্ষা—বহ্নিজ্বালা,
মরিলে—তাতেই জ্বালা,
প্রেমে শুধু—অগ্নিহোত্র যাগ;
বুকে বহ্নি-বেদী জ্বলে,
আহুতি ত পলে পলে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর বিভাগ!
হের গো নিশীথ আসে,
ঘুমালু ভ্রমর পশে,
হিমানীর হিংসিত—মুকুলে;
মায়ার তোরণ পাশে,
সন্ধ্যা কারে ডাকে বসে।
চলে গেলে?—দিবা গেল চলে!

শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বালিকা বলিল—"বাপের বোন কি কুহকিনী হয়? পিসিমা আমার মায়াময়ী—আপনার।—তোমরা পর—তোমরা আদর দেখাও, আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য।"

"আবার তোমরা?—সত্য করিয়া বল্—আমি ছাড়া এ বাড়ীতে আবার কে তোকে আমার মত আদর করিয়াছে?—না বলিলে সত্য বলিতেছি—কিল্ মারিয়া তোর মাথার খুলি ভাঙিয়া দিব।"

বালিকা বলিল—"তোমার মত আর একজন আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া মা বলাইয়াছে।"

"কোথায় ?"

"এইখানে।"

"কবে ?"

"যেই দিন তুমি এখানে আসিয়াছ।"

"কখন ?"

"তোমার আসিবার কিছু পূর্ব্বে।"

"তা'র পর ?"

"তা'র পর আসি বলিয়া যে চলিয়া গেল, আর আসিল না।"

"বলিস কি ?"

"আজ সাতদিন হইল, আমার সেই নূতন মা ফিরিতেছে।"

"তা'র বাড়ী কোথায় ?"

"তা' কেমন করিয়া বলিব ?—সেইদিন সবেমাত্র তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আমার মা তাহাকে তুমি মনে করিয়াছিল।"

"তাহাকে দেখিতে কেমন ?"

"সুন্দর।"

"তোর মায়ের মতন ?"

"মা আমার শোকে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মায়ের আর সে শ্রী নাই।"

"আমার মতন ?"

বালিকা চুপ করিয়া রহিল।—সম্মুখে একখানি দর্পণ ছিল। সারদাসুন্দরী সেইটা টানিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিল। তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধর অঙ্গুলি নিপীড়িত করিয়া, নিজের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অলকগুচ্ছ যথাস্থান সন্নিবিষ্ট করিয়া মুখখানিকে আরও একটু সুন্দর করিয়া লইল। আর প্রতিবিম্বের উপরেই নয়ন রাখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন—আমার মতন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বালিকা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কোন রকমে কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল,—"সন্ধ্যা হইতে চলিল, চুল বাঁধিবে কখন ?"

"কেন এ এলো সৌন্দর্য্য কি তোর পছন্দ হইল না।"

বালিকা হাসিয়া সারদার কোলে মুখ লুকাইল।

সারদা বলিল,—"তোব সত্যকথা বলিতে ভয় হইতেছে, কেমন ?"

বালিকা বলিল,—"তুমি অতি সুন্দর।"

"আর তোর নূতন মা 'অতির' উপর এক কাটী বেশী সুন্দব। সত্য বল, আমি তোরে আবও বেশী ভাল বাসিব।"

বালিকা সারদার কোল হইতে মাথা তুলিল, গ্রীবা ভঙ্গে সারদার মুখের পানে আব একবার চাহিল। আব বলিল,—তুমি তাম্বুলরাগে ঠোঁট দুটী বাঙাইয়া, আবসী ধরিয়া, চক্ষে কটাক্ষ বাঁধিয়া যেমন সুন্দব, আমাব নূতন মা শুধু শুধুই তেমনি সুন্দব।" —বলিয়াই লজ্জায় হাত দু'খানি সাবদার গলায় জড়াইয়া দিল।

বালিকার এই স্বাভাবিক আত্মীয়তায় সাবদাসুন্দরী গলিয়া গেল, মনে মনে আপনাকে বহু ভাগ্যবতী বিবেচনা কবিল। আর বুঝিল—সংসারে মানস-ব্যাধিব এইরূপ শত সহস্র ঔষধ থাকিতে মানুষে খুঁজিতে জানে না—জানিতে চায না বলিযা এত দুঃখ পায। আপনাব অসুখের সন্ধানে না ঘুবিয়া—মেদিনীপুবের এই আপনার সামগ্রীটীব যদি সে সন্ধান কবিত, সেও মহামাযার মত সুখিনী হইত—সুখ বিনাবাক্য ব্যয়ে উপযাচক হইয়া, আপ-নাব কোট ছাড়িযা তাহাব দ্বারস্থ হইযা, পড়িযা থাকিত। মহা-মায়াব বাপ—কোথাকার কে তাহাদিগকে আত্মীয কবিযা মহা-মায়াকে একটী দুর্ভেদ্য সুখ দুঃখে বসাইয়া গেল—তাহার কাছে এখন আর দুঃখ আসিতে সাহস কবে না। আব তাহাব এত আপনার—তাহাদের অবহেলায মেদিনীপুবেব কোন অন্ধকারে পড়িযাছিল। সাবদাসুন্দবীব এইরূপ তর্ক মীমাংসা সকলেব পক্ষে ভাল না লাগিতে পাবে; কিন্তু মানুষ যে বিষযটী পছন্দ করে, সেটী তর্ক যুক্তিতে যেমন কবিযা পারে, আপনাব মত কবিয়া লয। কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক-বৈষয়িক ব্যবহাবে, প্রতি কার্য্যানুষ্ঠানে এইরূপ ভিন্ন পথগামী বিভিন্ন তর্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সংস্থ

নানা মীমাংসায় সংসার ভরিয়া রহিয়াছে।—কেহ পরকে তর্ক মীমাংসায় আত্মীয় করে, কেহ বা তর্ক মীমাংসায় আত্মীয়কে পর করে। কেহ মনকে বুঝাইতে পরকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বসে—কেহ বা মনকে বুঝাইতে ভাইয়ের বিষয় কাড়িয়া লয়। যে যা' করে আত্ম তৃপ্তির জন্য। সুখ দুঃখ পরস্পর সাপেক্ষ। মহামায়ার সুখ কি বুঝিতে পারুক, আর নাই পারুক, সারদা নিজের সুখটী বুঝিয়া লইল। নিজে বন্ধ্যা ছিল—পুত্রের জন্য কত ঔষধ খাইয়াছিল, দেবতার কাছে মানসিক করিয়াছিল,—কিছুই ফল পায় নাই। আজ দেবতার কৃপায় এই কন্যা রত্ন পাইয়া সারদা সন্তানের অভাব ভুলিয়া গেল।

সারদা নলিনীর বাহুদুটী নিজের হস্তে ধরিয়া তাহাকে বক্ষে সংন্যস্ত করিয়া বলিল,—"হাঁ নলু! তুই তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবি?"

বালিকা বলিল—"এখনও আমি তাহাকে তোমার মুখের ভিতর দিয়া দেখিতেছি।"

"বুঝিয়াছি, তুই দেবী দর্শন করিয়াছিস্। সে দেবী চুরি করিয়া আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছিল, তুই দেখাটা বাটপাড়ী করিয়া লইয়াছিস্।"

নিম্নতল হইতে সারদার শাশুড়ী ডাকিল,—"সারদা"। রমাপ্রসাদের মা বধূকে বধূ বলিত না, আর বধূ বলিলে সারদা উত্তর দিত না। এই কথা লইয়া সারদার স্বামীর সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উল্লেখ করিয়া মহামায়া ও তাহার কত প্রতিবাসিনী সহচরী তাহাকে কত রহস্য করিয়াছে। তথাপি সারদা কন্যা বাৎসল্য নাম না ধরিয়া ডাকিলে শাশুড়ীর কথায় উত্তর দিত না। স্বামীর সহিত সারদার বন্ধন-সূত্র কিরূপ ছিল, সারদাই জানিত অন্য কাহাকেও জানিতে দিত না। সারদা বলিল,—"যাই মা।"

শাশুড়ী নলিনীকে ডাকিল, নলিনী বলিল "যাই পিসী"।

চুল যেমন-তেমন বাঁধিয়া নলিনীর মাথায় একটা গোঁজ

করিয়া দিয়া, সারদা আরসী চিরুণী যেখানে হ'ক রাখিয়া নলিনীকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।　　[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

"বউ কথা কও !"

[পাখীর প্রতি]

কে তুমি পাখি! পাতার আড়ালে লুকাইয়া সাঁজে সকালে, দিনে দুপুরে, যখন তখন, যেখানে সেখানে "বউ কথা কও" বলিয়া চীৎকার কর; আমরা কুলের বধূ--অবলা, সবলা, তাই বুঝি তুমি আমাদিগকে নরম পাইয়া, আমাদের কোমল প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য ব্যঙ্গোক্তিতে "কথা কও" "কথা কও" বলিয়া কূজন করিয়া থাক!! বনের পাখি! বনজাত বিবিধ ফল তোমার রসনার তৃপ্তিসাধন করে, নির্ঝরিণীর কাচ-স্বচ্ছ সলিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়; তুমি স্বাধীনতার সুধাধবলিত সৌধে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়া মনের সুখে বন মাঝে—শাখীর শাখায় সুখাসীন হইয়া সুখে দিন অতিবাহিত কর, আর মধ্যে মধ্যে সুনীল নভঃস্থলে সন্তরণ দিয়া দিগন্তে উড়িয়া বেড়াও, মানব-সমাজে শিষ্টাচারের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই; তবে কেন, মানব-সমাজ অনভিজ্ঞ তুমি কুভাবে কূজন করিয়া কুলের বধূর কথা শুনিবার জন্য "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" বলিয়া চীৎকার করিয়া মর? কেন আমরা কি বোবা না হাবা?

পূর্ব্বে—বহুপূর্ব্বে—আমাদের সেই তমসাচ্ছন্ন দুর্দিনে আমাদের একটু বোবা বদ-নাম ছিল বটে, তখন পরাধীনা—অনেকের অধীনা, আমরা মূকের মতই থাকিতাম বটে, তখন বুক ফাটিলেও আমাদের মুখ ফুটাইবার যো ছিল না বটে, তখন সূর্য্যও আমাদের মুখ দেখিতে পাইতেন না, পবন আমাদের কথন শুনিতে পাইতেন কি না সন্দেহ; তখন আমরা অজ্ঞানান্ধ, আমরা অবরোধ কারাগারে কালাতিপাত করিতাম, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু বিহগবর!

চিরদিন কি কভু সমান যায়? দুঃখের পর সুখ, অমার পর পৌর্ণমাসীব ন্যায় নিশ্চয়ই আসিয়া থাকে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দাও, যাহা অতীতেব আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা শিষ্টের কার্য্য নহে। সময়ে সকল বিষয়ই উন্নতি আনয়ন করে।

এখন আর আমাদের সে কাল নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সেরূপ চাল-চলন, কথন-বলন, হাব-ভাব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আমবা এখন উন্নতির উচ্চ সোপানে আবোহণ কবিতেছি; অবরোধ কারাগারেব শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিযাছি, এখন আর আমবা "ফটকে আটক" থাকিতে চাহি না; বোবা বদ্-নাম বিদূরিত করিবার জন্য আমরা সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, সরুগলায জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছি। অধীনতার অন্ধকার হইতে শিক্ষা-দীক্ষার দক্ষতায এখন আমবা স্বাধীনতার পূর্ণালোকে আসিয়া পড়িবাছি, এখন আমবা অবলা হইয়াও সবলা, সরলা হইয়াও নিয়ত স-বোলা, কাবণ আমাদেব কণ্ঠবোলে এখন ঘর-বাহির প্রতিধ্বনিত, আমাদের কলকণ্ঠেব কাকলীতে তোমাদেব কোকিল লজ্জা পাইল, তাই সে বৎসরেব মধ্যে অধিকাংশ সময়ই পলায়নপব হয। এত দেখিয়া, এত শুনিয়াও—বোকা পাখী! আমাদেব কথা শুনিবার জন্য সাঁদাই কেন যে গলাবাজী কবিযা মব, তাহা তোমবাই জান?

আমবা আদ্যাশক্তিব অংশ, আমবা সংসারের সাব, তাই পত্নি-বিয়োগে লোকের গৃহ শূন্য হয, পত্নীর মৃত্যুতে "সংসার অন্যথা" বলে। "গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে" এ কথা ও শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। এক কথায় আমবা সংসাবেব সর্ব্বেসর্ব্বা, সংসাব দেহের কুলকুণ্ডলিনী। আমাদেব জন্যই, আমাদের বলে বলীয়ান্ হইযাই সংসাবের সমস্ত শিক্ষা, বাণিজ্য, বিষয় ব্যাপাধ, বিদ্যা, বৈভব চলিতেছে ও উন্নতি লাভ কবিতেছে। বল দেখি, নানাবিধ নূতন ফ্যাশান কল্পিত হইযা এই যে দিন দিন শিল্পেব শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে—এ কাহার কৃপায়? ইহার মূলে কি আমাদের সেই বিশ্ববিমোহকাবিণী মোহিনী শক্তির সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত নাই?

অবোধ পাখি! আমরা বোকা নহি, বোকা নহি, আর হাবাও নহি। আমাদের কথার চোটে ভূত ভাগে, আমাদের হাড়ে ভেল্‌কী লাগে, আমাদের গুণে বোবার বোল ফোটে, বোকা সেয়ানা হয়। এখন আমরা ঘোমটার ভিতরেও খেমটা নাচিতে পারি, খাশমহলে বসিয়া খোসগল্প করিতে জানি, আর খামের মধ্যে কত স্থানে কত খোশ খবর লিখিতেও শিখিয়াছি। আর কি চাই! আমাদের ঈদৃশী ক্ষমতা দেখি ? মূর্খ পাখি! কোন্ সাহসে কূজন করিয়া আমাদিগকে ব্যঙ্গ বার জন্য বলিয়া থাক,—"বউ কথা কও" "বউ কথা ক'

এখন ' .হত সমানাধিকার, বরং কিঞ্চিৎ অধিক অধিকার . া আমাদের উদ্দেশ্য হইয়াছে। এই মহদুদ্দেশ্য—সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাদের সভাপত্নিগণ, উন্নতি সোপানারূঢ়াগণ, আমাদের মুখপাত্রীগণ দিনরাত পুরুষের সহিত কত আন্দোলন, কত আলাপন, কত কথোপকথন করিতেছেন। এখন পুরুষের সহিত আমরা—হাটে, বাজারে, স্কুলে, কলেজে, আফিশ-আদালতে, সমাজ-সভাতে বাগানে-ব্যারাকে সমানাধিকার পাইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছি—আর চেষ্টার ফলও বেশ ফলিতেছে। তবে গুটীকতক নৈসর্গিক নিয়মে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাই আমরা সকল বিষয়ে পুরুষত্ব লাভ করিতে আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহাতে আমরা হতাশ হই নাই, "রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই!" আমাদের অগ্রণীগণ আশা দিতেছেন যে, আমরা বিজ্ঞান বলে সত্বর সেই নৈসর্গিক বাধা বিপত্তি বিদূরিত করিয়া,—"পুরা পুরুষ" হইয়া যাইব, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। বিজ্ঞানের বলে কি না হয়!!!

তবে একটী সময় আছে যখন আমরা কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকি,—"কথা কও" "কথা কও" বলিয়া মাথামুড় খুঁড়িলেও তখন আমরা কথা কহি না। সেটী আমাদের নিতান্ত প্রাইভেট্।

সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। সেই "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" পালায় আমরা স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে অতি কষ্টে কিয়ৎকাল রসনা আবদ্ধ রাখি। যদি সেই জন্যই সেই প্রাইভেট্ ভেদ করিয়া তুমি "বউ কথা কও" বলিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিতে মনস্থ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর তোমার রক্ষা নাই; তাহা হইলে আমাদের কোপে পড়িয়া শীঘ্রই তোমায় তোমাদের সকলকে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে ইবে। অতএব দুষ্ট পাখি! সাবধান! কোন প্রকারে ফিমে ঃ মের মূলে আঘাত কবিতে চেষ্টা করিও না। যদি নিতান্তই কথা না শুন, তবে অচিবাৎ বুঝিতে পাবিবে, তোমার পাখীর্ল ' আসিয়াছে।

শ্রীবিনে। ,াপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

স্বপনে কি জাগরণে, কে তুমি গো হৃদাসনে,
এই এস এই যাও নাহি কিছু স্থির;
হৃদি-পদ্মে পদ-ছায়া, ক্ষণতরে মিশাইয়া,
আবাব চলিয়া যাও বড়ই অধীব।
কোন পাপে অভাগারে, কাঁদাইয়া বাবে বাবে,
এইরূপে কব চিব বিষাদে মগন;
ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে, কেন যাও পলাইযে,
কি দোষে বঞ্চিত দাস ও বাঞ্চা চবণ?
ছিল স্থিব মন মম, কে তুমি বিদ্যুৎ সম,
আলোড়িত করি প্রাণ অনন্তে মিশাও;
পুনঃ অন্ধকার আসে, কম্পিত করি'ছে ত্রাসে,
দূবে যা'ক্ তমোরাশি জ্ঞানালোক দাও।
লোকে কয জ্ঞানময়, দযাময় প্রেমময়,
কিঞ্চিৎ করুণা কর এ দাসের প্রতি;
ভজন সাধন হাবা, হইয়াছি দিশে হাবা,
কৃপা চক্ষে হেব নাথ অগতিব গতি।
তুমি হে অনাথবন্ধু পতিত পাবন।
শ্রীপদে অভাগা কবি মাগিছে শরণ॥

কিরণ।

স্বরলিপি।

ভৈরব মিশ্রিত—কার্‌ফা।

কথা—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ। স্থর—শ্রীরামতারণ সান্যাল।

কিছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে দিন রবে না তোর কি হ'বে তোর তবে ;
আজ পোহা'লে কাল কি হবে দিন পাবি তুই কবে ?
সাধ কখনো মেটে না ভাই ! সাধে পড়ুক বাজ ;
বেলাবেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কায।
কেউ কারো নয় দেখ্‌না চেয়ে কবে ফুট্‌বে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল্ হরি বলে ডাকি।

আস্থায়ী।

অন্তরা।

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

বীণাপাণি।
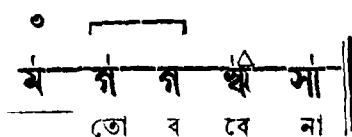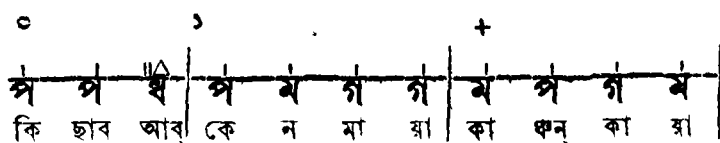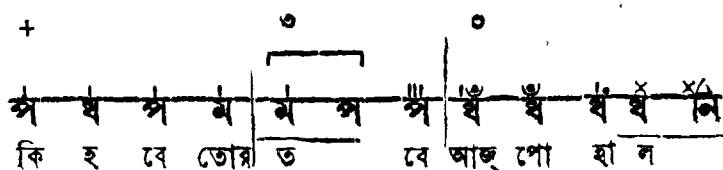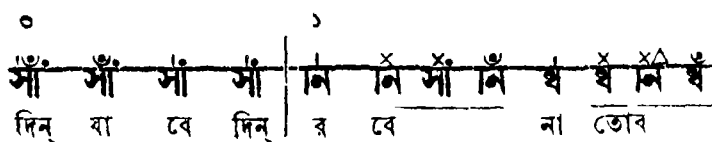
মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভাবতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } আশ্বিন, ১৩০৪ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

ঈশ্বরোপাসনা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

"অত্যেঽন্যাঽপি হ্যে কেষামুভয়োঃ"—সূত্র দ্বারা কাম্য কর্ম্মাদি যে মোক্ষেব প্রতিবন্ধক তাহাই সূচিত হইয়াছে। প্রোক্তরূপ কাম্য-কর্ম্মাদিনিরত লোকদিগকেও হঠাৎ বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া ক্রমে ফলাসক্তি পরিত্যাগে উপদেশ করাই শ্রুতি সিদ্ধান্বিত, তাই স্মৃতি বলিতেছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জন বেদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং।" যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মানি বিদ্বান মুক্ত সমাচরণ॥"

কাম্য কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা হেতুত্বই যখন এতাদৃশ ভোগবিচিত্র ও বিড়ম্বনা দৃষ্ট হইতেছে, তখন ফল বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করাই নিঃশ্রেয় প্রাপ্তির একমাত্র কারণ বলিয়া, এক্ষণে কর্ম্মাশক্ত মানবের মনে সিদ্ধান্তিত হইতেছে। যেহেতু কাম্য কর্ম্মাশক্ত মানব দেখিতেছি, —"অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত মোহজালে সমাবৃতা। প্রসক্তা কাম-ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥" নানা সংকল্প কলাপ বিভ্রান্ত

মোহজালে সমাবৃত ও বিষয ভোগে নিরতিশয় আশক্ত মানবগণ অশুচি নবকে পতিত হয। বিশেষতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানজনক কামনা ভোগ কবিযা তাহাবা দেখিকে পায, ভোগস্পৃহা ক্রমেই বলবতী হয, তাই ভগবান্ মনু বলিলেন,—"ন জাতু কামঃ কামানমুপ ভোগেণ সাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মে বভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥" সুতবাং কর্ম্মী যখন দেখিলেন যে, কর্ম্ম তাহাব কেবল ভোগেব জন্য [illegible] দর্শনে সে বিমুগ্ধ হইযা পড়ে [illegible] প্রতি-নিধি প্রথাও সে দোষেব অন্ততর্ক কাবণ দেখিতে পায। "স্বযম-সিদ্ধঃ কথং পবান্ সাধয়তি" এবম্বিধ নানা দোষ দর্শনে মানব বুঝিতে পাবে না যে, কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানেব ফল আত্মন্তবি মানবেব ক্ষণিক সুখ সমৃদ্ধিব কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিব জন্য মাত্র। তখন তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইযা কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয। তখন তাহারা বুঝিতে পাবে, "কর্ম্মন্যেবাধিকাবস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্ম-ফলে হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি।" কর্ম্মেই জীবেব অধিকাব হওযা উচিত, কিন্তু ফলে নহে।

ফল কামনায যেন কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মত্যাগে যেন জীবিত প্রীতি না হয। এইরূপে জীব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে বত হয। নিষ্কাম কর্ম্মই নামান্তবে ঈশ্বব প্রীত্যর্থ কর্ম্ম বা উপাসনা বলিযা কথিত হয। তাই গীতায বলিতেছে,— "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ।" মনুষ্যগণ যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুব আবাধনার্থ কর্ম্ম না কবিযা অন্যথানুষ্ঠান করাতেই বন্ধন দশাগ্রস্ত হয। বিষ্ণু পুবাণেও উক্ত হইযাছে, "বিশিষ্ট ফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামণাঞ্চ মুক্তিদা" অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মাদি ফলপ্রদ; কিন্তু নিষ্কামভাবে কবিলেই তাহা মুক্তিপ্রদ হয। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও বলিয়া-ছেন,—"কাম্যং কৃষ্ণস্তুষ্টার্থং প্রকর্ত্তব্যং মুমুক্ষুনা।" মুমুক্ষু ব্যক্তি কাম্য কর্ম্মাদি কবিলে ঈশ্বব প্রীত্যর্থ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"বেদোক্তমত্র কুর্ব্বানো নিঃসঙ্গো পির্তমীশ্বরে। নৈষকর্ম্ম সিদ্ধিংলভেত বোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ"—অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জণ

পূর্ব্বক বেদোক্ত কর্ম্মানুযোগানুষ্ঠানকারী মানবগণ নিষ্কাম কর্ম্ম-জনিত পরম ফল লাভ করেন। ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্ম প্রচোদনার রুচি জনক মাত্র। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমাণ সংগ্রহে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কর্ম্মীগণ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানই ঈশ্বর লাভার্থ বিশুদ্ধ উপাসনার প্রথম সোপান—আপনারা অবশ্যই অনুভব করিতেছেন।

জননীর ন্যায় পরম হিতৈষিণী শ্রুতি কর্ম্ম-কাণ্ডকে কিরূপে অলক্ষ্যে উপাসনা কাণ্ডে পরিণত করিয়াছেন, কিরূপে রজঃ প্রধান কর্ম্মীকে ক্রমোপাসনা পদ্ধতিতে সত্ব প্রবল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বনাম খ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি Goldsmith গ্রাম্য প্রচারকের সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন,—

And as a bird each fond endearment tries,
To tempt its newfledged offspring to the skies;
He tried each art, reproved each dull delay,
Allured to brighter worlds and led the way.

ঠিক যেন সেই প্রণালীতে শ্রুতি, রজঃ প্রধান মানবগণকে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলে ক্রমে সত্ত্বের নির্ম্মল স্রোত তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়াছেন! সত্ব প্রবল করিবার জন্যই উপাসনা কাণ্ডের প্রথম অবতারণা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত উপাসনা ত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা কর্ম্মধ্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া এস্থলে তাহার আর সমধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। সংপ্রতি উপাসনাধ্যায়োন্তর্গত প্রতীক ও অহং-গ্রহোপাসনা সম্যগালোচনা করিব।

প্রতীকের অর্থ বহিরালম্বন। পরিদৃশ্যমান্ বিচিত্র জগতে আল-ম্বনের অবধি নাই। আব্রহ্ম পরমাণু সমস্তই প্রতীকরূপে কল্পিত হইতে পারে। যাহা সমধিক বিভূতিমান্ সেই সেই প্রতীকই

ব্রহ্মের সমধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উক্তরূপ প্রতীকোপাসনায় সমধিক ফল প্রদান করে।

প্রাণোপাসনা, সূর্য্যোপাসনা, প্রণবোপাসনা, ইহারা সকলেই পরব্রহ্মোপাসনার অবলম্বনরূপে কল্পিত হইয়াছে। গীতার বিভূতি যোগাধ্যায়ে "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" হইতে "একাংশেন স্থিতো-জগৎ" পর্য্যন্ত যাহা যাহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সর্ব্বত্রই তাহার কোন একটী ভগবানের অন্ত-তর প্রতীকরূপে পূজিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেমন পশু পক্ষী, জাতীয় উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর, পশু পক্ষী ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিতে কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ অস্মদাদি মানবও যে কোন প্রতীকে কেন ভগবদ্ বুদ্ধি বুৎপন্যাপিত করে না, তাহাতে মনুষ্য বুদ্ধির আরোপ করিতে হইবে। তাই পুরাণে দেখিতে পাই, সূর্য্যদেব মানুষরূপে কল্পিত হইয়া সপ্তাশ্বর রথে যোজন করতঃ পৃথিবী পরিভ্রমণে পরিব্যপ্ত আছেন। তাই শ্রুতিগণও মূর্ত্তিমতী। মন ও ইন্দ্রিয়ের বিবাদ বেদেই দৃষ্ট হয়। অগ্নি, বরুণ পর্ব্বত ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বিভূতিমান্ পদার্থ মাত্রই মনুষ্য মূর্ত্তিতে পরিকল্পিত হইয়াছে। মনুষ্যের রুচি ও গুণানুসারেই প্রতীক বিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধি অধ্যারোপিত হয়। তাহার স্মরণ, মনন ও তৎসম্বন্ধীয় অনু-রাগ বা একাগ্রতাই উপাসনার অঙ্গ। তাই স্মৃতি বলিতেছেন,— "যো যো যাং যাং তনুঃ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি। তস্য তস্যা-চলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম॥" যে যে মূর্ত্তি প্রতীকে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা তত্তমূর্ত্তিতে দৃঢ়া করিয়া দেই। পৌরাণিক সময়ের পর রামানুজ, মাধবাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য ও প্রভৃতি দ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যখন দেখিলেন, প্রতীক মনেই মনুষ্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া লইতে হয়, এবং বেদেও যখন তাহার সমর্থনতা দৃষ্ট হয়, তখন বেদানুমোদিত মূর্ত্তিবিশেষকেই তাহারা ঈশ্বরাবতার নির্দ্দেশ করিয়া ভাগবদ্ ধর্ম্মের সমধিক প্রচার করতঃ ভক্তি পথানুবর্ত্তন

করিলেন। মহা বিভূতিমান্ রামকৃষ্ণাদিকে তাহারা ঈশাবতার বলিয়া অবতার বাদ বিশেষরূপে প্রচার করিলেন। তাঁহাদের উপাসনাকেই তাহারা মোক্ষলাভের অনন্যোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। পৌরাণিক সময়েই কেহ শিবমূর্ত্তি, কেহ গণপতি মূর্ত্তি, কেহ শাক্তিমূর্ত্তি, কেহ বা বিষ্ণুমূর্ত্তি রূপ প্রতীকে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করিয়া সম্প্রদায়গণের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। এখন তাহারই সমধিক সংকীর্ণতা হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। কে বলিল,—"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোন্যদেবমুপপাসতে স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপচীং বিন্দতে হিসঃ॥" বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে স্বমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে ভজনা করে। কেহ বলিলেন,—"কলাবাগ মমুল্লঙ্ঘ্য যোন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে নতস্যগতি বর্ত্তিতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।" কলিতে তন্ত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথান্তরের অনুসরণ করে, তাহার কখনও গতি হয় না। অপর কেহ বলিলেন,—"মহেশান্নাপরো দেবঃ" শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব আর নাই।

এরূপ আমরা দেখিতে পাই, একাগ্রনিষ্ঠা ও তন্ময়তা হেতু বিভিন্ন প্রতীকই স্ব স্ব প্রাধান্যে স্থপিত হইয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রবল কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যখন কেহ ইষ্টলাভানুরূপ নিঃশ্রেয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর সম্প্রদায়িকতার বিদ্বিষ্টভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই জন্য সাম্প্রদায়িক হইলেও, কোথাও বা বিদ্বান্মেষণবৎ গভীর তত্ত্ব, ইহাদিগের গ্রন্থের কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। "মৎভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দেষী শঙ্কর প্রিয়ঃ। উভৌতৌ নরকং জাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥" (হরিভক্তি বিলাসে) ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ স্থলরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর প্রতীক পর্য্যন্ত যে কোন প্রতীকোপাসনাকে কেন অবলম্বন করা যায় না, তাহার ফল বেদান্তমতে সাজুয্য প্রাপ্তি বা সগুণেশ্বর লাভ। "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যই তাহার প্রমাণস্থল।

কিন্তু সাজুয্য প্রাপ্তিও নির্গুণব্রহ্মের নিতান্ত সমীপবর্ত্তিনী। তাই সূত্রকার বলিতেছেন,—"সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ" (৪।৩।৯) "বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" (৪।৩।১৬) সূত্রদ্বারা ও প্রতীকানুসারে যে ফলের তারতম্য হয়, তাহাই বুঝা যাইতেছে। যাহারা প্রতীকোপাসনার ফলে ঈশ্বর সাজুয্য লাভ করেন, তাহারা জগৎস্রষ্টৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা (অণিমাদি সিদ্ধি) প্রাপ্ত হয়। "জগৎ ব্যাপার বর্জ্জং প্রকরণাদ সন্নিহিতত্বাচ্চ।" কিন্তু তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের ন্যায় নিরঙ্কুশ নহে। বেদান্ত গম্ভীর স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, অহংগ্রহ উপাসকেরা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থান বশতঃ জন্ম মরণের অতীত হয়। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২) কিন্তু প্রতীকোপাসনা হইতে অহংগ্রহ উপাসনা যে কতদূর দুশ্চরনীয়, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। তাই গীতা ভক্তিযোগাধ্যায়ে বলিতেছেন,—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাং। অব্যক্তাহি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" দেহাভিমানী মানবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি নিতান্ত ক্লেশকর। কিন্তু এস্থলে ক্লেশকর হইলেও প্রোক্তভাবকে হেয় বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। শ্রুতিতেও উক্ত পন্থার দুর্গমতা বর্ণন করিয়াছেন,— "ক্ষুরস্য নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কিন্তু শ্রুতি প্রমাণে ইহা অসকৃৎ জানা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানই উপাসনার সংস্কারসম্পন্ন মানবই তাহার একমাত্র অধিকারী। জগতে এরূপ অধিকারী বড়ই বিরল। কিন্তু সাধারণতঃ লোকের পক্ষে প্রতীকোপাসনাই জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইবার প্রশস্ততম উপায। উপাসনা প্রভাবে সত্বশুদ্ধি হইলে জ্ঞানরাজ্য আপনি হইয়া পড়ে। অতএব যে কোন প্রকারের উপাসনা সকলেরই অবলম্বন করা উচিত।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিলাপ।

বল বল স্বরা কবি,'
কোথা' প্রেমময় হবি,
ধৈরজ ধ'বে সখি। বহি কেমনে ?
সখিলো পরাণ কাঁদে,
তাই খুঁজি শ্যাম চাঁদে,
সে বিনে ঘুচায় কে মন বেদনে ?
হৃদি মম জ্বলে যায়,
শুধু শ্যাম বারি চায়,
ঢালিবে সুধারাশি মম পরাণে।
সে আমার আমি তাঁর,
অন্য কেহ আপনার,
ধরাতে নাহি হায় পোড়া জীবনে !
কেমনে ররেছে সখি,
আমি সদা তাঁরে দেখি,
ঝরে গো মম আঁখি তাঁরি স্মরণে,
প্রাণ কাঁদে উভরায,
মন-চোরা সে কোথায,
ব্যাকুলা আমি বড় শ্যাম বিহনে।
হৃদাকাশে শ্যামচাঁদ,
পেতেছে মোহন ফাঁদ,
বিভোলা আমি সদা তাঁরি ছলনে ;
মোহন মুরলী রবে,
কুল মান নাহি রবে,
পাগল করেছে সে ভব ভবনে।
সুপ্রভাতে সু প্রভাতে,
এলে মোর নিকুঞ্জেতে,
কহিও সখি তাঁরে মিষ্ট ভাষণে,—

সে আমার মন প্রাণ,
জলাঞ্জলি দিয়ে মান,
যায়ব যথা যায় তাঁহারি সনে ;
পেলে আমি বনমালী,
মাথায় কলঙ্ক ডালি,
তুলিয়া নিব সখি। অতি যতনে ;
পাইলে প্রাণের হরি,
কিনা পারে ব্রজনারী,
কেবা না বাসে ভাল মনমোহনে ?
সারা নিশি রবে যাগি,
আমরা তাহারি লাগি,
কৈ সে আসেনা হেথা আপন মনে।
যেন মোরা জোর ক'রে,
লয়ে আসি করে ধ'রে,
পাইনা তবু মন এত যতনে।
তাঁহার নাহিক দোষ,
সব (ই) মম ভাগ্য দোষ,
অনেকে তাঁরে চায় বিশ্ব ভবনে
শ্যামের অনেক আছে,
মোর শুধু শ্যাম আছে,
তাহারি লাগি তাই ঘুরি বিপিনে,
শ্যাম হে প্রাণের সখা।
একবার দাও দেখা,
ফাটিল বুঝি হৃদি তব বিহনে ;
অনেক সহেছি হায়,
অবলায় রাখ পায়,
পরাণ বঁধু এস কুঞ্জ কাননে।

পেলে সখা তোমা ধনে,
যমুনা বহে উজানে,
ধীর সমীর দোলে কদম্ব বনে।
হাম্বা রবে গাভী সব,
শুনিয়ে মুরলী রব,
ধায় গো উচ্চ পুচ্ছে তৃপ্ত পরাণে,

সকলে ত সুখী হয়,
পেয়ে তোমা প্রেমময়।
বঞ্চিত আমি কেন তব চরণে?
এস এস কালাচাঁদ,
দূর কর অবসাদ,
ডাকিছে রাধা দাসী তোমারে বনে।

কিরণ।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

(১২)

সারদার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি মহামায়ার প্রাণে এক দিনের জন্যও সুখ ছিল না। মহামায়া দেখিল, মেদিনীপুরের সেই বিপদ নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার বাড়ীর দ্বারে হত্যা দিতে আসিয়াছে। মনের কথা প্রকাশ করিবার লোক নাই—ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয়ভারে মহামায়া দুই দিনের মধ্যেই শীর্ণ হইয়া গেল। সারদার পত্রের উত্তর দিতে সাহস হইল না, স্বামীকেও পত্র লিখিতে মহামায়ার হাত আসিল না, এই রকমে সপ্তাহ কাটিয়া গেল; মহামায়াকে একাকিনী পাইয়া, চারিদিক হইতে চিন্তা আসিয়া তাহার সঙ্গিনী হইয়া বসিল। বালিকার মূর্ত্তিখানিও কিছুতে তাহার দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইল না। মহামায়া তাহাকে পুত্রবধূ কল্পনা করিয়া ভবিষ্যৎ সংসারের একটা ছবি আঁকিয়া দেখিল। দেখিল সে সংসারে কত সুখ? মহামায়া বালিকার মার মুখে স্বামীনিন্দা শুনিয়া, সে স্থান হইতে যতশীঘ্র পারিল পলাইয়া আসিল। আসিয়াই স্থির করিল, বালিকার সমস্ত বিবাহের ব্যয় সে নিজের স্কন্ধে লইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু

যত দিন যাইতে লাগিল, মহামায়া ততই বালিকার স্নেহে জড়ীভূতা হইয়া পড়িতে লাগিল। মহামায়া মনে মনে কতবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিল। সাতদিনের পর আবার তাহার বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল।

পরদিন সারদার বাটীতে যাইতে মনস্থ করিয়া মহামায়া রাত্রে নিদ্রা গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিল, তাহার প্রাণসম পুত্র শ্যামসুন্দর একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব নদীগর্ভে ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মহামায়া উন্মাদিনীর মত তীরস্থ লোকগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু কেহই সে প্রকৃতির ভীষণতার মধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছে না। দেখিতে দেখিতে শ্যামসুন্দর অদৃশ্য হইল, লোক সকল হাহাকার করিয়া উঠিল, মহামায়া মূর্চ্ছিতা হইল; স্বপ্নের মূর্চ্ছায় মহামায়ার জ্ঞান লোপ পাইল না। মহামায়া দেখিল চারিদিক হইতে লোক তাহার জ্ঞান ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু মহামায়া মৃত্যুর দ্বার সমীপস্থা, লোকের সেবায় তাহার জ্ঞান ফিরিল না। ক্রমে লোকজন চলিয়া গেল, তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া দিবাও অন্তহিত হইল। গভীর রাত্রে যখন মহামায়ার জ্ঞান ফিরিল, তখন দেখিল,—একটী জলবালার হাত ধরিয়া তাহার প্রিয়তম পুত্র তাহাকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেছে। "শ্যামসুন্দর তোমার পার্শ্বে উটি কে?" শ্যামসুন্দর বলিল 'নলিনী'।

স্বপ্নের তাড়নায় মহামায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে, কাক কোকিল ডাকিতেছে, মহামায়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু বোধ হইল, স্বপ্ন তাহার মস্তিষ্কের চারিদিকে এখনও পাক খাইতেছে। মহামায়া জাগিয়াও শুনিতে পাইল, "নলিনী।" মহামায়া কাণ বাড়াইয়া দিল। আবার শুনিল—"নলিনী কোথায় গেলি?" মহামায়া শয্যা হইতে উঠিল, ঘরের দ্বার খুলিল। বাহিরে পাক্কীবাহকের মৃদু কোলাহল শুনিতে পাইল।—ভৃত্য সনাতন উপরে আসিয়া বলিল—"মা! পিসিমা আসিয়াছে।"

মহামায়া বিস্ময়ের স্তম্ভ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে না করিতে নীচে দেখিল—সারদা সেই কন্যাটীকে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে।

মহামায়া ছুটিয়া উপর হইতে নামিয়া গেল, এবং বালিকাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া, সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল। তার পর এক হাতে সারদার হাত ধরিয়া, অপর হাতে নলিনীকে কোলে বাঁধিয়া উপরে ফিরিয়া আসিল।

সারদাসুন্দরী মহামায়াকে দেখিয়াই কত কথা বলিবে, কত তিরস্কার করিবে, মনে মনে কল্পনা করিয়া, সারাটা পথ ঝগড়ার একটা পাকা মুখবন্ধ করিতে করিতে আসিতেছিল। আর নলিনীকে মহামায়ার উপর তাহার আধিপত্যের কথাটাও বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছিল। মহামায়ার বাড়ীতে ও তাহার নিজের শ্বশুরালয়ের শুধু ইট্ কাঠের তফাৎ এটা নলিনীকে, অতীতের গল্প মালায় বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিল, নলিনী বুঝিয়াছিল— পিসিমার এক বাড়ী হইতে যেন তাহার আর এক বাড়ী চলিয়াছি। সেখানেও সমান আদর, সমান যত্ন, সেখানেও তাহার বউদিদির প্রতাপে, গৃহের অন্যান্য পরিবার বর্গ শশব্যস্ত।

কিন্তু মহামায়াকে দেখিয়া, ও তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া সারদাসুন্দরীর কথা ফুটিল না। মহামায়ার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল ছুটিয়াছিল।

সারদা শুদ্ধমাত্র বলিল—"তুমি আজ যাইবে, কাল যাইবে করিয়া প্রত্যাশে বসিয়া রহিলাম। যখন দেখিলাম, কিছুতেই আসিলে না, তখন তোমার নূতন মেয়েটীকে কাজে কাজেই লইয়া আসিলাম।"

মহামায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ করিয়াছ। তুমি আমার জীবন-দায়িনী।"

সারদা আর একবার মহামায়াকে ভাল করিয়া দেখিল। মহামায়া শীর্ণ হইয়াছে।

(১৩)

সমস্ত দিন মহামায়ার সহিত সারদার অনেক কথা হইল। সমস্ত ব্যাপার বিশদরূপে বুঝিয়া সমস্যা মীমাংসার সমস্ত ভারটা নিজের স্কন্ধে লইল। নলিনীকে শ্যামসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে এত বলবতী হইয়াছিল যে, সে কৃষ্ণধনকে যে কোন উপায়ে তাহার মতাবলম্বী করাই সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল। নহিলে সে আর তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না। স্বামী প্রতিবাদ করিলে তাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না। বলুক লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞা, বলুক তাহাকে নারী-সুলভ ধীরতা বর্জ্জিতা স্বাধীনা। সারদা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে মনে মনে করিল— কেন, কুল ভাঙিলে ক্ষতি কি? ইংরাজী শিক্ষার প্রাচুর্ভাবে ইংরাজী ভাবাপন্ন সমাজে, কুলকর্ম্মত্যাগী ধর্ম্মত্যাগী নিত্য যবন পদলেহী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার সেই পুরাতন বল্লালী প্রথা কেন? বাপ হাকিমী করিতেছে, ছেলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে—তাহাদের আবার কুল গৌরবে কি অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে? আর নলিনীর সহিত বিবাহ দিলে কুলটাও একেবারে রসাতলে যাই-তেছে না; বড় জোর ভঙ্গ হইবে। কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পাঁচ ছয় পুরুষ লাগিবে। শ্যামসুন্দরের পর পাঁচ ছয় পুরুষ। ততদিনে ওলাউঠা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালী থাকিবে কি? সারদা কৃষ্ণধনের ভ্রম বুঝিল, তাহাকে মূর্খ পণ্ডিত স্থির করিল। আর শ্যামসুন্দর নলিনীর একত্র বন্ধনে একটী সোণার সংসারের ছবি দেখিতে দেখিতে পাড়ায় বেড়াইতে গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় নলিনী বাড়ীর সম্মুখস্থ ছোট একটী ফুলের বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ইচ্ছামত ফুল তুলিতে ছিল। সনাতন জিনিসপত্র আনিতে হাটে গিয়াছে। পাচিকার অসুখ হইয়াছে বলিয়া, মহামায়া রন্ধনের উদ্যোগে আছে। কাজেই বালিকা বাগানেই রহিল। বহুক্ষণ কেহ আর সন্ধান পাইল না।

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণধন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিতে ছিলেন। তাহাব সঙ্গের ভৃত্য কলিকাতা হইতে আনীত দ্রব্যাদি আনিবার ব্যবস্থায় দূরে পড়িয়াছিল। কৃষ্ণধন একাই বাড়ী আসিতে-ছিলেন। বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার ছোট বাগানটীতে একটী সোণার ফুল ফুটিয়াছে।

কৃষ্ণধন প্রথমে বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় দেখিতে দেখিতে শঙ্কায় পরিণত হইল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন, মহামায়া আবার বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে! বিভ্রাট—কেন না কৃষ্ণধন কলিকাতায় শ্যাম-সুন্দরের একটা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কবিয়াছেন। তিনি পাকা দেখিয়াছেন, আগামী কল্য ভাবী বৈবাহিক তাঁহাব গ্রামে আসিয়া পাকা দেখিয়া যাইবেন।

বালিকা আপন মনে ফুল তুলিতে ছিল, আর কৃষ্ণধন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন, আর মহামায়া কি কবিল, নিজেইবা তাড়াতাড়ি কি করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিতেছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন "সম্বন্ধ স্থির কবিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ মহামায়াকে সংবাদ দিলে ভাল হইত।"

সহসা বালিকার দৃষ্টি কৃষ্ণধনেব উপর পড়িল। অস্তগমনোম্মুখ অরুণ আভায় সুবর্ণ-রাগ-রঞ্জিত, অতসী-বর্ণা বালিকার মুখ-মণ্ডলশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের তারকাযুগল ভেদ করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকা কে-ত-কে আসিয়াছে ভাবিয়া, আবার ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা!"

নলিনী মুখ ফিবাইয়া ইঙ্গিতে কৃষ্ণধনের বাড়ী দেখাইয়া দিল। তার পর আবার ফুল তুলিতে বসিল। চঞ্চল পদে এদিক ওদিক চারিদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত আকাশ তলে, গোলাপ মল্লিকাদি পুষ্প শোভিত উদ্যানটীর সমস্ত শোভা নিজের ক্ষুদ্র অঙ্গটীতে পূরিয়া, সেই ক্ষুদ্র বালিকা কৃষ্ণধনের অন্তরের স্তরে স্তরে ইন্দ্রিয়ের অনুপভোগ্য এক অপূর্ব্ব আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল,

কৃষ্ণধন গলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, কি করিলাম! মহামায়া পুত্রের শুভাকাঙ্খিনী, যদি শ্যামসুন্দরের জন্যই এই কন্যা আনিয়া উপস্থিত করে, তা হইলে ত তাহাকে বলিবার কিছুই নাই। কৃষ্ণধন আবার প্রমাদ গণিলেন। আবাব বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এ বাড়ীতে তোমার কে আছে।"

বালিকা বলিল—"মা।"

কথাটা কৃষ্ণধনের পক্ষে হেঁয়ালিব মত ঠেকিল। আর কোন কথা না কহিয়া, তিনি বাড়ীতে চলিযা গেলেন।

বাটীতে প্রবেশ মাত্রেই মহামায়াব সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, কৃষ্ণধন দেখিলেন, মহামায়া কৃশা ও মলিনা হইয়াছে। কিন্তু কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে তাহার অবকাশ হইল না। আব মহামায়াকে শ্যামসুন্দবের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে দিতে তাহার সময় হইল না। কৃষ্ণধন একেবাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাহিরে যে কন্যাটীকে দেখিলাম, ওটী কে?" মহামায়া মৃদু হাসিল, আব বলিল—সাবদা আসিয়াছে, তাহাব কাছেই সমস্ত শুনিতে পাইবে; আমি বলিতে পারি না।"

কৃষ্ণধন আবাব বলিলেন—"বালিকার মুখে শুনিলাম, এ বাড়ীতে তাহাব মাও আসিয়াছে।" মহামায়া আবাব হাসিল, আর বলিল—"মা আইসে নাই। তাহার মা এই বাড়ীতে ববাববই বাস করিতেছে।

ক্রমে প্রহেলিকাব মীমাংসা হইল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন—"মহামায়া যে কৃষ্ণ ধনের স্ত্রী, মেয়েটা কেমন কবিযা জানিতে পারিয়াছিল। জানিয়া অন্তঃপুরস্থা মহামায়ার উদ্দেশে "মা মা" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহাদের গ্রামের চারি ধাবে ঘুবিত। শেষে পথ ভুলিয়া কেমন করিয়া মহামায়ার গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে কোন্ গৃহস্থ কন্যা আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারে?"

কৃষ্ণধন কতক কতক যেন বুঝিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—"মহামায়া। এমন সুন্দর বালিকা আমার চক্ষে ঠেকে নাই। তুমি যে ইহাকে পুত্র-বধূ করিবার জন্য গৃহে আনিয়াছ, আমাব মত

লইবার অপেক্ষা কর নাই, ইহাতে তোমাব কোনও দোষ দেখিতে পাই না; অধিকন্তু তোমার পছন্দের প্রশংসা করি। বলিতে কি মহামায়া! বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

সাগ্রহে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

কৃষ্ণধন বলিলেন—"আমি শ্যামসুন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছি। কাল তাহারা পাকা দেখিতে আসিবে।"

মহামায়ার মুখ আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু আর কোনও কথা না বলিয়া শুদ্ধ মাত্র স্বামীকে বিশ্রাম লইতে অনুবোধ করিল। কৃষ্ণধন উপবে গেলেন। মহামায়া আবার কৃষ্ণধনের আগমনে আহাবাদির নূতন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল। [ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কাল-যন্ত্র মাহাত্ম্য।

১

কে তুমিগো ধবাধামেআসিলে ছলিতে
সুধাই তোমাবে,
ছুটে ছুটে কেন বল,
বাতিদিন অবিবল,
খুঁজিছ অমূল্য নিধি বিশ্বেব মাঝারে
সেই তত্ত্ব তুমি বিনা কে বুঝিতে পাবে।

২

তুমি কি আমাব মত দুঃখী কোনজন
এ ধবনী' পবে,
তাই ঘুব অনিবাব,
লইয়া দুঃখের ভাব,
নিশিদিন একমনে প্রাযশ্চিত্ত তবে,
অবশ্য মিটিবে সাধ কিছুকাল পরে।

৩

আমাব(ও)জীবনে আর আনন্দ তুফান
উঠে না কখন,
শৈশবেব হাসি খেলা,
ঘুচেছে শৈশব বেলা,
কিশোব বযসে দেখি নীরদ ভীষণ,
আবরিল এক কালে তরুণ জীবন।

৪

আর কি উদিবে কভু শারদ চন্দ্রমা
হৃদয় গগনে,
আর কি জ্যোছনা রাশি,
ঢালিবে পীযুষ রাশি,
কেমনে বিকাশ পাবে মেঘ আবরণে,
এ মেঘ কি সরে কভু প্রচণ্ড পবনে?

৫

না না মিছেকেনতোরে পাগলেরপ্রায
নিজ দলে টানি,
দুঃখী নও তুমি সত্য,
লয়েছি তোমার তত্ত্ব,
সাধে কি ঘুরিছ তুমি দিবস যামিনী,
আছে গূঢ় হেতু তার আমি তাহা জানি

৬

কালের কুটিল তত্ত্ব শেখাতে মানবে
এসেছ হেথায়,
কালের কবাল কোলে,
কেমনে মানব খেলে,
কোথাবাতাহারআদিঅন্তবা কোথায়,
তুমিই রহস্যভেদ করিলে ধরায়।

৭

কিনামে ডাকিলে তোরে অন্তরেরভাব
সকল (ই) বুঝায়,
"ঘড়ী"টী যে ছোট কথা,
মরমে রহিল ব্যথা,
হৃদয়ের ভাষা কভু লেখা নাহি যায়,
বড়ই রহিল ব্যথা এ জীবনে হায়।

৮

ধীরে ধীরে দিবারাতি চলিছে তোমার
যুগল চরণ,
নাহিক ভাবনা কিছু,
কভু না হাঁটিছ পিছু,
অগ্রসর—এইমাত্র মন্ত্রের সাধন,
সদাই করিছ তুমি শরীর পতন।

৯

শান্তিময়ী সহিষ্ণুতা একাধারে তোমা'
সতত বিরাজে,
কভু ত হওনা শ্রান্ত,
ঘুরে ঘুরে দেহ অন্ত,
তথাপি শিথিলভাব আপনার কাজে,
কভু না লক্ষিত হয় ঘূরণের মাঝে।

১০

তোমার দৃষ্টান্ত সব দেখে মূঢ় নরে
দেখে ত শিখেনা,
নিজের কাজের বেলা,
সদা করে অবহেলা,
কভু ত উন্নত আশা হৃদয়েতে ধরেনা,
বৃথাকাজে সদাব্যস্ত আসলে ছলনা।

১১

তুমিত শেখাও নরে, চলেছে সময
নাহি তার সীমা,
অনন্তের তুমি ছায়া,
অনন্তে বিলীন কায়া,
এ নশ্বর ধরাধামে অনন্ত প্রতিমা,
সান্ত নরে কিবা জানে অনন্ত মহিমা!

১২

তুমি হে জগদ্বন্ধু, সাধিতে বিশ্বেরহিত
তোমার জীবনে,
যে দণ্ডে যে কাজ নরে,
করিতে বাসনা ধরে,
সে দণ্ড আসিলে তুমি জানাও তখন,
তোমাসম হেন বন্ধু আছে কোনজন?

১৩

তুমি হে যমের দূত হরিতে সবারে
হেথা আগমন,
প্রতিপলে কাঁটা সবে,
মানব জীবন হ'বে,
ক্রমশঃ নে'যাও তুমি শমন ভবন,
তোমাসম হেন শত্রু আছে কোনজন

১৪

রাখে ত পুরুষে জানি হৃদয় মন্দিরে
রমণী রতন,
এইমাত্র বিঘ্ন তায়,
নিরজন স্থান চায়,
সকলের মাঝে তায় হৃদয়ে ধারণ,
সরমের মাথা খেয়ে পারে কোনজন ?

১৫

এসব ভাবনা কভু উঠে না হৃদয়ে
ধরিতে তোমারে,
ধরিলে তোমারে বুকে,
নাহি লাজ ছোট মুখে,
সরম না পায় স্থান সবার মাঝারে,
তোমার বদনখানি সতত নেহারে।

১৬

ধন্য এই ধরাধামে ওহে ক্ষুদ্র জীব
তোমার জীবন,
এইরূপ চিরকাল,
দেখাও অনন্তকাল,
এই বেলা কর সবে কার্য্য সমাপন,
কিছু নাহি বাকিরয় আসিলে শমন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

জীবনের নাট্যাভিনয়।

ভাই নব্যযুবক! নগরের নাট্যশালায় নিত্য নূতন পয়সা খরচ করিয়া কত নব্য, নূতন নাটকের নাট্যাভিনয় দেখিয়াছ ও দেখিতেছ—দেখিয়া ভাবের বিভ্রমে কখন কখনও হাঁসিয়াছ, কখনও কাঁদিয়াছ, কত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের পশরা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিয়াছ, কত সং ঢং ও রং তামাসা দেখিয়া হদ্দ মজা পাইয়াছ, আবার কত বিয়োগান্ত নাটকের বিয়োগ বিধুরা বালার বিরহ, বিচ্ছেদ বিলাপ পরিতাপের অভিনয়ে নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছ, আর অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের অভাবনীয় ভাব বৈচিত্রে অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ।

কিন্তু গৃহে গৃহে আমাদের জীবন নাটকের যে নিত্য নূতন

অভিনয় হইতেছে, তাহা কি কখনও দেখিয়াছ'?, এই বিশাল বিশ্বের বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতির অত্যদ্ভুত পট-পরিবর্ত্তনে আমাদের জীবন নাটকের যে জীবন্ত অভিনয় হইতেছে, তাহা কি কখনও সন্দর্শন করিয়াছ? এ অভিনয়ে যে হাঁসি কান্না, হর্ষ বিষাদ, ও সুখ দুঃখের বিচিত্র সমাবেশ আছে, তাহা দেখিয়া কখন কি কাঁদিয়াছ, হাঁসিয়াছ? সংসারের এ অভিনয়ের নিত্য নূতন অভিনব অঙ্কে রং তামাসা সকলই বর্ত্তমান। যদি এই নবজগতের মরম বেদনায় স্বীয় মর্ম্মগ্রন্থী শীথিল করিবার বাঞ্ছা থাকে, যদি বিশ্ব প্রেমিকের প্রেম প্রবাহে হৃদয় পবিত্র করিবার সাধ থাকে, যদি অসার সংসারের সার বস্তুর রসাস্বাদ করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি পরাৎপরের পবিত্র প্রেমের সুধা আস্বাদনে অগ্রসর হইতে চাও, তাহা হইলে এই প্রকৃতির পট পরিবর্ত্তনে মানব জীবনের যে অভিনয় অহরহ হইতেছে, তাহা একবার প্রাণ ভরিয়া সন্দর্শন কর।

ঐ দেখ, হীরক খচিত সুনীল চন্দ্রাতপের নিম্নে বিশাল বিশ্ব মঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে, আর ওই প্রদীপ্ত দীপশিখা নীল চন্দ্রাতপে লীন থাকিয়া উজ্জল আলোকে রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিতেছে, ঐ আলোকে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রাতপের চন্দ্র সদৃশ হীরক খণ্ড সমূহ কেমন ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে! আর ওই যে প্রকৃতি দৃশ্য পট কত নদ নদী সরিৎ-সাগর বন উপবন প্রান্তর পুলিন বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবুক দর্শকের দর্শনে-ন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, নিম্নে দেখ কলকণ্ঠে কুজনকারী বিহঙ্গকুল সুমধুর সুরতান লয়ে তান ধরিয়া ঐক্যতান বাদ্যে উৎসুক দর্শকবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছে।

কালের আবর্ত্তনে একটীর পর একটী করিয়া প্রকৃতির দৃশ্য পট উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আর এই ব্যবধান সময়ের মধ্যে মানব জীবনের এক একটী অঙ্কের অভিনয় হইয়া যাইতেছে! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এই জীবন নাটকের অভিনয়ে কত "তাজ্জব ব্যাপার" কত "পঞ্চরং" কত "আনন্দ রহো" কত "নিরানন্দ রহো" আর কত রকম "বিভ্রাট" দেখিয়া তোমার চিত্ত বিভ্রম জন্মিবে, তখন বুঝিতে

পারিবে, ইহাতে কত "হৃদ্দ মজা" কত প্রফুল্লতা, কত ডিগ্রী "ডিশ্‌মিস্‌" আর বং বেরঙ্গের প্রহসন নিহীত আছে।

অভিনয় দর্শন করিবাব পূর্ব্বে নাটক খানির কিঞ্চিৎ পবিচয় আবশ্যক, অন্যথা অভিনব দশনের আমোদ সম্যক অনুভূত হয় না।

আমাদেব "জীবন নাটক" খানি প্রধানতঃ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, তবে প্রত্যেক অঙ্কেই অবশ্য কতিপয গর্ভাঙ্ক আছে। নাটক খানিব প্রারম্ভে আশা, উৎসাহ, উদ্যমেব সম্যক আবেগ আছে; মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম, বিভিন্ন ভাবেব সমাবেশ ও অনেক রকম প্রহসনের প্রবাহ আছে, কিন্তু শেষে নাটক খানি বিয়োগান্ত নাটকেই "Tragedy" পর্য্যবসিত হয়। ইহাব শেষাঙ্ক বড়ই Pathetic.

আমাদের জীবন নাটকেব অভিনযে প্রোগ্রাম, হ্যাণ্ডবিল্ প্রভৃতির ও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, আর সেই হ্যাণ্ডবিলে নাট্যকাবের নাম ধাম সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত আছে। কাল সকাল, সন্ধ্যায়, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, পুলিনে এমন কি গৃহে গৃহে সেই সুন্দর সজ্জিত প্রোগ্রাম সকলের চক্ষেব সাম্‌নে ধরিযা দিতেছে, কিন্তু হায় আমরা তাহা পড়িতে পারি না—আমবা সে অক্ষব চিনি না—আমবা সেই মহান্ নাট্যকারেব প্রতি-বিম্ব প্রোগ্রামের গাত্রে, হ্যাণ্ডবিলের প্রত্যেক ছত্রে অঙ্কিত দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না।

ওই দেখ, প্রথম দৃশ্য পট উথিত হইয়াছে; দেখ দেখি, স্নেহময়ী, স্বর্গীয় সরলতার আদর্শরূপিনী ওই মোহিনী মূর্ত্তিব অঙ্কে কেমন সুন্দব স্নেহেব পুত্তলী আপন আমোদে আপনি বিভোব হইয়া ক্ষুদ্র হস্ত পদ সঞ্চালনে কেমন ক্রীড়া করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরমেশ প্রেম প্রকাশক পবম পীযুষ পান করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে; আহা কি স্বর্গীয় ভাব। স্বার্থত্যাগে কি সুন্দর দৃশ্য, স্নেহের কি সুন্দর বিকাশ, স্বভাবের কিসুন্দব সৃষ্টি! জননী ওই স্নেহের পুত্তলীকে, দেখ কত সযতনে লালন পালন কবিতেছেন, কত আদরে কত সোহাকে তাহাব সান্ত্বনা বিধান করিতেছেন। এই স্বাভাবিক দৃশ্য কি মনোহর নয়?

এই শৈশবাভিনয়ই—আমাদের জীবন নাটকের প্রথম অঙ্ক। ইহার কয়েকটী গর্ভাঙ্কে ওই শিশু ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ধাবন কুর্দ্দন, অনুকরণাদি নানা বিষয়ের অভিনয় করিতে তাহার বাল্য জীবনের অবসান করিতেছে—

এই বার দ্বিতীয় দৃশ্য। ঈষৎ শ্মশ্রু রাজি সমন্বিত নব্যযুবক, সুন্দর সজ্জিত হইয়া সতেজে, সোৎসাহে রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন, আর নবীন উৎসাহে আশার কুহকিনী শক্তিতে সকল দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কখন এক দিকে, কখনও অন্য দিকে গমন করিতেছেন। উদ্যম আছে অথচ যেন অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ আছে অথচ যেন লক্ষ্য স্থির নাই, মনের বল আছে অথচ যেন মনস্থের স্থিরতা নাই; প্রাণের পিপাসা আছে অথচ যেন মিটাইবার স্থান নাই। এই অঙ্কের অভিনয় জীবন নাটকের কঠিনাংশ; এই সময়ের চাঞ্চল্য, এই সময়ের আবেশ, এই সময়ের ভাব বেশ বজায় রাখিয়া দর্শকের আশানুরূপ অভিনয় করা বড়ই কঠিন। ওই দেখ রিপুকুল প্রবল প্রতাপে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, যেন বীর বালক অভিমন্যু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইলেন। যুবককে তুমি এই অঙ্কে ও ইহার অন্তর্গত কয়েকটী গর্ভাঙ্কে অধিকাংশ সময়েই ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে দেখিতে পাইবে।

আবার দেখ এই অঙ্কের একটী গর্ভাঙ্কে ওই যুবক নায়ক, নায়িকার সহিত মিলিত হইল, দুইটী প্রাণ যেন মিলিয়া একটী হইয়া গেল, উভয়ের বলে উভয়ে বলীয়ান্ হইয়া আবার নূতন উৎসাহে জীবনের আহবে ঝাঁপ দিল। যুবক, ওই দেখ, কখনও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে-ছেন, কখনও পদস্খলিত হইতেছেন, আবার পুনরায় উঠিয়া বিপুল বিক্রমে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতেছেন। এ দৃশ্য কি ভীষণ, এ অভিনয় কি তেজোপূর্ণ, তোমার যদি Capital বা Excellent বলিয়া হাঁক মারিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই সময়েই সে সাধ পূরণ কর, আর করতালি প্রদানই যদি অভিনয়ের ঔৎকর্ষ জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে এ সময়েই একবার সজোরে শব্দ করিয়া লও, কারণ এই অঙ্কে ও ইহার গর্ভাঙ্ক প্রেম পিরীতের ছড়াছড়ি, নয়নবাণের হানাহানি

বিরহ বিচ্ছেদের কাঁদাকাঁদি এবং আদান প্রদানের বাড়াবাড়ি হুড়াহুড়ি সমস্তই আছে—আবার যুদ্ধক্ষেত্র, ভীষণ সংগ্রাম, "হাহতোস্মি" উত্থান পতন, লম্ফন, ঝম্পন—তাহাও আছে।

দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় দৃশ্য অদৃশ্য হইল, ভবিষ্যের যবনিকা উত্তোলিত হইয়া জীবন নাটকের তৃতীয় দৃশ্য তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইহাতেও সেই দম্পতি নায়ক নায়িকা; তবে নায়ক নায়িকার চলনে বলনে, গমনে উপবেশনে পূর্ব্ব ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আর যেন সে তেজ, সে উৎসাহ, সে উদ্যম নাই; বিষাদ কালিমায় মুখশ্রী শ্রীভ্রষ্ট, গভীর চিন্তায় কপোল কুঞ্চিত, আর সর্ব্বাবয়বে যেন কি মরম বেদনার মর্ম্মান্তিক ভাব মাখান রহিয়াছে। এখন বিষম বিষাদ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দম্পতি দারুণ কষ্টে অগ্রসর হইতেছেন, স্কন্ধে কতকগুলি শিশু সন্তান,—তথাপি কিন্তু পশ্চাদপদ নহেন, পদে-পদে অরাতি নিধন সাধন করিতে করিতে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। কখনও অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল উপবেশন করিতেছেন; আবার সুকুমারগণের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার যেন নূতন বলে বলীয়ান হইতেছেন। এ দৃশ্যে নায়কের নিত্য নূতন সাজ সজ্জা সরঞ্জাম; অবস্থানুসারে তাঁহাকে কত রকম সাজ পোষাক, চলন, বলন, ও অঙ্গ ভঙ্গিমার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। ইহার অভিনয়ে, ওই দেখ, কখনও পাষাণ গলিতেছে, আবার কখনও হাসির ফোয়ারা ফুটিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে এ দৃশ্যপট দৃষ্টির অতীত হইল, আবার নূতন অঙ্কের অভিনয়। ওই দেখ পলিতকায়, শুভ্র কেশ বৃদ্ধ সুখশয়নে শায়িত হইয়া সহাস্য বদনে সমাগত জনগণের সহিত কত গল্প গুজব ও মুহুর্মুহু ধুম পান করিতেছেন—রণক্লান্ত মহাবীর ভীষ্ম যেন শরশয্যায় শয়ন করিয়া সমাগত আত্মীয়বর্গকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে মহিমার্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বর্ণনাতীত সুখের আস্বাদ লাভ করিতেছেন। এ দৃশ্যে নায়কের সে কৌশল, সে কার্য্য পটুতা, সে উদ্যম উৎসাহ, সে রঙ্গ ভঙ্গ কিছুই নাই, আছে কেবল—সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার

সার গর্ভ উপদেশ—আর আছে—বিশুদ্ধ মৈত্রী প্রেম, বিমল আনন্দ; আর বিগত বিষয়ের অনুতাপ। ফল কথা এ দৃশ্যের অভিনয়ে দর্শনীয় অপেক্ষা শিক্ষনীয় বিষয়ই অধিক। অতএব তুমি মনোযোগের সহিত সেই মনোহর মধুর অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ কর।

অধৈর্য্য হইওনা, এই বার জীবন নাটকের শেষাঙ্ক অভিনীত হইবে। কিন্তু অহো। সে দৃশ্য—সে শোকাভিনয় আর দেখিয়া কাজ নাই; শেষ না দেখিলে—তোমার অভিনয় দর্শন অপূর্ণ থাকিবে। অতএব আর একটু অপেক্ষা করিয়া "জীবনের চরম অবস্থা" আমাদের "শেষের সে দিন" দর্শন কর।

যে স্নেহের পুত্তলীকে সযত্নে মাতৃ অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াছিলে, যে সুন্দর সুপুরুষ যুবাপুরুষকে সংসারের ভীষণ সংগ্রামে উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছিলে, যে শান্ত দান্ত গম্ভীর প্রৌঢ়কে সোণার সংসারের মধ্যে সুখ শয়নে শায়িত দেখিয়াছিলে, আজ সেই দেহ, জীর্ণ শীর্ণ ধুলব-লুণ্ঠিত;—সংসারের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। সাজান বাগান পড়িয়া রহিল, পুত্র কলত্র নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল, আর প্রাণ পাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়াগেল, ওই দেখ মৃত দেহ মহাশ্মশানে আনীত হইল, চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—আর ক্ষণেকের মধ্যে এই ক্ষণ ভঙ্গুর দেহের অবসান হইল—সব ফুরাইল—পঞ্চভূতের বিচিত্র ব্যাপারে অনন্ত কাল সাগরে যে জলবিম্বটী উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কিয়ৎক্ষণ পরে কাল সাগরেই লীন হইল—যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি; যেমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল, আবার তেমনি করিয়া মিশিয়া গেল।

চিতাগ্নি নিবিল—পাঁচে পঞ্চ মিশাইল, আত্মীয় স্বজন, শেষের সম্বল সেই "হরিনাম" উচ্চারণ করিয়া গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইল, আমাদের জীবননাটকের অভিনয়ও শেষ হইল।

এই অভিনয় সম্বন্ধে একটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই তোমাকে বাটী যাইতে দিব, কারণ রাত্রি অনেক হওয়ায় বোধ হয়, তুমি অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াছ। অবস্থা ভেদে এই জীবন নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, তোমাকে যাহা দেখাইলাম, প্রত্যেক অভিনয়েই যে ঠিক এইরূপ হয়

তাহা মনে করিও না। তবে যাহা সচরাচর অভিনীত হয়, তাহাই অগু তোমাকে দেখাইলাম।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—যৎ।

কথা—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। সুর—শ্রীরামতারণ সান্ন্যাল।

ছাড়ি যদি দাগা বাজী কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।
আমি কি পারবো বাবা দেখি বেয়ে পারি হারি॥
যদি কেউ বাৎলে দিতো, এমন লোক দেখলে হতো,
দাগাবাজীর উপর বাজী খেলা বড় বিষম ভারি॥

আস্থায়ী।

অন্তরা।

শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন।

বীণাপাণি।
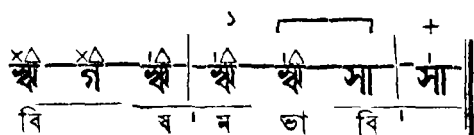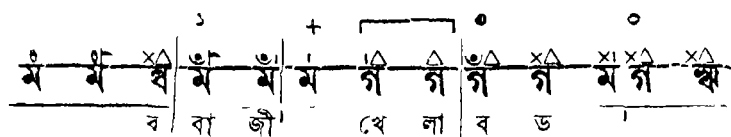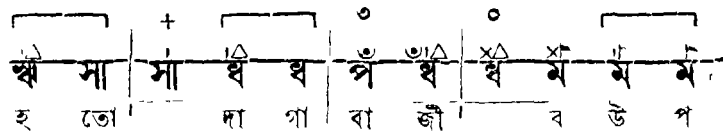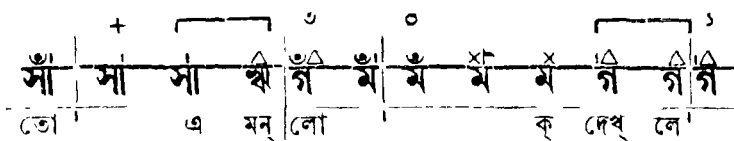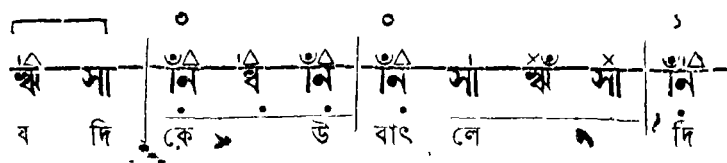
মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } কার্ত্তিক, ১৩০৪ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

৺ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ আমরা অতিশয় শোচনীয় সংবাদ বক্ষে করিয়া আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ সমীপে উপস্থিত হইলাম। আমাদেব কার্য্যাধ্যক্ষ বন্ধুবর যোগেন্দ্রনাথ আব ইহ জগতে নাই—বিগত ৭ই কার্ত্তিক তারিখে আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মাযা পরিত্যাগ করিয়া, পাপ, তাপ প্রপীড়িত এই ধবাধাম হইতে তিনি চিরশান্তি নিকেতনে প্রস্থান করিযাছেন। তাঁহার আত্মীয-স্বজন ও আমবা তাঁহার হতভাগ্য বন্ধুগণ শোক করিবার জন্য এখানে পডিযা রহিয়াছি।

বন্ধুবর যোগেন্দ্র, বাল্যকাল হইতেই অতি ধীর, পরোপকাবী, নম্র প্রকৃতি ও মিষ্ট-ভাষী লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে, তিনিই তাঁহার এই সুন্দর স্বভাবের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

বন্ধুবর ১২৭৬ সালে মাঘ মাসে জেলা বাঁকুড়াব অন্তর্গত অবন্তিকা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে পাঠে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তিনি বর্ত্তমান সময়ে বি-এ, পড়িতে ছিলেন। অতি

বাল্যকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই অবধি তিনি তাঁহার উদার-চেতা পিতা কাশীবল্লভের রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হইয়া আসেন। যোগেন্দ্রের বয়স যখন ১০ কি ১১ বৎসর, তখন তাহার পিতা, একমাত্র সন্তান যোগেন্দ্রের সংসার-সৃষ্টি রক্ষার জন্য অগত্যা দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহে বাধ্য হন। ১২৯৯ সালে ৬ই আষাঢ়, যোগেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্র তখন এফ-এ, পড়িতেছেন। [illegible] অল্প বয়সে [illegible]কে সংসারের [illegible]ভার পড়ে। [illegible]জীবিত অবস্থায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে যোগেন্দ্রের বিবাহ হয়; বিমাতা ও স্ত্রীকে লইয়া যোগেন্দ্রকে অর্থাভাবে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। কারণ, যোগেন্দ্রের পিতা যোগেন্দ্রকে প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান, হৃদয়বল্লভ নামে যোগেন্দ্রের এক খুড়া আছেন, যোগেন্দ্র তাহারই উপর তাহার বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া কলিকাতায় পাঠদ্দশায় কালযাপন করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বৎসরে (১৩০০, শ্রাবণ) যোগেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের অভিমতে ১৩০১ সালের ১২ই বৈশাখে পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। ইহার পর বৎসর (১৩০২, জ্যৈষ্ঠ) যোগেন্দ্রের বিমাতা, জেলা বালেশ্বরের অধীন বালুহস্তা নামক স্থানে স্বর্গলাভ করেন। এখন আর যোগেন্দ্রকে আপনার বলিবার কেহ রহিল না।

এইরূপে ২।১ বৎসর কাটিয়া গেল, একদা যোগেন্দ্র শুনিলেন, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির উপর দেনা হইয়াছে; ইহার কারণ কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। পরে খুড়ার হস্তে বিষয়-সম্পত্তির ভার রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। এই কারণে তাহার পিতৃব্যের সহিত নানাপ্রকার গোলযোগ হইতে লাগিল। গত গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশ এই গোলমালে অতি-বাহিত হইয়া যায়। পরে শ্রীশ্রী৺কালীপূজার বাজার করিয়া যখন তিনি কলিকাতা হইতে স্বীয় বর্ত্তমান বাসস্থান জেলা বাঁকুড়ার অধীন রাম্সাগর যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে নকবডাঙ্গা নামক স্থানে বোধ হয়, কোনও অনৈসর্গিক কারণে তাঁহার মৃত্যু সংঘটীত হয়। পুলিশ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষ কাহাকেও না দেখাইয়া লাস ফেলিয়া দেয়। নানা কারণে লোক নানাপ্রকার সন্দেহ করিতেছেন; তদন্ত এখনও চলিতেছে। আমরা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণও বোধ হয়, এ সংবাদে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এখন আমাদের ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা—যেন তাহার ইহজগতে পবিত্র জীবন, পর-জগতেও পবিত্রতা লাভ করে। তাহার যুবতী স্ত্রী শোক করিতে এই নশ্বর জগতে রহিল, পরমেশ্বর হতভাগিনীর মতিগতি স্থিরতর রাখিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।

ঈশ্বরোপাসনা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অহংগ্রহরূপে ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী যে-সে হইতে পারে না। যিনি যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করতঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্যতিরিক্ত নিখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি বর্ত্তমান জন্মে ও পূর্ব্ব জন্মাদিতে কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা দ্বারা উন্নিত হইয়াছেন; যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন এবং যিনি আচারাদি লঙ্ঘন করেন না, বেদান্তে তাহাকেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানকে ইহারা উপাসনার চরম ফল বলিয়াছেন, ইহারা বলেন,—"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভব।" "জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং অচিরে ণাধিগচ্ছতি। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" "নান্যপন্থা বিদ্যতে" ইত্যাদি প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিকেই অদ্বৈতবাদিগণ পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা প্রোক্তরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান উদ্বোধিত হইতে দেখা যাইতেছে; এবং অন্যান্য শ্রুতি ও তাহার অনুবর্তন করিয়াছে। "ন প্রতীকে ন হি সঃ" সূত্রে ও তাহার অর্থই সমর্থন করিতেছে। আচার্য্যাদির মত এই যে, উক্তরূপ উপাসনা দ্বারা "তত্ত্বমসি" রূপ অপরোক্ষানুভূতিই পরমপুরুষার্থসাধন। অহংজ্ঞান ব্রহ্মবগ্রাহী হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা গুণাতীত, নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন, একরূপ আনন্দ ও চৈতন্য স্বরূপ। ইহাতে জড়ত্বের লেশমাত্রও নাই। এ তত্ত্বের পর আর জ্ঞাতব্য তত্ত্ব নাই; বিদেহকৈবল্যই মানব সাধনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

প্রতীকোপাসকদিগের মধ্যেও নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন,—উপাসনা পাঁচ প্রকার; যথা (১) অভিগমন বা ভগবন্মন্দিরাদি মার্জ্জন, (২) উপাদান বা গন্ধপুষ্প ধূপদীপাদি দান, (৩) ইজ্যা বা পূজা, (৪) স্বাধ্যায় বা মন্ত্রজপ, স্তোত্র পাঠ ও ভাগবৎ শাস্ত্রের অভ্যাস, এবং (৫) যোগ বা একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান। ইহারা বলেন,—এই পাঁচ প্রকার উপাসনা দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে মানব আবৃত্তিরূপ আনন্দময় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। ইহারা আরও বলেন,—অহংগ্রহোপাসনার তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অনুপযোগী। ইহাদের মতে ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির অনন্যোপায়। কিন্তু তিনি একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—বৈরাগ্য ব্যতীত পরাভক্তিশ্চারণের কোনও সম্ভাবনা নাই। ভাগবদ্ধর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধীয় ভক্তিশাস্ত্র এবম্বিধ মতাবলম্বনেই উদ্ভব হইয়াছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং॥" ভাগবৎ ধর্ম্মের অন্তর্গত ভক্তির নয়টী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামানুজ ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির সময় হইতেই জগতে ভক্তি শাস্ত্রের সমধিক মহিমা প্রচার হইয়াছে। কি বেদে, কি উপনিষদে, কিম্বা দর্শনশাস্ত্রের কোথাও শ্রদ্ধা, কি একনিষ্ঠা শব্দ ভিন্ন 'ভক্তি' কথাটির পর্য্যন্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক সময়

হইতেই ভক্তি পথাবলম্বনে উপাসনার সূত্রপাত হইয়া দ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানুজ, মাধবাচার্য্য, নিম্বাদিত্য ও বল্লভাচার্য্যের সময়ে ইহার পূর্ণতালাভ হইয়াছিল। নারদীয় ভক্তিসূত্র, সাণ্ডিল্যসূত্র, নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি অতুলনীয় গ্রন্থ ভক্তি-উপবনের ফুটন্ত কুসুমরূপে অদ্যাপিও জগতের প্রীতিপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। প্রতীক-রূপ তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে উপাসনার বেগবতী মন্দাকিনী নানা-পথে প্রবাহিত হইয়া, মুখ্য ভক্তিরূপ শত শত মুখে যেন সেই এক অদ্বৈত মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্যই নিরতিশয় যত্নবতী হইয়াছে। ফলত, অধিকারীভেদে মুখ্যভক্তি পথও যে উপাসনার অন্য শ্রেষ্ঠতর আলম্বন, সে বিষয়ে অস্মদাদির কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধক প্রবর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—যেমন মই, বাঁস, দড়ি বা অন্য কোন আলম্বনে এক ছাঁদে সকলেই উঠিতে পারগ হয়, সেরূপ সমরস অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছিতে সংস্কার ও শিক্ষানুরূপ প্রতীক অবলম্বন করিলেই হয়। দেশ কাল ও পাত্রানুসারে প্রতীক উপা-সকদিগের আলম্বন পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। যোগশাস্ত্রেও "পূর্ব্ব পূর্ব্বভূমিং জিত্বা উত্তরোত্তর ভূমিমভ্যাৎ" ইত্যাদি উপদেশ দৃষ্ট হয়।

আপাততঃ বিষম-বৈষম্য ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও সাম্য-বিদ্যুন্মেষণ সময় সময় আমাদিগকে উৎসাহিত করে। সে সাম্যভাব প্রদর্শন করিতে জগতের নানাস্থানে সময়োপযোগী বিভিন্ন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকল্প বা ঈশ্বরবতার বলিয়া কথিত হন। অধিকাংশ স্থলেই উক্তরূপ বৈষম্য-সাম্যকারী মহাপুরুষগণ উপাসনার প্রতীকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। কৃষ্ণ, রাম, শিব, চৈতন্য, বুদ্ধ, ঈশা ও মুসা যে প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তাহাদের সমধিক বিভূতি-বিকাশমানতা ও সাম্যকরণীয়তাই তাহার কারণ। সময়ের গতি পর্য্যালোচক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতীকাবলম্বনের উপযোগীতা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। অনেকে মনে করিল, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা

অধঃপতিত হইয়া উপাসনার নিম্নাধিকারী হইয়া পড়িয়াছি। এ কথার মূলভিত্তি কি? জানি না। আমাদের সমাজ গঠন, ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যাবত্তা ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই সকল পরিবর্ত্তনই সময় নামক কল্পিত আদর্শে অধ্যস্ত করিয়া আমরা সময়ের পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করিতেছি। ভাবিয়া দেখুন, সময় আপনারই কল্পনা বই অন্য কিছুই নহে। তাই বলিতে-ছিলাম, সময়ে কিছুই পরিবর্ত্তন হইতেছে না। আমরাই অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং অনতিক্রমণীয় পরিবর্ত্তনরূপ অবস্থা অতিক্রমণ করিয়া ক্রমশই অবশ্য-লভ্য একতত্ত্বে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি-তেছি। সুতরাং আমরা সকলেই নিম্নাধিকারী, কি সকলেই মধ্যমাধিকারী, কিম্বা সকলেই উচ্চাধিকারী, এরূপ কল্পনা ভ্রান্তি কল্পিত উন্মাদের প্রলাপ বই আর কিছুই বলা যায় না। সকলের একাধিকারিত্বে অবস্থাপিত হওয়া অনৈসর্গিক। সকলে একাবস্থায় থাকিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় যে, মানব সমাজের পরিবর্ত্তনরূপ স্রোতের অব্যাহতগতিকে যখন অধি-কাংশ মানবই (Majority) একরূপ দৈন্যাবস্থাপন্ন হয়, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া তখনই অলক্ষিতে কোন এক মহাপুরুষ বা অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন, এবং তিনি সে সময়ে সর্ব্বত্র প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়া পূজিত হন।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে তাদৃশ জীবন্ত প্রতীকের কোন কালেও বৈরল্য দৃষ্ট হয় নাই। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেবের অপ্রকট হওয়ার পর, অস্মদ্দেশে যখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত বিকৃত অবস্থা হইয়া পড়িল, যখন পাশ্চাত্য জড়বাদ চৈতন্য সত্ত্ব ভারতের রুদ্ধকক্ষে দস্যুরমত অন্যূন সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ পর্য্যন্ত ভীষণ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, ভারতের এ হেন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার কামকাঞ্চনাসক্ত জগতের ঘোর দুর্দ্দশা ত্রিযামার সুপ্রভাত সূচনা করিবার জন্য, পুণ্যক্ষণে শ্রীকামারের পুকুরে আবার সেই পুরুষোত্তমাদি ৮ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া

পুনরুদিত হইলেন। অধিকারীভেদে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে তিনি উপাসনার উপযোগী যে যে পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন জগতে তাহাই একমাত্র কল্যাণকর ও অবলম্বনীয় বলিয়া আমাব দৃঢ় বিশ্বাস। লিপিবদ্ধ ব্যতীত উপাসনা বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদীয় শ্রীমুখবাণী আমার শ্রুতি-গোচর হয় নাই। সুতরাং তদ্ব্যতীত উপাসনা প্রণালী তাঁহার পদাশ্রিত ভক্তগণের নিকটই আমাদের সম্যক্ শিক্ষাব বিষয় হই-য়াছে। যদি তিনি সমগ্র জগতে সর্ব্ব ধর্ম্মেব সমন্বয় করিয়া পূর্ণতা স্থাপন করিতেই আসিয়াছিলেন, যদি নিরক্ষর হইযাও বেদান্ত সিদ্ধান্ত গভীর তত্ত্বগুলি কবামলকবৎ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রত্যক্ষ দৃশ্য পদার্থের ন্যায সরল কথায় বুঝাইয়া দিয়া গিযা থাকেন, এবং যদি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষবে অক্ষবে পূর্ণতা লাভ কবিয়া থাকে, তবে আমরা যে যেরূপ কেন অধিকাবী হই না, তাহাবই সর্ব্বোচ্চাদর্শ শ্রীবামকৃষ্ণ চবণাশ্রিত কোন না কোন ভক্তগণে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। যদি অস্মদাদিব ন্যায অধিকাবীব প্রতীকা-বলম্বনে উপাসনাব প্রয়োজনীযতা থাকে, তবে আব বৃথা কালক্ষেপ না কবিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কাবানুরূপ যে কোন ভাবাবলম্বনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবেব সাম্যাতিসাম্যমূর্ত্তিব ধ্যানাবলম্বন, তাঁহার অদ্ভুত লীলাখ্যান শ্রবণ এবং তদগত প্রাণ হইয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ, এ সময়ে জনসাধারণেব পবমপুরুষার্থ লাভের অনন্ত সাধন বলিয়া আমার অবিচলিত ধারণা হইযাছে। অলমিতি বিস্তবেণ।

শ্রীশবচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?
সুমেরু সমান আশ, নৈরাশ্যের দীর্ঘ শ্বাস,
অভাব—ভাবনা সদা নয়নের জল;
নত আঁখি নত মুখ, বিষাদের হাসি টুক,
মলিন অধর প্রান্তে বিরাজে কেবল।
হিংসার সংসারে হায়, কেহ নাহি ফিরে চায়,
দরিদ্র নিন্দার ভাগী প্রশংসা বিরল;
হেরিলে বিপন্ন জন, কেবল ব্যাকুল মন,
শুধু অশ্রুজল ভিন্ন নাহি অন্য বল।
কাতরে আকুল মনে, যাপে কাল নিরজনে,
লুকায়ে ভাবনা ভাবে যাতনা কেবল;
দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?
সুত সুতা যদি হায়, বিলাস সামগ্রী চায়,
তাহে বুক ফাটে প্রাণ ব্যথায় বিকল।
লজ্জা, ক্ষুধা নিবারণে, দুর্ব্বল জীবন পণে,
সাঁতারে সংসার সিন্ধু বিষাদে বিহ্বল;
দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন গুপ্ত।

মহামায়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

(১৪)

সারদা প্রতিবেশিনীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, কৃষ্ণধন আসিয়াছে। সে অমনি তাঁহাকে একটী গড় করিয়া আসিল। বেশী কোন কথা না কহিয়া, শুদ্ধমাত্র শ্যামসুন্দরের কুশল সংবাদ লইয়াই কার্য্যব্যাপদেশে আবার নীচে নামিয়া গেল।

কৃষ্ণধনও তাঁহাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তখন নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

একটু অধিক রাত্রে কৃষ্ণধন আহারে বসিলেন। সারদা তাহাকে বাতাস করিবার জন্য একখান পাখা লইয়া তাঁহার কাছে বসিল। আর কৃষ্ণধনের সঙ্গে কিরূপ ভাবে কথা কহিবে, তাহার একটা ধাঁজ মনে মনে গড়িতে লাগিল। সে মহামায়ার কাছে আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিল।

সারদা পাছে কন্যার কথা পাড়িয়া একটা আব্দার তুলিয়া বসে, এই ভাবিয়া কৃষ্ণধনও মনে মনে সারদাব মুখ বন্ধ করিবাব উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। কোন মতে রাত্রি প্রভাত দেখি-লেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। পবদিন শ্যামসুন্দর ও তাহার ভাবী-শ্বশুর আসিয়া পড়িলেই, সাবদা নূতন মেয়েটীর জন্য আর তাহাকে বড় একটা জেদ কবিতে পারিবে না, এটা তাহার বিশ্বাস ছিল।

কৃষ্ণধন রমাপ্রসাদের ও তাহার মাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিলেন। সাবদা সংক্ষেপে উত্তর দিল। রমাপ্রসাদ আজিও আসিতে পারিল না বলিয়া, কৃষ্ণধন দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা মাতাকে গৃহে ফেলিয়া বিদেশে চাকরী করিতে পড়িযা থাকা রমাপ্রসাদের মত সন্তানের তিনি উপযুক্ত কার্য্য বিবেচনা করি-লেন না। স্বাধীনভাবে যে জীবিকা অর্জন করিতে শিখিয়াছে, সে কেন পরেব অনুগ্রহ ভিখারী হইবার জন্য লালায়িত—স্বাধীন ভাবে যে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া, যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম,—বাড়ীঘব, আত্মীবস্বজন, প্রতিবেশীমণ্ডলী সকলকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে তার কেন প্রবৃত্তি হইতেছে না? দুই একদিন ছুটিব জন্য আজিও পর্য্যন্ত কেন যে সে হাঁ করিয়া সাহেবের মুখ চাহিয়া বসিযা থাকে? কৃষ্ণধন কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। রমাপ্রসাদের কথা হইতে চাকরীর কথা হইল—চাকরীর দোষগ্রাম ষড়জ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমে উঠিল; বড় বড় বাক্য যোজনায়, বড় বড়

পদবিন্যাসে, চাকচিক্যময় অলঙ্কার প্রয়োগে, স্বাধীন জীবনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিয়া দেওয়া হইল! শ্যামসুন্দরকে যাহাতে আর চাকরী করিয়া না খাইতে হয়, তাহারও একটা বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, এটাও সারদাসুন্দরীকে শুনান হইল। সারদা শুধু শুনিতে লাগিল, উত্তর করিল না। এ-কথা হইতে ও-কথা—এইরূপ কথার পর কথায় কৃষ্ণধন বহুক্ষণ সারদাকে চুপ করাইয়া রাখিলেন। তিনি বাক্যচ্ছলে সারদাকে এমন আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সারদা কন্যাটীর কথা তাঁহার কাছে কাল পাড়িবেই স্থির করিল, আজ আর কথা কহিবার বাগ দেখিল না। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণধন নিজেই বিপদ ডাকিয়া উপস্থিত করিলেন।

ব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণধনের মুখে আজ বড়ই সুস্বাদু বোধ হইল। কৃষ্ণধন বলিলেন,—"রাঁধুনী কি সাতদিনের মধ্যেই হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সে এমন রান্না কেমন করিয়া রাঁধিল?"

সারদা বলিল,—"রাঁধুনীর জ্বর হইয়াছে। সে বাড়ী গিয়াছে।"

কৃষ্ণধন। এ ত মহামায়ার রান্না নয়। তা হইলে এতগুলা ব্যঞ্জন মুখে দিলাম, এখনও একটাতে লবনের স্বাদ পাইলাম না কেন?

সারদা। তার শরীর অসুস্থ, তাহাকে রাঁধিতে দিই নাই।

কৃষ্ণধন। তুই রাঁধিয়াছিস্?

সারদা। আমার স্বামী ডাক্তার। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন সুসিদ্ধ না করিলে, ও তাহাতে মসলার আধিক্য থাকিলে, অম্ল অজীর্ণাদি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহার আদেশ পালন করিলে আমি শুদ্ধ তরকারী সিদ্ধ করিতে ও আঁকাইয়া ফেলিতে শিখিয়াছি। রাঁধিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শাশুড়ী পর্য্যন্ত আর আমার হাতে খাইতে চান না।

কৃষ্ণধন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এখন কথার মীমাংসা না করিয়া কেমন করিয়া চুপ করিবেন। তাই বলিলেন,—"তবে বুঝি পাড়ার কেহ?"

সারদা বলিল,—"পাড়ার সহিত মহামায়ার সদ্ভাব নাই। মহা-মায়া নাকি আর তাহাদের খোঁজ লয় না।"

কৃষ্ণধন বড় ফাঁপরে পড়িলেন। সারদা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া মুখ নামাইয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিল।

কৃষ্ণধন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কে? আমি এমন রান্না আর কখন মুখে তুলিয়াছি, এমন আমার মনে হয় না।" কৃষ্ণধনের জানিবার কৌতুহল বাড়িয়া গেল। সাগ্রহে বলিলেন,—"তবে কি মা আসিয়াছেন?"

সারদার মনে আনন্দ যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে গর্ব্ব আসিল। কৃষ্ণধনের মুখপানে চাহিয়া সারদা গর্ব্বভরে বলিল,—যথার্থই মা আসিয়াছে। মা কমলা আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।"

কৃষ্ণধন সব বুঝিয়া নীরব হইলেন। আবার তাহার মুখ গম্ভীর হইল। সারদা বুঝিতে পারিল—আর কোন কথা কহিল না।

কৃষ্ণধন অবনত মুখে অন্নপাত্রে হস্ত রাখিয়া গম্ভীর স্বরে সার-দাকে বলিলেন,—"সারদা!—কলিকাতার গণ্য-মান্য অনেক ভদ্র-লোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। মিথ্যা কথার কত শাস্তি দিয়াছি, তার সংখ্যা নাই। বৃদ্ধকালে নিজে কি সেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব?"

সারদা কথা বুঝিতে পারিল না—কোন উত্তরও করিল না।

(১৫)

রাত্রে কৃষ্ণধন মহামায়ার কাছে বালিকার সমস্ত পরিচয়ই পাইলেন। মহামায়াও কৃষ্ণধনের কাছে শ্যামসুন্দরের সম্বন্ধের সমস্ত কথা অবগত হইলে বুঝিল, কলিকাতার ভবানন্দ চৌধুরী বলিয়া একজন জমিদার আছে, তাহার একমাত্র পুত্র তারিণীচরণ। সেই একমাত্র পুত্রের একমাত্র কন্যা নলিনী। বিষয় অনেক, সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট, কলিকাতায় তাহার মান সম্ভ্রমের অবধি নাই। শ্যাম-

সুন্দর কালে সেই সব সম্পত্তির কার্য্যতঃ অধিকারী হইবে। আপাততঃ ভবানন্দ শ্যামসুন্দরকে বিংশ সহস্র মুদ্রা নগদ দিবে। শ্যামসুন্দর বিদ্যাশিক্ষার জন্য যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, ততদিন তার বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে। শ্যামসুন্দর গাড়ি ঘোড়া চড়িবে, ভবিষ্যতে চাকরীর ভাবনা ভাবিবার তার বংশাবলীর আর প্রয়োজন হইবে না। কৃষ্ণধন এখন হইতে যাহা উপার্জ্জন করিবে, মহামায়া তাহা দুই হাতে খরচ করিতে পারিবে। কৃষ্ণধনের তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

কৃষ্ণধন ইহা ছাড়া মহামায়াকে আরও অনেক কথা বুঝাইলেন। সহসা কোন কাজ করিতে নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ না করিলে, ভবিষ্যতে অনেক বিপদে ঠেকিতে হয়, মহামায়াকে উদাহরণ স্বরূপ করিয়া কৃষ্ণধন অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন। মহামায়া বড় একটা জবাব দিতেছিল না, কেবল "হুঁ"—"তাত বটে"—"বুঝিয়াছি"—ইত্যাদি কথায় সায় দিতে ছিল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন—মহামায়া এতকাল পরে ভালমন্দ কাহাকে বলে বুঝিয়াছে। একজন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রীর যোগ্যা হইয়াছে। কৃষ্ণধন এত তর্ক বিতর্ক, এত বক্তৃতা করিতেছিলেন, শুধু কি মহামায়াকে বুঝাইবার জন্য? মহামায়াকে বুঝাইবার জন্য কখন ত তার এত কথার প্রয়োজন হয় নাই। তবে এত বক্তৃতা বাগাড়ম্বর কেন? বালিকার মুখ দেখিয়া অবধি কৃষ্ণধন নিজেই কতকটা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার নিজের মনটাই বিশেষরূপ অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণধন সেই অবাধ্য মনকে মহামায়া স্থানীয় করিয়া প্রবোধ দিতেছিলেন। নিজে শ্বশুরের বিষয়ে অধিকারী হইয়া, লুব্ধ শ্যামসুন্দরকেও পরের অধিকারী করিবার লোভ সামলাইতে পারিতেছিলেন না। এক দিকে লোভ, অন্য দিকে অন্তরাধিষ্ঠিতা নবাগত বালিকা, তাহার হিতাহিত জ্ঞান লইয়া লড়াই করিতেছিল। কলিকাতার নলিনীও সুন্দরী, কিন্তু এ পোড়ার মুখো মেয়েটা যে

রূপের সাগর। তাহার উপর এ হতভাগা মেয়ে শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—শুধু শিখিতে আসে নাই, শিখাইতে আসিয়াছে। ব্যঞ্জনের মিষ্ট-স্বাদ তখনও পর্য্যন্ত কৃষ্ণধনের মুখে লাগিয়াছিল। সহুরে মেয়ে—বিশেষতঃ সহুরে ধনীর মেয়ে শুধু পড়িতে জানে—কেমন করিয়া রাঁধিতে হয়, পুস্তকে দেখিয়াছে—হাঁড়ি দেখিয়াছে কি? সে হইবে স্বামীর সঙ্গিনী; এ হইবে সংসারের স্বেচ্ছা প্রণোদিতা বিনা মাহিনার দাসী।

হউক আর নাই হউক, নলিনীকে দেখিয়া কৃষ্ণধনের সে বিশ্বাসটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর লোভেরই জয় হইল। মহামায়া তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছে ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে মন হইতে সরাইয়া দিলেন।—মহামায়া যখন বশে আসিল, তখন সারদা আসিতে কতক্ষণ?—কৃষ্ণধন বক্তৃতা শেষ করিয়া মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল দেখি, কাযটা কি মন্দ করিয়াছি?"

মহামায়ার উত্তর শুনিয়া কৃষ্ণধনের প্লীহা চমকিয়া উঠিল। মহামায়া বলিল,—"কোন কায?"

"কোন্ কায কি মহামায়া!—এতক্ষণ তবে কি করিতেছিলে?"

"একটা কথা ভাবিতেছিলাম।"

কৃষ্ণধন বুঝিলেন,—এতক্ষণ তিনি ভস্মে ঘী ঢালিয়াছেন। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, একটা চুরুট ধরাইয়া মুখে ধরিলেন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এতো দেখিতেছি সেই মহামায়া! সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা, পর-দুঃখ-কাতরা, সদাই অন্য মনস্কা সর্ব্বনাশী মহামায়া!

মহামায়া উপযাচিকা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহারা কি কুলীন?"

কৃষ্ণধন উত্তর করিলেন না।

মহামায়া। বল না, চুপ করিলে কেন?

কৃষ্ণধন। আমি তোমার মত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহিনা।

মহামায়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল,—"অন্যমনস্ক ছিলাম, শুনিতে পাই নাই।"

কৃষ্ণধন তখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভবানন্দ চৌধুরীর পৌত্রী—সুন্দর কন্যা, প্রকাণ্ড জমিদারী, অনেক টাকা, সুন্দর বাড়ী, সুন্দর বাগান, গাড়ি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, মান-সম্ভ্রম।" এক দিকে কুল, অন্য দিকে এই সমস্ত প্রলোভন। কুলকে লঘু দেখাইবার জন্য কৃষ্ণধন প্রতি কথাটায় জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন।

মহামায়া কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"সমস্তই হ'ল, কুলটা ত ভাঙ্গিয়া যাইবে!"

কৃষ্ণধন একটু উগ্রভাবে বলিলেন,—"ক্ষতি কি? যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর কুল-গর্ব্ব কয়দিন থাকিবে? ভবানন্দ বৃদ্ধ বলিয়া কুলের মর্য্যাদা রাখিতেছে। পুত্র তারিণীচরণের কাছে কুলের এত মূল্য হইত কি?"

মহামায়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,—তারপর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কুলই যদি ভাঙ্গিতে হইল, তবে মেদিনী-পুরের হতভাগা ব্রাহ্মণ কন্যা কি অপরাধ করিয়াছিল?"

কৃষ্ণধন বুঝিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে ক্রোধের সঞ্চয় হইয়াছে, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ স্বভাবতঃ ধীর—তিনি আত্ম-সংযমের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহামায়ার কথায় তাহার সে চেষ্টা গুড়াইয়া গেল। ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত—বলিয়া উঠিলেন,—"ধন-সম্পত্তি আমার উপার্জ্জন, গর্ব্ব-অহঙ্কার সমস্তই তোমার হইতে পারে, ঘর-জামাইয়ের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি? কিন্তু কুল আমার, তোমার পিতার নয়; সে আমার ইচ্ছায় থাকিবে—আমার ইচ্ছায় ভাঙ্গিবে।"

"কি করিলে,—তুচ্ছ কথায় আমার বাপ তুলিলে?"

কহিতে কহিতে মহামায়ার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারায় জল ছুটিল। বসিতে পারিল না। আর কোনও কথা না কহিয়া নিশব্দে ধীর-পদ-সঞ্চারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ কৃষ্ণধন আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "কি করিলাম!"—কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন; মহামায়াকে ফিরাইতে তাঁর সাহস হইল না।

* * * * *

বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। কৃষ্ণধনের তখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন—উষালোক ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছে, শুনিলেন—দৈয়াল ডাকিতেছে, দাস-দাসীগণ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। মহামায়ার সারদার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে তাঁর কর্ণে গেল। তিনি সারদাকে ডাকিলেন। সারদা আসিলে বলিলেন,—"মহামায়াকে ডাকিয়া দে।"—কথার ভাবে ও কৃষ্ণধনের মূর্ত্তি দেখিয়া সারদা বুঝিল, রাত্রে কিছু গো[illegible]যাছে। সারদা মহামায়ার কাছে ছুটিল—প্রভাতালোকে [illegible] মুখ দেখিল।—মহামায়া এমন সুকৌশলে মুখ খানি [illegible]ণ ঢাকিয়াছিল, কিছুতেই সারদা তাহাতে ভাব-বিক[illegible]র দো[illegible] [illegible]ন না—তবু একবার রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করিল। বলিল,—[illegible] দাদার সহিত বুঝি ঝগড়া করিয়াছিস্?"

মহামায়া। কখন দেখিয়াছিস্ কি?

সারদা। তবে দাদাকে কেমন কেমন দেখিলাম কেন?

মহামায়া তোমার দাদার অদৃষ্ট। তুমি ত চিরকালই তাহাকে কেমন-কেমন দেখ।

সারদা। তুমি কি নলিনী সম্বন্ধে কোনও কথা তুল নাই?

মহামায়া। তুলিয়াছিলাম।

সারদা। তারপর?

মহামায়া। ভবিতব্য।

সারদা। সে'কি কথা।

মহামায়া। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, নলিনীকে কন্যা বলিয়াছি, মায়ের চক্ষে তাহাকে চিরকাল দেখিব,—আদর যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।

সারদা। সেকি আমি পারিব না? আমার পুত্র কন্যা নাই, কন্যাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমি মহামায়ার কাছে আসি নাই। মহামায়ার পুত্র দীর্ঘজীবি হইয়া থাক্, তা'র আর কন্যার প্রয়োজন কি?"

রাগে সারদা ফুলিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইল, কিয়দ্দূর চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল,—"শীঘ্র যাও, তোমার স্বামী কি জন্য তোমায় ডাকিতেছেন।" তারপর মহামায়া গেল কি না গেল, আর ফিরিয়াও দেখিল না।

মহামায়া বরাবর স্বামীর কাছে গেল। কৃষ্ণধন মহামায়াকে গৃহ প্রবিষ্টা দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে তাহার হাত ধরিলেন, আর বলিলেন নমায়া! আমি অকৃতজ্ঞ নরাধম,—দুষ্কর্ম করিয়াছি—আমায় ।"

মহামায়া স্ব গ্রহণ করিয়া বলিল,—"ওকি বলিতেছ, তুমি কি যাছ!'

কৃষ্ণ বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"বল, এখনই কলিকাতায় যাইয় নিষেধ করিয়া আসি।"

মহামায়া বলিল,—"ছি! তা' করিলে লোকনিন্দা হইবে। তোমার মানসম্ভ্রম, আমরা স্ত্রীলোক কি বুঝি?

কৃষ্ণধন সাগ্রহে বলিলেন,—"অনেক ভদ্রলোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। আমি পুত্রকে কলিকাতায় রাখিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, তাহারা জোর করিয়া তাহাকে তাহাদের গৃহে লইয়াগিয়াছে। পুত্রের আদরে রাখিয়াছে। বল এখন আর কি করিতে পারি?"

মহামায়া বলিল,—"আর কিছুই করিতে হইবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পাবে?"

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

আর যা'ব না।*

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
কেমন তোমার স্বভাব ভাই, নিতুই এক খেলা ছাই,
একেলা পেয়ে মুখেব পানে কেবলি চেয়ে থাকা;
আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সাথে একা।
তুমি থাক' অমনি চেয়ে, আমিও যাই কেমন হ'যে,
বুঝি না ও মুখ খানিতে কি যে আছে লেখা;
আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সাথে একা।
ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলে নিয়ে, গাল দু'খানি দাও বাঙ্গিয়ে,
বড় দুষ্ট নষ্ট তুমি, বানিয়ে দাও বোকা;
আর যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সাথে একা।
গেলে তুমি দাও না ছেড়ে, ধব শুধু আঁচল বেড়ে,
কোথা দিয়ে যায় যে দিন, পড়ে সাঁঝেব বেখা;
আব যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সাথে একা।

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
ফিরে আস্‌তে অন্ধকাবে, কাঁটা বনে পথেব ধারে,
আঁচল বেধে হুঁছট্ খেযে বিষম দায়ে ঠেকা;
আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
চোবেব মতন ফিরি বাড়ী, লাজে কিছু বল্‌তে নাবি,
আঁচলে ঢাকি আদরের সে গালের রাঙ্গা ছেঁকা।
আব যা'ব না বকুল-বনে তোমাব সনে একা॥

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা "এই এক নূতন খেলার" উত্তর।

পল্লী-প্রবাসীর পত্র।

প্রিয় সুরেন বাবু!—

কোন বিশেষ কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমি এবার পূজার ছুটীতে বাটী যাইতে পারি নাই। "বারদিবস অবকাশ দায়িনী" দুর্গোৎসব পর্ব্বাহে আমাদের সেই সোণার সহরের নব্য সভ্য সুহৃদবর্গের সদালাপ ও সভ্যজনোচিত আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত হইয়া এবার আমাকে এই সুদূর পূর্ব্ব-বঙ্গের সামান্য পল্লীতেই পূজার অবকাশ অতিবাহিত করিতে হইল। আমাদের বন্ধুবর্গকে এবং সমিতির সভ্য, সভ্যা, সভাপতী ও পত্নীগণকে আমার সাদর সম্ভাষণ দিবে। আমাদের "উন্নতি বিধায়িনী" সভার কার্য্য কেমন চলিতেছে? মিস মনোরমা গাঙ্গুলী মহাশয়া আমাদের "পবিত্র-প্রেম-বিধায়িনী" সমিতির সহিত কিরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদানে আমায় বাধিত করিবে। আমি অগত্যা কিছু দিবসের জন্য কলিকাতা হইতে অন্তরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া, আমি যেন তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর না হই। দূরে থাকিলেও আমি কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের জীবনের ব্রত বিস্মৃত হই নাই। আমি এই পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, বিশেষতঃ এবার পূজায় এখানে থাকিয়া পল্লীবাসিগণের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, আহার বিহার সমস্তই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত Study (পাঠ) করিতেছি। ভাই! ভারতের পল্লীগ্রাম সমূহের নৈতিক অধোগতি, অসভ্যতা-বৃদ্ধি ও অশ্লীলতার উন্নতি দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। শিক্ষিত যুবক যে এখানে আদৌ নাই, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু উপযুক্ত সভা সমিতির অভাবে ইহারা সভ্যতার সুপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই সকল অসভ্য বর্ব্বর গুলিকে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে এবং সাম্যভাবের সুধায় তাহাদিগের মন প্রাণ মাতাইতে না পারিলে

আমাদের জীবনের ব্রত অসম্পূর্ণ ও অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে। তাই আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা সকলে এক মনে, এক প্রাণে, এক তানে, আমার সহিত সহানুভূতি করিলে আমি এখানে একটী "শাখা-সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন পল্লীগুলিকে সভ্যতার সূর্য্যালোকে আলোকিত করি। এ বিষয়ে অবশ্য প্রথমে কিছু ব্যয় আছে, আমি মনে করিতেছি "যদি সভ্য সভ্যাগণের মত হয়" তাহা হইলে গত বর্ষে আমরা যে ফিজীদ্বীপের দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় করিয়া ছিলাম, তাহা হইতে আপাততঃ কিছু এই শুভ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হউক; আর কামস্কাট্‌কায় চাউল প্রেরণের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা আপাততঃ কার্য্যে পরিণত না হইলেও চলে, কারণ তোমরা সকলেই বোধ হয় জান Charity begins at home. তোমাদের ন্যায় উচ্চ-মনার পক্ষে সমগ্র সংসারই গৃহ—বসুধাবাসী সকলেই তোমাদের আত্মীয়।

ভাই! এবার পূজার অবকাশ এখানে অতিবাহিত করিয়া, আমি পল্লীবাসিগণের দুর্দ্দশা ও পাশব ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকটা বহুদর্শীতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার এই কয়েকদিন এখানে অবস্থানে আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, পল্লীগ্রাম সমূহ অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহারা অর্থের সদ্ব্যবহার আদৌ জানে না, পদে পদে অলসতার প্রশ্রয় দেয় আর Old fool গণের পদাঙ্ক অনু-সরণ করিয়া অনেক আপদ বিপদ আনয়ন করিয়া আমাদের ন্যায় উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভাই! এবার পূজায় এখানে যেরূপ বীভৎসকাণ্ড দেখিলাম, তাহার কিয়দংশ তোমাকে না জানাইলে আমি সুস্থির হইতে পারিতেছি না। বিবরণটী পাঠ করিলেই তোমরা জানিতে পারিবে—পল্লীগ্রামের অসভ্য বর্ব্বরগুলা কিরূপ নির্ব্বোধ ও কিরূপ অপরিমিতব্যয়ী, অর্থের অর্থবোধ ইহাদের আদৌ নাই। পল্লীগ্রামে পূজায় যে কেবল কতকগুলা ভূতভোজন হয়, তাহা তুমি আমার পত্রে বেশ বুঝিতে

পারিবে, আর আশা করি, ব্যাপার বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

আমি যে গ্রামে রহিয়াছি, সেখানকার ঘোষেরা বেশ বড় লোক। বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয়ের আয় ব্যয় দুই যথেষ্ট বটে, কিন্তু দুই সমান। পরিবার, দাস দাসী, সন্তান সন্ততি প্রভৃতিতে অনেকগুলি। তিনটী সন্তান বেশ শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম; তাঁহারা বিদেশে চাকরী করেন, কিন্তু যথেষ্ট আয় থাকিতেও অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীগণকে সঙ্গে রাখেন না, যাহা উপার্জ্জন করেন, সমস্তই সেই বৃদ্ধ সেকেলে অসভ্য পিতার হাতে দিয়া লাভে মূলে হারাৎ হন। এক কথায় ইঁহারা যেন সেই বৃদ্ধের ক্রীতদাস। বৃদ্ধা গৃহিণীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী আর পুত্রবধূগণ যেন বাটীর চাকরাণী। এই যুবক-দম্পতীগণের মাথায় যে কিছুমাত্র পদার্থ আছে, সে বিশ্বাস আমার আদৌ নাই; থাকিলে তাঁহারা কখনই এই বিস্তৃত সংসারের ভূতভোজন ব্যাপারে এত অর্থনাশ ও প্রেম-প্রতিমাগণের স্বাস্থ্য নাশের ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইতেন না। ভাই! বল দেখি আমাদের সুসভ্য কলিকাতা সহরে এরূপ বর্ব্বর কয়জন আছে?

যাই হউক, এখন এই বাটীর পূজার ব্যাপার শুন। এই গ্রামের চতুপার্শ্ববর্ত্তী ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোন গ্রামেই পূজা নাই। এই এক খানি মাত্র পূজার খাতিরে এখানকার কত লোক বিদেশ হইতে—এমন কি কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া, সেই সাহেব ভোজন, নাচ, থিয়েটার প্রভৃতির স্বর্গীয় বিমল আনন্দ অবহেলা করিয়া কেন যে এই কু-পল্লীতে দৌড়িয়া আসিয়াছে, তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!

পূজার প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাবিধ দ্রব্যাদির আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। যেখানে যে ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিবিধ সুরম্য উপাদেয় খাদ্য বস্তুতে গৃহ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। পূজার কয়েকদিবস পূর্ব্বে

হইতে গ্রামস্থ কতকগুলি বিকটাকার ব্রাহ্মণ আসিয়া মহানন্দে বিবিধ ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। পরম উপাদেয় ইংরাজ-পছন্দ দ্রব্য সমুদয় দেখিয়া আমি আগে মনে করিয়াছিলাম—বোধ হয়, ঘোষজ মহাশয়ের বাটীতে এই পূজা উপলক্ষে কতকগুলি সাহেব-সুবো ও ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য-সভ্যবৃন্দের শুভাগমন হইবে। তাঁহাদের সহিত আমাদেব মার্জ্জিত রুচির গোটা কতক কথা বার্ত্তা কহিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইব। ভাই! বলিব কি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত মন খুলিয়া আমাদের সেই অপূর্ব্ব-মিশ্র বাঙ্গালায় কথা কহিবার সুখ আদৌ পাইলাম না। যদি কখনও কোন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে যাই, কি জানি কেন তাঁহারা আমার সমস্ত কথার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারে না।

পূজার পূর্ব্ব দিবসেই নিমন্ত্রিত আগন্তুকগণেব জনতায় ঘোষজ মহাশয়ের সুবৃহৎ বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামস্থ অনেকেই বাটীতে তালা লাগাইয়া সপরিবারে এখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। যিনি না আসিলেন, ঘোষ-গৃহিণী স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে যেরূপ সুসভ্য লোকের শুভাগমন আশা করিয়া ছিলাম, তাহার একটীও দেখিতে পাইলাম না; কেবল কতকগুলা অর্দ্ধ-উলঙ্গ বিকটাকার ব্রাহ্মণ ও কতকগুলা ইতর লোকে সেই সকল উপাদেয় দ্রব্যজাত উদরসাৎ আরম্ভ কবিল। এক এক জনের আহাব দেখিলে তোমবা নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইতে। সে গুলা মানুষ কি রাক্ষস, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

অষ্টমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর যে একটা বীভৎস ভোজন ব্যাপার আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিযাছি, তাহার বিবরণ তোমায় যথা-যথ লিখিতেছি, তুমি ত অবশ্যই পাঠ কবিবে, আর আমাদের বন্ধুবর্গকেও শুনাইও; কিন্তু সাবধান! যেন আমাদের সভা সমিতির সভ্যা ও সভাপত্নীগণের কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিতে না পায়! এ বীভৎস বর্ণনা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ কবিলে তাহাদের নিশ্চয়ই ফিট্ হইবে। আর তুমি একেলা সকল গুলির শুশ্রূষা করিয়া উঠিতে পারিবে না।

ব্যাপারটী এই,—আরতীর পর, আগন্তুক প্রতিমা দর্শকগণকে সাদর সম্ভাষণে ও উপাদেয় আহার্য্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয় যখন জল যোগ করিবার জন্য বাটীর মধ্যে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ "চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিতেছেন"—বলিয়া চারিদিকে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয় পূজার তিন দিবসই প্রত্যুষে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হন এবং স্বয়ং অনিমন্ত্রিতগণের ভোজন ব্যাপার তত্ত্বাবধান করিয়া আরতীর পর অন্তঃপুরে গমন করতঃ জলযোগ করেন। গৃহিণীর জলযোগ সুতরাং কর্ত্তার জলযোগেরও পরে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিতেছেন শুনিয়া ঘোষজ মহাশয় হাস্য-মুখে করজোড়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং এক বিকটাকার ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সযত্নে চণ্ডীমণ্ডপে বসাইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল, পুত্রগণ একে একে আসিয়া সেই অসভ্য বর্ব্বরের ফাটা পায়ের ধূলি লইয়া মাথায় দিতে লাগিল। উপরে স্ত্রীলোকগণও তাঁহাকে দেখিবার জন্য জানলার নিকট জনতা করিয়া বসিল। আমি এই ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ইহার নাম হরেরাম চক্রবর্ত্তী ইনি প্রতিবর্ষে অষ্টমী পূজার দিন রাত্রে এখানে পদার্পণ করিয়া জলযোগ করেন এবং জল যোগের দক্ষিণা বা বৃত্তি পাঁচ টাকা গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যান।

কিয়ৎক্ষণ ঘোষজ মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, ভাই! এবার ভাদুড়ে মন্দাগ্নিতে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি; আহার আর আদৌ নাই বলিলেই হয়, তবে তোমাকে একবার আশীর্ব্বাদ করিতে না আসিলে মনটা কেমন করে তাই আসা। ভাই! ভাদুড়ে মন্দাগ্নির জ্বালায় এ বয়সে আমাকে প্রথম ঔষধি সেবন পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া যখন আহার একবারে কমিয়া গেল, তখন একদিন অনেক ভাবিয়া বৈদ্যপুরের কবিরাজ বাড়ী ঔষধ আনিতে গেলাম। পথে বেলা অধিক হওয়ায় সুবর্ণ গ্রামের সামন্তদের বাটীতে অতিথি হইলাম। স্নানাহ্নিক সারিয়া

রন্ধন করিতে গিয়া দেখি—আদ সের খানেক চাউল ও কিছু তরিতর-কারীর আয়োজন রহিয়াছে। দাদা তুমি ত জানই, আমার চাউল জল খাওয়া অভ্যাসটা অনেক দিনের, তবে সে সময় মন্দাগ্নির প্রকোপ ছিল বলিয়া, ওই আদসের চাউলে যো যা করিয়া, চাউল জলটা সারিয়া লই-লাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভৃত্য পান লইয়া আসিয়া আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবাক্ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, বাপু হে! তোমরা যে কয়টী চাউল দিয়া গিয়াছিলে তাহাতেই আমি জোগেজাগে চাউল জলের কাযটা সারিয়া লইয়াছি; তবে রন্ধনের চাউল না পাইয়া কাযেই বসিয়া আছি। ভৃত্য শুনিয়া কহিল,—"ঠাকুর! রন্ধনের জন্য কতগুলি চাউল আনিব অনুমতি করুন" আমি কহিলাম—"বাপু! আমি মাসেক কারণ মন্দাগ্নিতে ভুগিতেছি, আহার আর নাই, তাই বেশী দরকার নাই—সের দশেক চাউল ও তদুপযুক্ত তরিতরকারী আনাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।" ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উক্ত জিনিষগুলি আনিয়া দিল। আমি পাকশাক সমাপন করিয়া ভোজনে বসিয়াছি এমন সময়ে বাটীর কর্ত্তাবাবু আমার সমুখে উপস্থিত হইয়া বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। আর বলিয়াদিলেন—"মহাশয়ের প্রত্যা-গমন সময়ে যেন একবার এখানে পায়ের ধূলা পড়ে।" কিন্তু দাদা সে পথ দিয়া না আসায় আর সেখানে যাওয়া হইল না।

কথাটা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমি কিন্তু এই নর-রাক্ষসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘোষজ মহাশয় অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে চরণ ধৌত করিতে বলিলেন। তিনি বার কয়েক হাঁই তুলিয়া তুড়ি দিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আসরে উপবেশন করিলেন। ভাই! বলিব কি, এই রাক্ষস কেবল জলযোগে প্রায় দশ সের দধি ১ থান, প্রায় ৫ সের ক্ষীর, সন্দেশ প্রায় ৩ সের ও কয়েক প্রকার ফল দেখিতে দেখিতে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল এবং একটু হরিতকী চর্ব্বণ করিতে করিতে ৫টী টাকা দক্ষিণা বা বৃত্তি লইয়া চলিয়া গেল। ভাই! এইরূপ নর-রাক্ষস গুলার অন্ত না করিতে

পারিলে কথনই ভারতের দারিদ্র্য দূর হইবে না, আর যাহারা এরূপ উদরপরায়ণ অলসগণের আলস্যে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদিগেরও গুরুতর শাস্তির প্রয়োজন; এজন্য আমাদের উন্নতি বিধায়িনী সভায় একটী নিয়ম বৃদ্ধি করিলে হয় না?

এইরূপে পূজার তিন দিনই কতকগুলা অসভ্য বর্ব্বরকে ভোজন করান হইল। কেবল ভোজন কেন বলি, সপ্তমীর দিন ঘোষজ মহাশয় ও তদীয় গৃহিণী গ্রামের প্রায় সমস্ত লোককেই নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন। দেখ দেখি ভাই! কি বর্ব্বরতা!! কি অর্থের অপব্যবহার। এসব কুসংস্কারাপন্ন লোক থাকিতে আমাদের সমাজ কথনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

রাত্রে নাচ থিয়েটারের নাম গন্ধও নাই। সে সব বিশুদ্ধ আমোদে আজ পর্য্যন্ত ইহারা বঞ্চিত রহিয়াছে, সঙ্গীতের মধ্যে দেখিলাম কতকগুলা বিকটাকার পুরুষ নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিকট নৃত্য ও বিকট চীৎকারে কর্ণ বধির প্রায় করিয়া দিল। এই অশ্লীলতা-পূর্ণ বর্ব্বর আমোদকে ইহারা "কবি" বলে।

ভাই পত্রে আর কত লিখিব? এ স্থানে আমি বেশী দিন থাকতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না, সত্বর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিবার প্রবল ইচ্ছা মনে রাখিয়া, আজ এ স্থলেই 'ইতি' দিতে বাধ্য হইলাম।

তোমারই ফেলারাম।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

৫৫

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

হরি-নাম।

লণ্ঠন দোলা দেখিয়া ঘড়ী সৃষ্টি হয়, সময়ের মাপ কার্য্য; সূর্য্য পূর্ব্বদিকে ছিল—পশ্চিমে যাইল, দিনের পর রাত্রি আসিল, আবার সূর্য্য উদয় হইল, এই কার্য্যের দ্বারা সময় মাপ হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত আর সময়ের অনুভব নাই। ঘড়ীর অভাবে—অন্ধকার রজনীতে আমাদের আপন কার্য্যের দ্বারা সময় নির্ণয় করি। সন্ধ্যার সময় বসিয়াছিলাম, এত পাতা পাঠ করিয়াছি, সুতরাং সময় এইরূপ হওয়া সম্ভব। কার্য্য যদি সময়ের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে কোন এক মন্তব্য-সাধনের নিমিত্ত কতটা কার্য্যের প্রয়োজন, তাহাই দেখা আবশ্যক। সহস্র সহস্র বৎসরে উপস্থিত স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ ধীর কার্য্য-প্রবাহে খনির মধ্যে হীরা প্রস্তুত হয়; কিন্তু সেই হীরক রাসায়নিক যন্ত্রে দুই তিন দিনের ভিতর প্রস্তুত হইতেছে, শুনা যায়। ইহাতে বুঝায় যে, ধীরে ধীরে যাহা হইতেছিল,—অল্প কার্য্যের দ্বারা যে ফল ফলিতেছিল, যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা হীরক প্রস্তুত হয়, বিজ্ঞানবলে সেই সকল কার্য্য

অল্প সময়ের ভিতর একত্র সংযত হইযা হাঁরা প্রস্তুত করিয়াছে। বাহ্য জগতে যদি ধীব ও দ্রুত কার্য্যের ফলাফল প্রভেদ হয়, যদি কোটী বৎসরের কার্য্যের ফল পাঁচদিনে দ্রুত কার্য্যে সম্পাদিত হয, বাহ্য জগতে যদি এরূপ নিয়ম দেখা যায, অন্তর্জগতেও সেই-রূপ। ইহা সকলেই দেখিযাছেন যে, একজন বালক এক ঘণ্টায যে সমস্ত পাঠ কণ্ঠস্থ কবে, আব একজন তাহা ছয় মাসেও পাবে না। আমি দেখিয়াছি—একটী বালক তাহাব পাঠ্য পুস্তক অভ্যাস কবিত। "হি ব্যাণ্ য্যাট্ হাব" ভাল কবিয়া আবৃত্তি করিতে পারিত না, "হি বেণ আটাব" বলিত। প্রতিদিন সমস্ত বাত্রি "হি রেণ আটার" "হি বেণ আটাব" কবিযা এক বৎসবে তাহাব পাঠ সমাপ্ত হইল না। বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ, ধর্ম্ম উপার্জ্জনেও ঠিক সেইরূপ হয়। আজীবন প্রাতঃস্নান, পূজা, ত্রিসন্ধ্যা, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব, একাহাবী, ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মচর্চ্চা কবিনা মনেব মালিন্য কিছুমাত্র দুব হইল না, দেখা যায। ববঞ্চ কার্য্যে অনুভব হয যে, বয়সেব সহিত দিন দিন দুর্ব্বুদ্ধি প্রবল হইযাছে। নিজেব গুরু—অজ্ঞান, পৃথিবীব লোক পাপীষ্ঠ, সাধু-শান্ত পেটের দাযে, সাধু কোথায নাই, সংসাব ধর্ম্ম যেরূপ তিনি একশত টাকায পঁচাত্তব টাকা সুদ লইযা পবিবাববর্গকে এক সন্ধ্যা খাওযাইয়া, ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিযা, কাহাকে কখনও মার্জ্জনা না কবিযা, সন্ধ্যাব পব তাঁহার সমজ্ঞানী বৈষ্ণবীব সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা কবিযা, প্রচুব মাল অর্থ ষ্টেট্ সংগ্রহ পূর্ব্বক যেরূপ তিনি সংসাবধর্ম্ম নির্ব্বাহ কবিতেছেন, তাহাই সারধর্ম্ম, যদি কাহাকেও ত্যাগী দেখেন, সে ভণ্ড; যদি কেহ ভিক্ষাব জন্য আইসে সে যোচ্চোব; দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণচর্চ্চা যাহা শাস্ত্র উপদেশ দেয, সে সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়া করিতে হয, নতুবা চোবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয। এক কথায় তিনি ও তাঁহাব ধর্ম্ম সহাযিনী বৈষ্ণবী ব্যতীত আব ধার্ম্মিক কেহ নাই, এই ধাবণা। দীনভাবে চৌরাস্তায় বসিযা কুঁড়োজালি জপ করিতে থাকেন,—এই তাঁহার আজীবন ধর্ম্মচর্চ্চার ফল। আবার অপর

দিকে যদিচ বিরল, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ঘোর সংসারী মহা-সংসার কার্য্যে লিপ্ত, ঘোর নাস্তিক, এক দিনও দেবতার নাম লয় নাই, সহসা সর্ব্বত্যাগী হইল। অল্প অপরাধে পূর্ব্বে যে শত্রুকে গুলি করিতে যাইত, ভৃত্যকে চাবুক প্রহার ভিন্ন অপর সম্ভাষণ করিতে জানিত না, সেই ব্যক্তিকে প্রেমে গদ গদ হইতে দেখা গিয়াছে,—মস্তক হইতে ইকুন খসিয়া পড়িলে পুনর্ব্বার মস্তকে রাখে। এ ঢং নয়, ছল নয়, লোককে দেখাইবার নিমিত্ত নয়, তাহার লোকের সহিত কথা কহিবার সাবকাশ নাই, লোকের প্রশংসা-বাদ শুনিবার সাবকাশ নাই, এমন কি আহারের সাবকাশ নাই। সদাই ভয়, যে কার্য্য করিবেন, সেই কার্য্যেই উচ্চধ্বনিতে হরি-নাম করার বিরাম পড়িবে। এরূপ মহাপুরুষ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতি স্বল্প সময়ে দুরন্ত দানব, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুমান হয় যে, সূর্য্যের গতা-গতি ধরিয়া যে সময় আমরা নির্ণয় করি, সে সময় পরিমাণে মনের পরিবর্ত্তন নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মনে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইলে, কয়লা মন হীরা হয়, যেমন বাহ্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কোটী কোটী জন্ম মালা ফিরাইয়া জ্ঞান পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না, তাহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। যেমন বাহ্য জগতে কোটী কোটী বৎসর কয়লা থাকিয়া কয়লাই রহিয়াছে, তাহাতে হীরকত্বের আভাস নাই। দেখা যায়—মনের যে কার্য্যে মন নির্ম্মল হয়, সেই কার্য্য যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে স্বল্প সময়ে মন নির্ম্মল হইবে। নাস্তিক সংসারিক হঠাৎ একদিন বুঝিল, যে নিজ কার্য্যে জগতের সমস্ত লোককে শত্রু করিয়াছে, নিজ বুদ্ধি ভেলা সংসার তরলে ডুবু ডুবু হইয়াছে। উপায় হীন দুরন্ত পাথার! গুরুর কৃপায় বুঝিল, দয়াময় ঈশ্বর আছেন, ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, বিশ্বাস জন্মিল, সংসার-তাড়িত নাস্তিকের আনন্দের আর সীমা রহিল না, সংসার সাগর গোষ্পদ জ্ঞান হইল। জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বর আছেন, ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়! ঈশ্বরপদে

হৃদয় আকৃষ্ট হইল, ঈশ্বর ধ্যান-জ্ঞান জীবন হইয়া উঠিল, ক্ষণ-মাত্র ঈশ্বর অন্তরে থাকিতে সাহস হয় না, তাহা হইলেই ঘোব অন্ধকাব নরক দর্শন হয়। নাস্তিক তবল সাগর হইতে উঠিয়া অটল শৈলাসনে বসিল। একদিনেই পবিবর্ত্তন,—একদিনেই চিত্ত-শুদ্ধি—তাহা আব সময় সাপেক্ষ নহে। ঈশ্বব তাহাব জীবনেব পূর্ণ অবলম্বন হইলেন, কিছুই বাকী বহিল না! অপব এক ব্যক্তি পাপের জ্বালায় অস্থির। আত্মীয় পবিত্যক্ত, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ব্যবস্থাপকেরা তুষানল বা উত্তপ্ত ঘৃত পান ব্যবস্থা দিয়াছেন, এমন সময়ে প্রফুল্লকান্তি দেবমূর্ত্তি সন্ন্যাসীব মুখে অভাগা শুনিল, "একবার হরি-নাম কর, তোমার পাপ থাকিবে না।" অভাগা আশ্বাস বাক্যে আত্মহারা হইল, নাম প্রভাবে হৃদযগ্রন্থী ভেদ হইল, উন্মাদ-আনন্দে বিভোর হইযা গেল, এক নামে হরিগত প্রাণ, সাধু! তাঁহাব পদস্পর্শে শত শত লোক সাধু হইতে লাগিল, সেই অপবিত্র ব্যক্তি যে স্থলে চলিয়া যায়, সেই স্থল পবিত্র হইতে লাগিল, এক নামে মহাপাপী উদ্ধার হইল।

মুমূর্ষু রোগের তাড়নায় অধীব, বৈদ্য আশা ত্যাগ করিয়াছে, পলে পলে মৃত্যু অগ্রসব হইতেছে, পীড়াব তাড়নায় অনুভব করিতেছে, জীবনেব পাপ সমুদয় ভীষণ বেশ ধাবণ কবিয়া সম্মুখে নৃত্য কবিতেছে, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রযুক্ত রিপু সকল স্থিব হইয়াছে। অদূব ভবিষ্যতে মৃত্যু! তাবপর কি হইবে, হৃদয় শিহরিতেছে। মহাভয়ার্ত্তের নিকট মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভয় কি হরি নাম কর।" হবি-নাম কবিল, অমনি অলকানন্দার পূতবারি তাঁহার হৃদয় বিধৌত কবিয়া স্বর্গেব উপযোগী করিল, হবি-নাম করিয়া মরিল, কি হইল তাহা আর দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু দর্শক সমুহেব মধ্যেই নিশ্চিত হইল যে সে হরি-পাদ-পদ্মে স্থান পাই-য়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালককালে একজন ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াছিলাম; আমাদেব পাড়ায় সে কথা বহুদিন প্রচার ছিল, ব্রাহ্মণের চরম সময় উপস্থিত, তীরস্থ করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে

বেশ্যালয়ে হাত কাটা গিয়াছিল, হাত জুড়িবার ক্ষমতা নাই, ধীরে ধীরে মা গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করি নাই, ভরসা পতিতপাবনী তুমি আছ, এক্ষণে শরণাগত পতিতকে পায়ে স্থান দাও" ব্রাহ্মণ গঙ্গার গর্ভে প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল, যাহারা শুনিয়াছিল, সকলেরই মনে মনে আশার সঞ্চার হইল, যে ব্রাহ্মণ চরম কালে পরম গতি লাভ করিয়াছে। যদি শাস্ত্র সত্য হয়, যদি মহাপুরুষের বাক্য সত্য হয়, মানব হৃদয়ে এ আশা মহাফলপ্রদ। দেবতার স্থানে আশা বিফল হয় না, এই ঋষির মৃত্যুর দর্শনে বা শ্রবণে যাহাদের মনে মা গঙ্গার পাদপদ্ম লাভ আশা জন্মিযাছিল, সে আশা—কল্পলতিকা জননী পূর্ণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই এমন হৃদয়-ফুল্লকর কথাও কাহারও কাহারও বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। অন্তিমকালে বিশ্বাসের ফল তাঁহারা স্বীকারই করেন না। দৃষ্টান্ত দেন, মহাপাতকী মুমূর্ষু অবস্থার ভয়ে দেবতা স্তব করিল কোন কারণে তাহার মৃত্যু না হইয়া আরোগ্য লাভ করিল, তাহাকে পুনর্ব্বার পাপ করিতে দেখা যায়, যদি চরম কালে দেবতার নাম উচ্চারণ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে আবার তাহার পাপে মতি হইল কেন? এইরূপ বহুপৃষ্ঠব্যাপী তর্ক করিয়া থাকেন। ইহা দেখা যায় সত্য; বাসনা অতি দুর্দ্দম—সবল দেহে অধিক প্রবল হইয়া উঠে, পাপে মতি হয়, কিন্তু চরম অবস্থায় যাহা দেখিয়াছিল তাহা কখনও স্মৃতি হইতে উঠিয়া যায় না, দিনে দিনে দেহ ক্ষয়ের সহিত সে স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অভাগা শুনে নাই যে, ঈশ্বরের নামে পাপের ক্ষয় হয়, যদিও শুনিয়া থাকে, বিরোধী যুক্তি তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে, ভয়ে ঈশ্বরের নাম করিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে নামে তাহার রুচি জন্মায় নাই, সে জানে না যে, দয়াময় তাঁহার নাম বিলাইয়াছেন, যে নামে মহাপাতকী নিস্তার পায়, যদি একবার তার

হৃদয়ে ধারণা হয় যে, তাহার ন্যায় মহাপাতকীর নিমিত্তই নাম, নামে দয়ামাখা—সে দয়ার অবধি নাই, তাহা হইলে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মনুষ্যের স্বভাব—কোনও দাতার কথা শুনিলে প্রফুল্ল হয় না, এমন ব্যক্তি অতি বিরল, তবে দাতারাম ভগবানের নামে তাহার হৃদয় প্রফুল্ল হইবে না কেন? দয়াল রামকে দিন দিন মনে পড়িতে থাকে—অপার করুণা দিন দিন উপলব্ধি করে। বাসনার বল ক্রমে কমিয়া যাওয়াই সম্ভব, নামে রুচি হওয়া অতি উৎকৃষ্ট সাধনের ফল। এ স্থলেও আপত্তি আছে, আপত্তি-কারী এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত নাই, তিনি পাণ্ডিত্য অভিমানে বলিতে থাকেন—"এ কথা সত্য হইলেও প্রকাশ করিতে নাই, ইহাতে জগতের ক্ষতি হয়, একবার ঈশ্বরের নাম লইয়া মুক্তিলাভ হইবে, মানুষের এ ধারণা থাকিলে দুষ্কর্ম্ম হইতে কখনই নিবৃত্ত হইবে না, দেখ না কেন, ব্রাহ্মণের কথাতে প্রকাশ "মা গঙ্গা! তুমি আছ বলিয়া বিস্তর পাপ করিয়াছি।" সেইরূপ অনেকেরই পাপে মতি হইবে। সত্য দ্বারা অনিষ্ট হয়, এ কথা আমরা স্বীকার পাই না। * ব্রাহ্মণের কথায় কি প্রকাশ পাইতেছে? যে দিন তাহার গঙ্গাভক্তি জন্মিয়াছিল, সেই দিনই তাহার পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আপনাকে দীনহীন পাতকী জানা মহাসাধন—এই সাধন তাহার হইতেছিল, যাহাকে ঈশ্বর বিশ্বাস দেন—তাহাকেই কিঞ্চিৎ তাড়নাও করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণের অল্প তাড়নায় হয় নাই, বেশ্যালয়ের আমোদের ফলে তাহার ছিন্ন হস্তে বিরাজিত ছিল, দিন দিন সেই ছিন্ন হস্ত অনুতাপ আনিত, অনুতাপানলে যেরূপ হৃদয় নির্ম্মল হয়, অভিমানের সহিত কোটী কোটী বৎসর মালা জপিয়া তাহা হয় না। নামে রুচি হইলেই ঈশ্বরের দয়া ও আপনার দীনতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি

---

* অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত, কিন্তু মধুর হরি নামে অধিকারী নাই, এমন দীনহীন কেহ নাই, দীনের জন্য হরি নাম সে নামে সকলেরই অধিকার।

হয়, এই উপলব্ধিই জ্ঞান সূর্য্যের উষা, এই উপলব্ধির পর জ্ঞান সূর্য্যের উদয়ের বিলম্ব থাকে না, অজ্ঞান অন্ধকাব দূব হয়. এই সকল তার্কিকদেব আমার গুরুব নামে বলি, নামে রুচি হউক, নিজেব হীনতাব প্রতি লক্ষ্য হউক। সন্দেহ জড়িত তর্ক যুক্তি দূব হইবে, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দ লাভ করিবে, নামে রুচি হউক, যিনি আমায় এ আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি আমার গুরু।

আপত্ত্য উঠিতে পাবে যে, যাহারা একবার হবি-নাম করিয়া ফল লাভ কবিয়াছে, সে ফল তাহাদেব বিশ্বাসের—হবি-নামের নহে, মহাপুরুষেব কথায় বিশ্বাসেব ফল। মহাপুরুষ হবি-নাম দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অমৃত ফল ফলিযাছিল, ইহাতে হবি নামেব গুণ কি? আমবা উত্তর কবি, যাঁহাবা যে বস্তু লইযা চর্চ্চা কবেন, সেই বস্তুব গুণ তাঁহাবাই বিশেষ অবগত। হবিগত প্রাণ মহাপুরুষেবাই হবি-নামেব গুণ যথার্থ ব্যাখ্যা কবিতে সক্ষম। যদি কেহ শাস্ত্র-বাক্য মহাপুরুষ-বাক্য জ্ঞানে হবি-নামে প্রত্যয করে, তাহারও হরি-নামেব ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

আশা।

হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে গেনু
আশায় গগন-চাঁদে,
লাফিযে চাঁদা পালিয়ে গেল
পা' দিলে না ফাঁদে;
অবাক্ হ'যে ভেকার মত
ঘবে ফিরে আসি,
হেনকালে জুট্‌ল এসে
আবার আশাব রাশি;

আশাব আশে হাঁফ ছুটিযে
যেথানেতে যাই,
সেই খানেতেই আশা চাঁদা
ধরা দেয় না ভাই!
ধোবে তোমায় দেবো ব'লে
কত সুহৃদ্ জোটে,
জুটে পোড়ে শেষকালেতে
মূল ধন্‌টা লোটে।

লুঠ্-তছরূপে সকল গেল
নাইক কিছু আর,
হাঁ ক'বে তাই রইনু ব'সে
আশাই সুধু সার ;
তবু কেন আশার আশা
ছাড়তে নাহি পারি,
ঘুরে ফিবে আশার ফাঁসে
পা' জড়িয়ে মবি ;
ইচ্ছা করে—আশায ছেড়ে
অন্য দিকে ধাই,
চারদিকেতে আশার বেড়া
রাস্তা বোথা পাই ?

যদি—বল "বেড়া ভেঙ্গে
যাও না কেন চ'লে,"
কোন্ দিকেতে কোথায় যা'ব
কেবা দেবে ব'লে ?
যে জন আমায় দেবে ব'লে
পাই না ত তার দেখা,
কাযেই আমায় ব'ল্‌তে হ'ল
অদৃষ্টের ফল লেখা ;
দোষ দিতে হয় তারেই দোষ'
সেই ব্যাটা এর গোড়া,
অসার আশার সংসারেতে
সবাই আশায় বোড়া।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ।

প্রাণের জ্বালা।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে। এই কযদিন পৃথিবীতে আসিযাছি, ইহাবই মধ্যে এত জ্বালা কোথা হইতে আসিল ? জ্বালার উপব জ্বালা অতি বিষম, জ্বালায প্রাণ মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিরাম অনিবার জ্বালায় জ্বলিযা মরিতেছি ; কিন্তু কি জ্বালা—কিসেব জ্বালা —কিছুই জানি না। দিনে কার্য্যের অবসরে,—রাত্রিতে নিদ্রার প্রাক্‌কালে, যখনই মন এলাইয়া পড়ে, তখনই জ্বালা দ্বিগুণীত হইয়া উঠে, তখন প্রাণ আরও অস্থির হইয়া পড়ে। বল দেখি, কিসেব এ জ্বালা ?—কিসে এ জ্বালা জুড়ায় ?

সংসার! তোমাতে কত কি আছে,—কত মহান্, কত বৃহৎ, কত উচ্চ, কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র, কত নীচ ব্যাপার আছে ; ইহারই মাঝে পড়িয়া আমি জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। পৃথিবীতে

কত কি আছে, তাহাদের তুলনায় আমি কি? বিশাল সাগর গর্ভে একটী কীটানুর ন্যায়—দিগন্ত ব্যাপিনী নীল কাদম্বিনী কোলে ক্ষুদ্র চাতকটির ন্যায়—অনন্ত অসীম আকাশপটে ঘূণাক্ষরের ন্যায় আমি একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যাপার!—সংসার! তোমার বিশাল ক্রোড়ে কোথায় এতটুকু স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, তাহাতেও এত জ্বালা! সংসার! বলিতে পার, এত ক্ষুদ্রে এত জ্বালা কেন? কিসের এ জ্বালা?

কে জানে কিসের জ্বালা! কে বলিবে, এত ক্ষুদ্রে এত জ্বালা কেন? জ্বালায় জ্বলিয়া সংসারের যেদিকে চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই, সেই দিকেই আমারই মত জ্বালা ধরার—ঘূণ ধরার ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। দেখিতে পাই, জ্বালা বাড়িবার কারণ যথেষ্ট আছে, জ্বালা শান্তির কিছু আছে কি না—দেখিতে পাই না। যে দিন হইতে প্রাণে জ্বালা ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে কতবার আমা অপেক্ষা বেশীদিনের পুরাতন জ্বালাগ্রস্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—আমাদের এ জ্বালা কিসের? তাহারা যাহা বলে, তাহার অর্থ বুঝি না, ভাব পাই না, সুতরাং আমার প্রশ্নের সমাধান হয় না, বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না, আশা মিটে না। তাহারা বলে,—এ বিশাল বিশ্বে আসিয়া যাহা করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এত জ্বালা। নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া, বাসনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি নাই, সুতরাং আমার চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই, তাই সেই অনিয়ন্ত্রিত বাসনায়, সেই অগঠিত চরিত্রে যাহা করিয়াছি, তাহারই ফলে এত জ্বালা ঘটিতেছে। যতদিন না বাসনাগুলিকে নীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিব, যতদিন না সেই নিয়ন্ত্রিত বাসনার সাহায্যে আমার চরিত্র গড়িয়া তুলিব, ততদিন আমার কার্য্য এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল থাকিবে, আর এই জ্বালা—এই সহস্র বিষধরের বিষ জ্বালা—ভোগ করিতেই হইবে।—বিশেষতঃ মন দিয়া এই কথাগুলি শুনিয়াছি, শান্তির আশায়, অসহ্য জ্বালার হস্তে পরিত্রাণের আশায় এই কথাগুলি শুনিয়াছি; কিন্তু যাহা শুনিলাম,

তাহাও আমার কাছে, আবাব কতকগুলি নূতন প্রহেলিকা উপস্থিত করিল, তাহার অর্থ বুঝিলাম না, জ্বালা জুড়াইল না, বরং আবাব নূতন সন্দেহ—নূতন জ্বালা হৃদযে স্থান পাইল। কার্য্য কি? বাসনা কি? নীতি কি? চরিত্র গঠনই বা কি? আমি যাহা করিযাছি, তাহারই ফলে আমাব এ জ্বালা ভোগ হইতেছে। আমি কি করিয়াছি? পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপাবেব সংঘর্ষে পডিযা কলেব ন্যায আমাব দ্বাবা যে সকল পার্থিব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহাই কি আমাব কার্য্য? কে বলিল?—সে কার্য্য আমাব, তাহা কে বলিল? যখন জন্মিয়াছিলাম, তখন আমার কার্য্য কোথা? গর্ভে কোন কার্য্য ছিল কি? শবীর ও মন ছিল বটে; কিন্তু কার্য্য ছিল কি? কেহ বলে ছিল, কেহ বলে ছিল না। যাহাবা বলে ছিল না, তাহাদের সহিত কোন কথা নাই। যাহারা বলে ছিল, তাহাবা কেন বলে, বুঝি না। মন নিষ্ক্রিয নহে, শরীর অচল নহে, পূর্ব্ব জন্মেব কার্য্যের ফল বিনষ্ট হইবাব নহে, সুতবাং গর্ভেও কার্য্য নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্ম!—প্রতি পূর্ব্বজন্ম ধবিবা বিচার কবিতে গেলে, কেহ বলিতে পারে না—আমাব এ জন্মের পূর্ব্বে আর কয়টী জন্ম হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রকাব কেহ কেহ বলেন, ইহাই যদি আমার প্রথম মানব জন্ম হয, তবে ইহার পূর্ব্বে আমাব অন্যবিধ জন্ম চৌবাশী লক্ষবাব হইযা গিযাছে। এসব কথাও "যদিব" উপব স্থাপিত, সুতরাং মীমাংসা কোথায়? তাহাব পর চৌবাশী লক্ষবাব জন্ম ধবিলেও একটা আদি জন্ম—জন্ম—প্রথম জন্ম স্বীকাব কবিতে হয়, সে জন্মে আমাব আর পূর্ব্বজন্ম ছিল না, পূর্ব্বজন্মেব কার্য্য ছিল না, মননিষ্ক্রিয় এবং শবীব অচল ছিল। সে জন্মেব কার্য্য কিসেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হইযাছিল? কে বলিযা দিবে? আদিজন্ম স্বীকার না কবিলে চলে না। কারণ, যাহাবা বলে, চৌবাশী লক্ষবাব জন্মের পর মানব জন্ম লাভ হয়, তাহারাই বলে, শিব নিত্য, জীব নিত্য নহে। কাজেই বুঝি না, গর্ভাবস্থায় আমাব কার্য্য কিরূপ ছিল। কেহ বলেন, তুমি

ভাবিতেছ, তোমার এ জন্মের জ্বালা কেন ঘটিয়াছে; তাহার মীমাংসার জন্য তুমি আদি জন্ম ধরিতে যাও কেন? তোমার এ জন্মের পূর্ব্বে যে জন্ম হইয়াছিল, তাহারই কার্য্য ফলে তোমার এত জ্বালা ঘটিতেছে, ইহাই বিশ্বাস কর। বিশ্বাসই যদি করিতে হয়, তবে কারণানুসন্ধান করি কেন? একটী পূর্ব্বজন্মই বা ধরি কেন? শুদ্ধ বর্ত্তমান জন্মের কথা লইয়া বিচার করিলেও হয়। বিশ্বাস লইয়া কথা, বিশ্বাস কারণের উপর করিতে পারি, অকারণের উপরও করিতে পারি; কিন্তু সে বিশ্বাসই বা হয় না কেন? বিশ্বাস হয় না বলিয়াই এত প্রশ্ন, এত সন্দেহ, এত জ্বালা, আবার বিশ্বাসেরই বা মূর্ত্তি এত বিভিন্ন কেন? তোমরা দুই জনেই বিশ্বাসী; কিন্তু কৈ, তোমাদের দুই জনের বিশ্বাস একরূপ কৈ? তুমি কর্ম্মে বিশ্বাস কর, তিনি দৈবে বিশ্বাস করেন, আর উনি দৈব ও পুরুষাকার উভয়েই বিশ্বাস করেন। বিশ্বাসের একরূপ ভেদ কেন হয়? দেখিতেছি পাত্র বা আধার-ভেদেই বিশ্বাসের বিভিন্ন মূর্ত্তি ঘটে। তবে কি আধারের প্রকৃতির উপর বিশ্বাসের প্রকৃতি নির্ভর করে না? যদি তাহা না হয়, তবে কি? তোমরা কেহ কি তাহার উত্তর দিতে পার? আবার পূর্ব্বজন্মের কথা কার্য্যফলের কথা, তদ্ভাব সমন্বিত মনের কথা, আর তদনুযায়ী বিশ্বাসের কথা তুলিবে, তাহাতে কি হইবে? প্রমাণের সূক্ষ্মত্ব প্রতিপাদন কি তাহাতে হয়?

বুঝিলাম না, তোমার কার্য্যের কারণ কোথায়? যে যাহা বলে, সে নিজের বিশ্বাসানুসারে—বুদ্ধি অনুসারে বলিয়া থাকে। আমার ভাব অপরের প্রাণে আসিবে কেন? তৈল জলে মিশে না। এই উত্তর প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, অপরের মীমাংসা, অপরের সিদ্ধান্ত লইয়া নিজের তৃপ্তি হয় না, নিজের প্রাণে নিজে তর্ক-বিতর্ক করিয়া যতক্ষণ না স্থির করিতে পারিব, ততক্ষণ প্রাণের ক্ষোভ মিটিবে না, আশা পূরিবে না। এই জন্যই গ্রন্থকারে টীকাকারে ও ভাষ্যকারে মতভেদ দেখা যায়, গুরুশিষ্যে মতভেদ থাকে।

এই সকল ভাবিয়া নিজেই নিজের জ্বালাব কারণ খুঁজিতে লাগিলাম দেখিলাম, জন্মকালে আমার মন শবীব যে অবস্থায় ছিল, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আমাব জন্ম স্থানেব তন্মুহূর্ত্তের বাহ্য জগতের যে অবস্থা, তাহার সহিত এক সংঘর্ষ ঘটিল। এ সংর্ঘষণে আমাব শবীর ও মনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাতেই আমাব প্রথম পার্থিবকার্য্য সূচিত হইল, প্রথম মল মূত্র নিঃসাবণ ইচ্ছা, চেষ্টা ও ত্যাগ ক্ষমতা হইল, ক্ষুধাবোধ, খাদ্যাভাবে কষ্ট—কষ্টে ক্রন্দন পর্য্যন্ত হইল। জন্মিবামাত্র যাহার দেহ ও মনের উপব প্রকৃতি প্রভাবে এতটা পরিবর্ত্তন ঘটাইল, তাহার তখন নিজেব অবস্থা কি; সে কি নিজে একার্য্য করিল, না নৈসর্গিক-বলে তাহাকে করাইল? নৈসর্গিক প্রভাব যদি না হয় তবে কি বলিব,—তাহা জানি না, ভাবিয়া পাইনা। তাঁহাব নৈসর্গিক বস্তুর সহিত আমাব দেহ ও মনেব যতই ঘনিষ্ঠতা ও পবিচয় হইতে লাগিল, ততই আমার নানাবিধ জ্ঞান-ইন্দ্রিয-জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। এই জ্ঞান লাভে জীবের স্বাধীনতা কোথা; দেশ কাল পাত্র ভেদে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিভিন্নাকাব হয়। ইংবাজ সন্তান ইংবাজি শব্দ বুঝিতে পাবে, বাঙ্গালা শব্দ পারে না। এই ইন্দ্রিয-জ্ঞান নৈসর্গিব শিক্ষা ব্যতীত আব কি? ইন্দ্রিয-জ্ঞান হইতেই কার্য্য-শক্তিব বিকাশ হয. সুতবাং কার্য্য শক্তিও নৈসর্গিক প্রভাকেই নিযন্ত্রিত বলিতে বাধ্য। তাহাবপব ইচ্ছাব কথা—যাহা থাকাতে জীবকে স্বাধীনবলিযা বোধ হয়, সেই অপূর্ব্ব শক্তিব কথা।—ইচ্ছা মনেব কার্য্য, মনেই ইচ্ছাব প্রকাশ হয। জন্মকালে মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকে—ইচ্ছাব বিকাশও সেইরূপ হইযা থাকে। আমাব উৎপত্তিকালে পিতাব মাতাব মনেব অবস্থা যাহা ছিল, আমাব মনের অবস্থা কতকটা নির্ভব তাহাবই উপব কবে. (শবীবেব অবস্থা এই কাবণেব উপব যতটা নির্ভব কবে, মনেব অবস্থাও ততটাই নির্ভব কবে, তবে তর্ক স্থলে, ততটা স্বীকাব না কব, ক্ষতি নাই।) সুতরাং মনের বা শরীবেব গঠনের উপব আমাব স্বাধীন চেষ্টা কিছুই নাই। তাবপর Carlyleএর কথাটাও ঠিক অতিমাত্র সত্য—যেরূপ সমাজে জন্মগ্রহণ করা যায, চরিত্র গঠনেব মূলে সেই সমাজের সামাজিক

অবস্থার কার্য্যকারিতা দেখা যায়—সুতরাং যে সমাজে জন্মিলাম, সে সমাজের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা আমার ইচ্ছাগত নহে; সুতরাং তাহার সংস্পর্শে আমার যে মানসিক পরিবর্ত্তন বা শিক্ষা হইতে লাগিল, তাহাও আমার ইচ্ছাগত নহে। এইরূপে আমার অস্বাধীন অবস্থায় আমার ইচ্ছা-শক্তি যেরূপ গঠিত ও বিকশিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমার কোন ক্ষমতা দেখা গেল না। তাহার আরও সংক্ষেপ করিয়া ধরিলে, যে পরিবারে জন্মিলাম, সেই পরিবারের অবস্থা, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার আমাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলিল যে, আমি আমার অজ্ঞাতসারে ঠিক একটী ছাঁচের পুতুল হইতে লাগিলাম। আমার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শিক্ষা সবই সেই ছাঁচের ন্যায় হইল। এ ছাঁচ আমার ইচ্ছাগত নহে। অতএব প্রথমতঃ পিতামাতার শরীর ও মন হইতে প্রাপ্ত শরীর ও মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার সময় দেশকালের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের বশীভূত থাকিয়া, যে সমাজে জন্মিয়াছি, তাহার তদানীন্তন নিয়মাদির অধীনে পৈতৃক অবস্থা শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের ছাঁচে পড়িয়া আমি যে জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট হইলাম, তাহার পরিশুদ্ধতা. শ্রেষ্ঠতা বা মহত্ব সম্বন্ধে আমার কি বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা ছিল? সেইরূপে গঠিত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমি যে কার্য্য করিতে লাগিলাম, তাহা কি নৈসর্গিক প্রভাবের ফল নহে? এইরূপে অজ্ঞাত ছাঁচে ঢালা মন, ইচ্ছা—কার্য্যশক্তি লইয়া যাহা করিতে লাগিলাম, তাহা কি পরম পবিত্র, বিশুদ্ধ, "আমি" নামক জীবের কার্য্য? অথবা সেই "আমির" উপর কতকগুলি নৈসর্গিক প্রভাবের যৌগ ফল? কেহ বলিতে পার ইহার স্বরূপ কি? আমার ক্ষুধাবোধ হইলে কাঁদি—ইহা যেমন স্বাভাবিক, অর্থহীনতায় চুরি করাও তেমনি স্বাভাবিক নহে কেন? আমি যদি এমন কোন সমাজে জন্মিতাম যে, তাহাতে চুরি বলিয়া একটা কার্য্য কেহ জানে না, তাহা হইলে কি আমি চুরি শিখিতে পারিতাম? আমার সমাজে চুরি আছে, অবস্থার বশে শিক্ষার দোষে চুরি করিয়াছি, আবার

আমার সমাজেই চুরির শাস্তি আছে, চোরের প্রতি ঘৃণা আছে, তাই শাস্তিও পাইয়াছি, ঘৃণ্যও হইয়াছি; কিন্তু বল দেখি—আমার এই চুরি কার্য্যের জন্য দায়ী কে? আমি, না আমার সমাজ? বলিতে পার, আমার স্বাধীনতা এখানে কতটুকু? আমার সমাজে হিতাহিত জ্ঞানও আছে, আবার প্রলোভনও আছে। আমি হিত-জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলোভন দূর করিতে পারি, তবু করি না, বা করিতে পারি না। হিতজ্ঞান স্বত্বেও প্রলোভনে পড়ি, ইহার কি কোন কারণ নাই? তুমি হয়ত একটী ছোট কথা বলিয়া আমায় শান্ত করিবে যে—'কুশিক্ষা বা অশিক্ষা'। আমি যদি বলি—তোমার সুশিক্ষাই বা হয় কেন, আর আমারই বা অশিক্ষা হয় কেন? তাহার এমন কোন উত্তর দিতে পারিবে না যে, তাহা কেবলই আমার দোষে ঘটিয়াছে, আমার পৈতৃক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অন্ততঃ আমার পিতা মাতা তাহার জন্য দোষী নহেন। আবার সমাজের পক্ষ হইতে, পিতা মাতার পক্ষ হইতে, এগুলি বিচার করিলে এইরূপেই দেখিতে পাইব যে, পিতা মাতাও আমারই মত ঘটনার দাস, সমাজও ঘটনাময়। এখন যদি স্থির করা যায় যে, এই ঘটনাগুলি ঘটায় কে? আমার মতে যাঁহার পৃথিবী—তাঁহারই এ ঘটনা। সেই সর্ব্বঘটে বিরাজমান অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে যেমন সৌরজগৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে, তেমনি তুমি আমি তত্তুলনায় কীটাদপি কীট হইলেও তোমার আমার দৈনিক—দৈনিক কেন, প্রতিক্ষণের কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সৌরজগতে সমস্ত শৃঙ্খলা সত্ত্বে যেমন সময়ে সময়ে গ্রহ-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যদি তাহাকে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা বল, তবে এই জীবের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে যে পাপ-পুণ্য কল্পনা, ইহাও সেইরূপ বিশৃঙ্খলা বলিতে পার। এই জন্যই গীতাকার পার্থিব-ব্যাপারে আকুলিত, মায়ামোহিত, পাপ-পুণ্যভীত জীবকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন;—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ গীতা ২।২।

মহানাটককারও রাবণের ন্যায় প্রসিদ্ধ অকর্ম্মকৃৎ পাপাত্মার মুখ দিয়া পাপীদিগের সান্ত্বনার জন্য বলাইয়াছেন;—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এই অপূর্ব্ব নির্ভরতা না থাকিলে জীব এতদিন কি হইত কে জানে? যে ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীব যে কার্য্য করিতে পারে বা তাহার ফলভাগী হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করাই পাগ্‌লামী নহে কি?—এই নির্ভরতা যেদিন প্রতি জীবের হৃদয়ে সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত হইবে, সেই দিন তাহাদের "প্রাণের জ্বালা" দূর হইবে, কর্ম্মভয় ঘুচিবে—কর্ম্ম বন্ধনও ঘুচিবে। ভক্তি ভিন্ন নির্ভরতা আসে না, ভগবান্ না দিলে ভগবদ্ভক্তিও জাগে না। সাধনায় ভক্তি হয়, কিন্তু ভগবান্ না দয়া করিলে সাধনা পথে অগ্রসর হয় কে? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কে?

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

"সুশীল।"

প্রথম পল্লব।

বিমল বিভাতী বায়,
মন্দ আন্দোলিয়া কায়,
ধীরে ধীরে কুঞ্জবনে করিতেছে কেলি
পাখীগুলি শাখী-পরে,
মনোহারীতান ধরে,
গাহিতেছে নানারবে মধুর কাকলী;

থরে থরে ফুল কুল,
ধরায় নাহিক তুল,
সৌরভ অমিয়া ঢেলে করে মন চুরি,
কুসুম কলিকা বালা,
হের ওই করে খেলা,
মন্দ মন্দ সমীরণে উঠিবে মুঞ্জরি।

মনোরম কুঞ্জবন,
মনোরম নিকেতন,
আহা কি সুরম্য হর্ম্ম্য নয়ন শোভন!
সুসঙ্গীত গৃহ সব,
মরি কিবা ধব্ ধব্! [হন;
আলেখ্য শোভিছে তায় মন বিমো-
কারুকার্য্য বিনির্ম্মিত,
মখমলে বিমণ্ডিত, [সারি,
সাজান আসনাবলী শোভে সারি
প্রতিবিম্ব ধরিবারে,
সুন্দর দেউল পরে,
সুন্দর মুকুর রাজে, প্রতিবিম্ব ধারী।
সমুখেতে সরোবর,
হের স্বচ্ছ মনোহর,
দিয়াছে নিকুঞ্জবনে অপরূপ সাজ;
ফুটেছে নলিনী ফুল,
তায় ছোটে অলিকুল,
মানব সুন্দরী সবে পাইতেছে লাজ;
রাজহংস করে কেলি,
সন্তরিছে মীনাবলী,
মলয়া হিল্লোলে নাচে সরসী সুন্দরী,
তীর'পরে ঝাউ গাছ,
সারি সারি চাঁপা গাছ,
করিয়াছে সরোবরে মন মুগ্ধকারী।
এ হেন নিকুঞ্জ বনে,
খেলে শিশু ফুল্লমনে,
পাছেপাছে ফিরিতেছে দাসদাসীগণ,
কভু হাসে, কভু কাঁদে,
দিনমানে চায় চাঁদে,
কভু বা গম্ভীর ভাবে যোগে নিমগন
ফুল্ল নবনীত কায়,
অলঙ্কার শোভা পায়,
কটিদেশে কটিবন্ধ, গলে হেম হার,
মাথে হের বাঁধা চূড়া,
যেন বৃন্দাবন চূড়া, [ভার।
হেলে দুলে করে খেলা নাহি চিন্তা-
অতীব সুজন পিতা,
তায় গুণবতী মাতা,
সযতনে করিতেছে সন্তান পালন;
প্রফুল্লিত শিশু চিত,
তায় অতি সুশোভিত,
প্রফুল্লিত পিতা মাতা রহে অনুক্ষণ,
প্রফুল্ল শিশু বালকে,
"সুশীল" বলিয়া ডাকে,
প্রফুল্ল সুশীল শোভে প্রফুল্লিত মনে;
সরসী লহরী সম,
হের শোভা মনোরম,
হাসির ফোয়ারা ছোটে শিশুর বদনে
এইরূপে করে খেলা,
বাড়িছে নবীন বেলা,
সুমধুর বাল্যকাল একে একে গত;
বাল্য সনে ধূলা খেলা,
হাসির সে মহালীলা,
হতেছে বিলীন ক্রমে কৈশোর আগত
কৈশোরেতে অধ্যয়ন,
করে শিশু প্রাণপণ,

প্রতিভা কানন মাঝে ক্রমে অগ্রসর
জ্ঞান-পুষ্প বিশোভক,
প্রদানিছে নবালোক,
নবালোকে আলোকিত সুশীল সুন্দর
বিদ্যালয় বিদ্যাভ্যাসে,
সুশীলের বার মাস,
সর্ব্বোচ্চ প্রধান স্থান আছে অধিকার
সুশীল সুবোধ অতি,
তার মাতা গুণবতী,
সাজায়েছে তারে দিয়া নানা অলঙ্কার
লভিবারে জ্ঞান রত্ন,
কৈশোরে সদাই যত্ন,
সদাই প্রমত্ত থাকে জ্ঞান অন্বেষণে;
বিদ্যা শিক্ষা নানা মত,
করিতেছে অবিরত,
বিজন সাহিত্য-সেবা বিবিধ বিধানে
পরীক্ষা মন্দিরে যায়,
কভু না বিফল হয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না সদা তা'র প্রতি
যে কর্ম্মে সুশীল ধায়,
কৃতকার্য্য সুনিশ্চয়,
জ্ঞানমার্গে বিশেষত অতি দ্রুতগতি,
ধনীর সন্তান বটে,
এ হেন কভু না ঘটে,
দীনের সন্তান প্রতি করা অবহেলা,
সকলেরে মিষ্টভাষে,
সুশীল সদাই তোষে,
সরল সবা'র প্রতি নাহি কোন ছলা,
বিদ্যা শিক্ষা অধ্যয়নে,
কৈশোর কাটিল ক্রমে,
সরস যৌবন আসে মৃদু মন্দ গতি;
যেন কোন দেব বালা,
করে লয়ে ফুল মালা,
ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সুশীলের প্রতি,
লাবণ্য উথলে যায়,
গণ্ড গোলাপের প্রায়,
সুশীল যৌবন রাগে অতি মনোরম;
শুভ পরিণয় তরে,
পিতা মাতা যত্ন করে,
সুন্দরী বালিকা খোঁজে ফুলবালা সম।
যৌবনের সনে সনে,
সুখলিপ্সা মনে মনে, [প্রাণ,
থেকে থেকে জেগে উঠে সুশীলের
তীব্র বিষাদের রেখা,
দিয়াছে আননে দেখা,
চিন্তা কুহকিনী ঘন ঢেকেছে বদনে;
সে সুষমা নাহি আর,
শুকায়েছে ফুল হার,
তাই যুবা বহুক্ষণ নিভৃতে কাটায়;
যখন সমুখে আসে,
হাসিতে নয়ান ভাসে, [জানায়।
কিন্তু সে যে বৃথা হাসি আঁখিতে

[ক্রমশঃ]

কিরণ।

সুধাংশু।

[১]

শ্যাম তৃণ পূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তবেব এক প্রান্তে, মৃদু প্রবাহিনী রজতসলিলা চিত্রাব তীরে, ঘন বনান্তবালে ত্রিবাটী গ্রাম। বাধিকা-প্রসাদ ত্রিবাটীর জমিদার। কথিত আছে, এক সময়ে তাঁহার পরাক্রমে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করিত'।

বাধিকাপ্রসাদের দুইটী সন্তান। প্রথম—কন্যা, নাম স্নেহ; দ্বিতীয়—পুত্র, নাম শশীশেখর। স্নেহের, কনিষ্ঠেব প্রতি আন্তরিক স্নেহ; সেই স্নেহেব বশীভূত হইয়াই স্নেহ অনেক সময় শ্বশুরবাটী যাইতে চাহে না; শশীশেখর সেটা বুঝিতে পারে, সুতরাং জননী অপেক্ষা ভগিনীর নিকট সমধিক বাধ্য।

শশীশেখর কিশোর-যুবা, সুন্দর, বলিষ্ঠ; অদ্যাপি অবিবাহিত। স্নেহেব সেটা ভাল লাগে না, তাহাই ভ্রাতাব বিবাহের জন্য মধ্যে মধ্যে পিতা মাতার নিকটে অনেক অনুনয় করিয়া থাকে।

ভ্রাতা, ভগিনীব কেবল এই কার্য্যে বড় সন্তুষ্ট নহে, তবে পিতা মাতা, বিবাহের কথায় ততটা কর্ণপাত করেন না, সুতবাং ভ্রাতার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিবাব বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

রাধিকাপ্রসাদ বড় একজন জমিদার, তাঁহাব একান্ত ইচ্ছা পুত্রের বিবাহে একটা বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবেন, সুতরাং কন্যার কথায় ভাল মন্দ কিছুই বলেন না।

[২]

'ওগো! আমায় ছেড়ে দাও'——

চিত্রার তীবে সায়াহ্নেব সুমন্দ পবনে কাননাভ্যন্তর হইতে একটী যুবকের শ্রবণ পথে এই কয়টী কথা প্রবেশ করিল—স্বরটী বড় কোমল ও করুণ—যুবা দ্রুতবেগে কানন মধ্যে প্রবেশ করিল।

যুবা কানন পথে স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল এবং কিয়দ্দূব গমন

করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে অদূরে একটী দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটী অনুমান চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বালিকার মস্তকে ধানের একটা বোঝা। বালিকা বহু আয়াসেও পুরুষটীর হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিতে না পারিয়া, এক একবার ইতস্ততঃ সকরুণ দৃষ্টিপাত এবং পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যুবা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল।

যে পুরুষটী বালিকার হস্ত ধারণ করিয়াছিল সে যুবককে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল এবং ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! এখানে কি মনে করে?"

বালিকার মস্তক হইতে সহসা ধানের বোঝা ভূপতিত হইল, এবং শত ছিন্ন মলিন বসন দ্বারা সে স্বীয় অঙ্গ আবৃত করিবার প্রয়াস পাইল—কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল—প্রথমতঃ কিশোরী বালিকার বিকাশোন্মুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করিবার ততটা আয়তন সে বস্ত্রের নাই; দ্বিতীয়তঃ সেই কোমলাঙ্গের তরল মেঘাচ্ছন্ন শশাঙ্কদ্যুতি কিছুতেই লুকাইবার নহে। যুবার কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, তাহার তীব্র কটাক্ষ সেই পুরুষের উপর পতিত।

পুরুষটী বালিকার হস্ত মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সুতরাং অবসর পাইয়া বালিকা পলাইবার চেষ্টা করিল, পুরুষটী পুনরায় তাহার হস্ত ধারণ করিল, যুবক গম্ভীর স্বরে বনভূমি কাঁপাইয়া বলিল— "রতন! বালিকার হাত ছাড়িয়া দাও এবং ব্যাপার কি আমাকে বল।"

রতন বালিকার হাত ছাড়িয়া দিল, এবং বলিল, "বাবু! এ মেয়েটা চোর, এ রোজ ধান চুরি করে নিয়ে যায়, একে ধরিচি, এই দেখুন না, এক বোঝা ধান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি একে আজ কাছারিতে ধরে নিয়ে যাব—নায়েবের হুকুম।"

যুবক বলিল—আমার হুকুম তুমি এই দণ্ডেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তোমার যাহা ক্ষতি হইয়াছে আমি দায়ী।

রন্তন আর দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বালিকা দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

[৩]

যুবকের নাম শশীশেখর, রতন জনৈক গ্রাম্য মণ্ডল।

বালিকা শশীশেখরকে চিনিয়াছে, সুতরাং লজ্জায় ও অভিমানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

শশীশেখর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আপনি কে? আপনার বাড়ী কোথায়? কি জন্য এই ধানের বোঝা মাথায় করিয়া যাইতেছিলেন?"

টপ্ টপ্ করিয়া বালিকার গণ্ড বহিয়া অশ্রুবিন্দু ভূতলে পড়িল; এত মধুর সম্ভাষণ তাহার জীবনে বুঝি এই প্রথম—কে জানে শেষ কি না।

বালিকা কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ধানের বোঝা আপনার মাথায় তুলিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল—শশীশেখর নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, ত্রিবাটীতে এ বালিকা কে? সে যে কাঙ্গালিনী, কিন্তু এত রূপ ত কোন দেব কন্যারও নাই।

বালিকা কিয়দ্দূর যাইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র একটী আম্র-কানন মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে আসিল, ধীরে ধীরে কুটীরের দ্বার খুলিল—শশীশেখর প্রাঙ্গনে স্থাণুবৎ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বালিকা তাহা দেখিল—কিন্তু কিছু বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, বালিকা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারেই একপার্শ্বে ধানের বোঝা নামাইল—অল্প একটু শব্দ হইল, সেই শব্দে কে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, কে—আ—আ—পু—প—এ—লি—বালিকা 'হঁ্যা' বলিয়া দ্রুত প্রদীপ জ্বালিল—শশীশেখর সকল শুনিল এবং প্রাঙ্গন পার হইয়া দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্প কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিল এবং

শশীশেখরকে বলিল,—"আপনি আজ আমাকে যখন রঞ্জনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন আর একটু কষ্ট করিয়া কুটির মধ্যে আগমন করুন—আমার মা বোধ হয়, আর বাঁচিবেন না!"

শশীশেখর পুষ্পের সহিত কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। পুষ্পের মাতা যথার্থই মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

পুষ্প জননীর কাণের কাছে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"মা শশীশেখর—"

পুষ্পের জননী অতি কষ্টে "তো—মা—রই"—এই কয়টী কথা বলিয়াই চিরনিদ্রাভিভূতা হইল, পুষ্প শশীশেখরের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিল—শশীশেখর তাহার অর্থ বুঝিল, এবং বৃদ্ধার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পুষ্পের হস্ত ধরিয়া বলিল—"পুষ্প শশীশেখর তোমারই—"

পুষ্প ও শশীশেখর উভয়ে মিলিয়া মৃতের সৎকার করিল—রাত্রি শেষে উভয়ের অনেক কথা হইল, পরদিন প্রত্যূষে শশীশেখর গৃহে ফিরিল। পুষ্প দরিদ্রের কন্যা বলিয়া এত বয়সেও তাহার বিবাহ হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

সমালোচনা ও মতামত।

তিতুমীর—বা নারিকেল বেড়িয়ার লড়াই। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কর্তৃক সঙ্কলিত। পুস্তকখানি তিতুর জীবনী স্থায়ী হইবার সম্ভাবনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে উপেক্ষিত হইয়াও বেহারী বাবুর কৃপায় তিতুর জীবনী বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ীত্ব লাভ করিল দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলাম। তিতুর জীবনী অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে দেখিবার শিখিবার অনেক জিনিস

আছে। ইহার মূল্য অতি সামান্য ।/০ আনা মাত্র। আশা করি নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গদেশে তিতুর সংক্ষিপ্ত জীবনী অনাদৃত হইবে না। দেবত্বে পশুত্বে মিশিয়া লোকের কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা স্থিরচিত্তে দৃঢ়দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারিলে লোকের জ্ঞানের উন্মেষনা হয়, চৈতন্যের উদ্দীপনা হয়।

বসন্ত—গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মজুমদার প্রণীত; ক্যাকুশিয়ালী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার ক্রমেই বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত হইয়া উঠিতেছেন, ক্রমেই তাহার চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্তগত "বসন্ত" পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা সাধারণে "বসন্তকে" অদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নবীন কুসুম ও সারদীয়াঞ্জলি—দু'খানি "কবিতা ও গান" সম্বলিত পুস্তিকা। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার নূতন কবি। চর্চ্চা রাখিলে উন্নতি হইতে পারে—হস্তগত পুস্তিকা দুইখানি পড়িয়া আমরা সে আশা করিতে পারি। মধ্যে মধ্যে দুই একটী কবিতায় কিছু কিছু কবিত্ব আছে। গ্রন্থকার উৎসাহ পাইবার পাত্র। পুস্তক দুইখানির মূল্য যথাক্রমে ।০ চারি আনা ও /০ এক আনা মাত্র।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে।"

৪র্থ খণ্ড। } পৌষ, ১৩০৪ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

ফুল।

বহুদিন বিরহের পরে
মিলনের অপূর্ব্ব আবেশে,
দুইজনে আঁখি জলে ভেসে,
জানায় রে, যে ব্যথা অন্তরে!
সেই মধু-মাখা অশ্রু-নীর,
জমে যায় প্রকৃতির কোলে,
নিত্য তা'ই উষার হিল্লোলে,
ফুল রূপে ফুটে অবনীর,
বাড়ায় রে, সৌন্দর্য্য অপার!
তা'ই ফুল মধুর আধার।

শ্রীসারদাপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

হরি-নাম।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

আপত্য রহিল বিশ্বাস,—বহু সাধনে বিশ্বাস জন্মে। ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, জানতে অজানতে হরি-নাম লইলে মুক্ত হয়, এ কথার স্বার্থকতা কোথায়? বিশ্বাসের সহিত স্বেচ্ছায় হরি-নাম করিলে মুক্তি হইতে পারে, এ কথা বরং সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাস নাই—একবার হরি-নাম করিলে তাহাতে কি ফল?

যদি কোন ব্যক্তি আজন্ম ঈশ্বর-দ্বেষী হইয়া জীবন কাটাইয়া থাকে, কবে একদিন হরি-নাম বলিয়াছিল, তাহার কি ফল ফলিবে? সেইরূপ জীবন—একবার কল্পনা করিয়া দেখা যা'ক। যতদূর অবিশ্বাস জীবনে থাকুক, যতদূর মনের ভিতর দৃঢ়ীকৃত করিয়াছিল—যে মৃত্যুর পর সকলই ফুরাইয়া যাইবে, ঈশ্বর নাই, শাস্ত্র-শাসন—বাক্য মাত্র, মরণকালে সে জ্ঞান প্রায়ই বড় দৃঢ় থাকে না, সন্দেহ চুপি চুপি বলে যে মৃত্যুর পর বা যমরাজের রাজ্যে জীবনের হিসাব দিতে যাইতে হয়; সেই মহাভয়ের সময় যে ধর্ম্মফল জনিত ভয় পায় না, এমন ব্যক্তি কল্পনা করা যায় না। সেই মহাভীত ব্যক্তি জীবন সমালোচনা করিয়া দেখে যে, সমস্ত অন্ধকারময়—পাপপূর্ণ, কেবল একটী স্থান উজ্জ্বল রহিয়াছে,—একদিন হরি বলিয়াছে। হরি-নামের গুণে হৃদয়ে বিশ্বাস আসিল। মহাভয়ে আর উপায় নাই, সেই একবার হরি-নামেই আশ্রয়, আর আশ্রয় নাই। নামের গুণে বিশ্বাস, ও সেই বিশ্বাসে হরি-নামে অনন্ত ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

কর্ম্মক্ষয় ভিন্ন মুক্তি নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নির্ব্বাসনা না হই-বেন, তাঁহার চিত্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরে সংলগ্ন থাকিতে পারে না। কাশীতে মরিলে শিব হয়, একজন মহাপুরুষের নিকট শুনি-য়াছি, তিনি কাশীধামে ভাব-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, মনিকর্ণিকার

ঘাটে মহাশ্মশানে, মহাদেব জীবকে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস হয়, কাশীর মাহাত্ম্যে কাশীধামে মৃত্যু হইলে শিবত্ব লাভ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথা আছে—মুক্তি হইবে সত্য, শিবত্ব লাভ হইবে সত্য; কিন্তু কালভৈরবের যাঁতায় নিষ্পেষিত হইয়া কর্ম্ম-ক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হইবে না। ঈশ্বর লাভ নিশ্চয় কঠিন, কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত হয় না। হরি-নামেও কর্ম্মক্ষয় হওয়া আবশ্যক, নতুবা কিরূপে সে ব্যক্তি পরম-পদ লাভ করিবে? এ আপত্য যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন—বার বার সংসারে তাড়িত না হইয়া কাহারও সংসার বাসনা দূর হয় না। আমরা যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি—যে ব্যক্তির প্রতি তুষানল বা তপ্তঘৃত পান ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সংসার বাসনা তখন মলিন সন্দেহ নাই, মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া উপায় অনুসন্ধান করিতেছে, উপায় পাইল, ধীরে ধীরে কর্ম্ম-ক্ষয় হইতে লাগিল, যখনই সংসার বাসনা উদয় হয়, লোকের তাড়না মনে পড়ে, মহাপুরুষকে মনে পড়ে, হরি-নাম মনে পড়ে, আর সংসার তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হরির কৃপায় কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া যায়। আমরা অপর দৃষ্টান্তে বলিয়াছি—সে জীবনে একবার হরি-নাম করিয়াছিল। মুমূর্ষুর স্মরণ হইল, মৃত্যু যাতনায়, আর কালভৈরবের যাঁতার পেষনে, এরূপ তীব্র অবস্থায় মুহূর্ত্ত মধ্যে কোটী জন্মের কার্য্য হইয়া যায়। এই স্থলে আপত্য হইতে পারে যে, হরি-নাম করিবার উপযুক্ত হইয়া হরি-নাম করিলে তবে ফল হয়। এ কথা সত্য হইলেও হরি-নামের গুণ গেল না। সকলই অবস্থা-সাপেক্ষ নিশ্চয়। মনুষ্য জন্ম একটী অবস্থা, যথায় হরি-নাম হয়, এমন স্থলে জন্ম দ্বিতীয় অবস্থা, যে জাতি হরি-নাম করে, তাহার মধ্যে বাস করা তৃতীয় অবস্থা, হরি-নাম শেখা চতুর্থ অবস্থা, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নাম লইবার অবসরে পঞ্চম অবস্থা। এ সকল অবস্থা কেহ গড়িতে পারে না, ভাগ্যোদয় ব্যতীত এ সব অবস্থার সম্ভাবনা নাই। নিম্ন যোনি ভ্রমণ, নানাস্থানে জন্মগ্রহণ, নানা অবস্থায় জীবন

যাপনের পর যিনি একবার হরি-নামে মন না দিতে চান, এত কষ্টেও যার ঈশ্বর দুরারাধ্য—এ ভাবের স্বার্থকতা না হইয়াছে, তাহারা বল্মীক-রাশির মধ্যে বসিয়া কোটী কল্প জপ করুন—যতদিন ঈশ্বর দুরারাধ্য ভাবের তৃপ্তি না জন্মায়, ততদিন ও তজ্জন্য জপ করিতে থাকুন। কিন্তু যাহাদের হরি-নামে বিশ্বাস, তাহারা হরি-নাম করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ সকল যুক্তিদ্বারা যাহাদের মনে তৃপ্তি না জন্মায়, তিনিও সত্য বলেন, ভগবান্ দুরারাধ্য হউন, বা না হউন, আমরা দুরারাধ্য। কল্পনা করুন, ভগবান্ আসিয়া আরাধনা করিতেছেন, "এস আমার কাছে এস, কেন ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছ? বারবার দেখিতেছ যাহা করিতেছ তাহা যন্ত্রণা মাত্র। তবে আর কেন, আমার কাছে এস, তোমায় পরম শান্তি দিব।" এ কথায় কি আমরা ভুলি? দুরারাধ্য বিষয়-জড়িত চিত্ত এ আরাধনায় প্রসন্ন হয় না। ইন্দ্রিয়েরা তাহাকে বলিতেছে, এই যে সুখ, এই যে আনন্দ, এই সকল পাইবার চেষ্টা কর, বারবার চেষ্টা বিফল হইতেছে, তাহাতে কি আসিয়া গেল, পাইলে ত সুখ হইবে, বহু যত্নে মাকাল ফল পাইলাম, ব্যস্ত হইয়া কামড়াইয়া দেখি তিক্ত, মজ্জা বিষ্ঠাপূর্ণ। এটা কেমন করিয়া তিক্ত হইয়াছে—অন্য ফলের চেষ্টা করি; বারবার মাকাল ফল পাইয়া নিরাশা আসিল না, মন ক্লান্ত হইল না, ইন্দ্রিয়েরা বারবার উত্তেজনা করিতেছে, দুরারাধ্য চিত্ত প্রসন্ন হইল না, এ কথাটী আমার জীবনে প্রত্যক্ষ। পরমহংসদেবকে কেহ অবতার বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, অনেকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁর নিকট যে যতক্ষণ থাকিত, সে সময়ে তাহাদেরই মধ্যে জীবন্মুক্তাবস্থা অনেকেরি হইত। তিনি কখন কখন বলিতেন, "আমি কল্পতরু হইয়াছি কি চাও বল?" কিন্তু বাসনা জড়িত মন সে সময়ে নির্ব্বাসনা হইত, মনের কোন প্রার্থনা থাকিত না, এরূপ অবস্থা বারবার হইয়াছে, আমারও হইয়াছিল; তথাপি তিনি চক্ষের জল ফেলিয়া বলিতেন, "তুমি কেন আমার

কাছে এস না? অনুরোধ করি তিনটী দিন এস।” দুরারাধ্য চিত্ত যাইতে চাহিত না। তিনিই আসিতেন, যে সময়ে সাবকাশ সেই সময় আসিতেন। আনন্দ—বাটীতে বুঝিতাম, তথাপি তাহাব সঙ্গ লিপ্সা জন্মিলনা, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুভব হয়, যে মহাপুরুব বাক্য সত্য, হস্তস্থিত আমলকীর ন্যায়—ঈশ্বব আমাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আমরা তাঁহাকে চাহিনা বলিয়া কাছে আসিতে পারেন না। একজন মুসলমান সাধু ঈশ্বর লাভেব পর বলিয়া ছিলেন যে, “হে ভগবান! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাহা আমি চল্লিস বৎসরে অনুভব করিতে পারি নাই।” ঈশ্বব দুরাবাধ্য বলিয়া তাঁহাকে পাই নাই এরূপ নয়, আমরাই দুবারাধ্য—বহু আরাধনাব প্রসন্ন হই না—তাহাকে দেখিতে চাহিনা, তাঁহার কথা শুনিতে চাহি না। মালিনীর মালঞ্চে কিরূপে মেছনী যাইয়া নিদ্রা যাইবে? অনবরত ফুলের সৌরভ—মাছের আঁষ্টে গন্ধ নাই, নিদ্রা হওয়া অসম্ভব। যদি কোনও মনুষ্য উচ্চ-পদে অভিষিক্ত হয়, তাহাদেব মনে মনে প্রায়ই বাসনা যে সমস্ত নিম্নস্থ ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাস ভাবে থাকে—ইচ্ছায বা অনিচ্ছায় তাহার নিকট উপস্থিত থাকে, গোলামী করে, ভগবানেব স্বভাব সেরূপ নহে, তিনি গোলামী চান না। পবমহংসদেব বলিতেন—“ভগবান খেলুড়ে—তিনি খেলা করিতে ভালবাসেন,” যেমন রাখালেব সহিত শ্রীকৃষ্ণ, যেমন আমাদেব সহিত রামকৃষ্ণ পবমহংস। ভগবান গোলামী চান না। স্বেচ্ছায় যে তাঁহার উপাসনা করিবে, যে নিজেব আনন্দের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিবে, সেই উপাসনা তাঁহাব প্রিয়। প্রিয় ভক্তের নিমিত্ত, তাঁর নিমিত্ত নয়। আনন্দময় আপনাকে বিলাইয়া দিবেন এই নিমিত্ত প্রিয়, তাঁর আনন্দের নিমিত্ত নয়, তিনি আনন্দময়। যদি মানব জীবনে মহাখেদের কথা কিছু থাকে, তাহা এই—যে উপাসনা করিতে সক্ষম হইয়া উপাস্য ব্যক্তিব উপাসনা করিল না, মৃত্তিকার শরীর ভাল বাসিলাম, আমার অন্তরাত্মা ভগবানকে ভাল বাসিলাম না, আজীবন কি করিলাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না, মুখে বলি আনন্দ চাই, কিন্তু আনন্দের স্বরূপ দেখিলাম না।

আপত্য হইতে পারে যে, যদি একবার হরিনামে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যে ব্যক্তি আজন্ম সর্ব্বাঙ্গ হরি-নামাঙ্কিত করিল, তাহার ফল ফলিল না কেন ? উত্তর এই যে ভাবের ঘরে চুরি, ভাবের দ্বারা লাভ হয়। হরি-নাম ভ্রান্তে অভ্রান্তে জানতে অজানতে ফলপ্রদ হয় সত্য। আমাদের সকল দৃষ্টান্তেই প্রকাশ হইতেছে যে লাভ ভাবের দ্বারাই। এস্থলে সেই ভাবের ঘরে চুরি। যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে সেই সরিষাকে ভূতে পাইয়াছে। হরি-নাম ফলিবে, কাশীতে মৃত্যু হইবে, কিন্তু কাল ভৈরবের যাঁতায় পেষিত হওয়া চাই। এই কপট, যার ভাবের ঘরে চুরি, সে সংসারে দিন দিন উন্নতি করিয়াছে, টাকা সুদে খাটিতেছে, শোক তাপ কিছুই পায় নাই, বৈষ্ণবীর সহিত দিব্য সদ্ভাব, সংসারের তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই; সুতরাং হরি-নামে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এক প্রয়োজন লোক দেখান—সেটা হয়। আর হরি-নামে আবশ্যক কি? কল্প-তরু হরি-নামের তলায় যে ফল চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে। ভবরোগ এখনও অনুভব হয় নাই, যন্ত্রণা হয় বটে। কিন্তু যে, সে যন্ত্রণা ঘোর নরক যন্ত্রণার প্রারম্ভ তা সে জানে না। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পরকাল চিন্তা করে না। সুতরাং হরি-নামও ফলে না। বিশেষরূপে যখন যম-যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকিবে, বৈষ্ণবীকে আর দেখিতে পাইবে না। মহিষের গলঘণ্টা ধ্বনি কর্ণ বধির করিযাছে, বৈষ্ণবীর কথা আর শোনা যায় না, সে সময়ে সে ভাব চোরের চুরি বিদ্যা আর প্রবল থাকিবে না। যদি ভ্রান্ত হইত, তাহার ভ্রান্তি ছুটিত, কি এ চোর। ভাবের ঘরে চুরি অপেক্ষা চুরি নাই, এরূপ মহাপাপও নাই, সম্ভবত সে চোরও নামের আশ্রয় লইবে, আশ্রয় লইলে যে ফল-প্রাপ্তি হইবে, তার আর সন্দেহ কি?

আবার আপত্য অনেকেই হরি-নাম করে, সকলেই কি ফল পাইবে? উত্তর—যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিতে হয়, যে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া আপত্তিকার ঈশ্বর দুরারাধ্য জানিয়াছেন, কঠিন সাধনে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে হরি-নাম ফলপ্রদ হইবে। সাংসারিক নিয়ম স্বতন্ত্র হইতে পারে, সংসারে দোষের মার্জ্জনা না থাকিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর রাজ্যের দরজায় উল্টা চাবি। পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ, সাধু মুখে হরি-নাম শ্রবণ, পবিত্র হরি-নাম উচ্চারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা সাধারণ যোগাযোগ নহে, যখন যোগাযোগ হইয়াছে, বারুদ প্রস্তুত রহিয়াছে, রৌদ্রে শুকাইয়াছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতনেই মহাবেগে জ্বলিয়া যাইবে, জলস্থল কম্পিত করিয়া, অম্বু আলোড়িত করিয়া ঘোর শব্দে দগ্ধ হইয়া যাইবে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গহরি-নামে, পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত পাপরূপ বারুদরাশী মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

কেহ এ সকল কথা, ভক্তির কথা বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। যাঁহারা ভক্তি বিদ্বেষী তাঁহারা মনে করেন—জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ। দুর্ব্বলচিত্ত, তর্ক যুক্তি অক্ষমচিত্ত, বিচারে পরাঙ্মুখ চিত্ত ভক্তি অবলম্বন করে। জ্ঞানসূর্য্যের কিরণ তাহাদের অসহ্য। এরূপ ভক্তি-নিন্দুকের জ্ঞানগর্ব্ব অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর নাই। বস্তু-জ্ঞানে ভক্তি হয়। গোলাপ ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিতেছে, নয়ন রঞ্জন করিতেছে, আনন্দ জন্মিল, গোলাপদর্শক যুক্তি করিল না সত্য, কিন্তু যুক্তির কার্য্য তাহাতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি গোলাপ না দেখিয়া গোলাপের সুন্দর রং শুনিয়া ও সৌরভের কথা পুস্তকে উল্লেখ দেখিয়া গোলাপ আনন্দপ্রদ হয় কি না, এই বিষয় বিচার করিতে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, ভক্তি-নিন্দুক জ্ঞানের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিয়াছে, ভক্তি আসিবে না, এতদূর ভ্রমাত্মক কথা কখনও অক্ষরে গঠিত হয় নাই। সকলে বলে—বিবেকানন্দ জ্ঞান প্রচার করিতেছেন, কিন্তু তাঁর মুখে বারবার শুনিবে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার প্রতি তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা যে, তিনি বহু ভাষাজ্ঞ হইয়াও তাহার প্রতি-কথা জানেন না। শ্রদ্ধা কথা লইয়া বৈদান্তিক বিবেকানন্দ উন্মত্ত—ভক্তরা যেরূপ উন্মাদ হইয়া থাকে—সেইরূপ উন্মাদ। ভক্তরা যেরূপ বলেন, তিনিও বলেন, 'শ্রদ্ধাবলে নরত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব হয়, শ্রদ্ধাই সার, যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ।' এস্থলে কূট-

তার্কিক বিজয়ী বিবেকানন্দের তর্ক নাই, কেবল বলেন শ্রদ্ধা। কথার অর্থ বলিতে সক্ষম নন, বলেন শ্রদ্ধা। জ্ঞান-গর্ব্বিত ব্যক্তির এই শ্রদ্ধাবান্ মহাপুরুষের শ্রদ্ধার উপর শ্রদ্ধা রাখিলে আর জ্ঞান-ভক্তি লইয়া বিবাদ থাকে না। তিনি ভক্তকে পরম জ্ঞানী জানিয়া তাঁহার পদানত হইবেন।

একটী গল্প বলিয়া আমার প্রবন্ধটী শেষ করি। কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শনের নিমিত্ত একজন মহাপুরুষ প্রচ্ছন্নভাবে নিত্য আসিতেন, কোন ব্যক্তি, কিরূপে তাঁহাকে ধরা যায়—ভাবিতে লাগিলেন, একজন ঋষি উপদেশ দিলেন, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে কাশীপ্রাপ্ত ব্যক্তির শবদেহ একটী ফেলিযা রাখিও। যিনি সেই শবদেহ দর্শন করিয়া আর বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইবেন না, তিনিই সেই মহাপুরুষ। যিনি শবদেহ দর্শনে ফিরিবেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার শিববাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। কাশীর শবদেহ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শিববাক্যে বিশ্বাস বা শাস্ত্র শ্রদ্ধা একটী ভক্তি বা জ্ঞানের পরিচয়। শ্রোতৃবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা, আমি যথাসাধ্য প্রবন্ধে একবার হরি-নাম বলার গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন হরি-নামের গুণ আমাতে ফলবান হয।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

"সুশীল।"

দ্বিতীয় পল্লব।

নব নারী সম্মিলন,
করে যা'রা অনুক্ষণ,
আনিল কুমারী এক সুরবালা সম,
রূপেগুণে অতুলনা,
সুধাময়ী সে ললনা,
মন্দার কলিকা সম অতি মনোরম;

শুভ পরিণয়-ক্ষেত্রে,
মিলন বিবাহ-সূত্রে,
বরমাল্য দেয় বালা সুশীলের গলে,
সুশীলের পাশে বালা,
তমালেতে তরুবালা,
অথবা চন্দ্রমা যেন সরসীর জলে।

মনোরমা, মনোরমা;
হৃদি ব্যাথা হবে বামা,
সুশীলের মলিনতা ঘুচায় যতনে,
ফুল্ল মনে করে খেলা,
আনন্দের মহামেলা,
আঁখিতে২ থাকে সদাই দু'জনে;
যুবক-যুবতী সনে,
করে কেলি ফুল্ল মনে,
ভুলে আছে বাহিরের সংসার ব্যাপার
রসেতে অলস তা'রা,
প্রেম-মদে মাতোয়ারা,
সদাই প্রফুল্ল মনে করিছে বিহার।

এ হেন রূপের খেলা,
আনন্দের মহামেলা,
সহিল না বিধি হৃদে, ঘটে পরমাদ,
ঘুচিল সেরূপ খেলা,
ভাঙ্গিল সে মহামেলা,
অকস্মাৎ বিধি আসি সাধিল গো বাদ
সুশীল সরল মতি,
হেরিয়ে সবার প্রতি,
দংশিল কুসঙ্গ—কাল—ফণি—ভয়ঙ্কর,
বিমোহিনী ফণাহার,
ঢালিল বিষের ধার,
সুশীল সরল মতি বিষে জর জর।

প্রলোভন নামে বালা,
দশ দিশি ক'রে আলা,
ছুটাইল মায়াবিনী রূপের তরঙ্গ,
সুশীল সুন্দর হাস,
তায় হাবুডুবু খায়,
বিশ্ব-বিমোহিনী খেলা যৌবনের রঙ্গ
সুশীল কু-সঙ্গী সহ,
ভ্রমিতেছে অহরহ,
সাধের সে কুঞ্জবন নর্ত্তকী আলয়,
যে কুসুমে দেব সেবা,
আজি বিলাসিনী-সেবা,
কি পরিবর্ত্তন হের সঙ্গ বিনিময়!

ধন মান আদি যত,
ক্রমে হের পলায়িত,
ক্রমে ক্রমে পলাইল শৈশব ভূষণ,
মধু মাখা সুধা হাসি,
আর কভু নাহি আসি,
সাজাবে সে সুধালয় সুশীল-আনন;
সরলতা, কপটতা,
মধুরতা, কঠিনতা,
শৈশবে যৌবনে হের কত বিনিময়,
এক চন্দ্রমার হাসি,
রবির কিরণ রাশি,
মধুরে কঠোর কত বিভিন্নতা হয়?

মিথ্যাচার, ব্যাভিচার,
হইয়াছে অলঙ্কার,
রূপ-জীবনী-প্রণয় কণ্ঠের ভূষণ,
পবিত্র দেবী মুরতি,
আহা মনোরমা সতী,
না পায় হৃদয়ে স্থান ঝরিছে নয়ন;
পতি ভালবাসা ধনি,
মনোরমা সীমন্তিনী,

পেয়েছিল হায় তাহা কোথায় এখন?
এখন দেখিলে তা'রে,
সুশীল প্রহার করে,
শুভদৃষ্টি যা'র সনে বিষের নয়ন।
অলক্ষে নয়ন জলে,
ভাসায় সুগণ্ডস্থলে,
সমুখেতে দীর্ঘশ্বাস হয়েছে সম্বল,
সোহাগের সোহাগিনী,
আজি হেব বিষাদিনী,
উদাসিনী সম সদা আঁখি ছল ছল।
সতীর সে অপমানে,
লাগিল বিধির প্রাণে,
হেব শোকবাণ ত্যজে সুশীলেব প্রতি
অব্যর্থ শব সন্ধান,
বধিল পিতাব প্রাণ,
লয়ে যাব দিব্যধামে অতি দ্রুতগতি।
কিন্তু হায় একি রীত,
হিতে হল বিপবীত.
বাড়িল আনন্দ মাত্রা পিতাব মবণে,
গৃহে আব নাহি যায,
বাহিবে বাহিরে বয,
সাধেব সে কুঞ্জবন নাহি লয় মনে;
কুঞ্জবন বন তুল্য,
নহে তাহা মহামূল্য,
ইত্যাদব কবে সবে কাছে নাহি যায,
দিব্য স্থান ছিল যাহা,
আজি হেয ঘৃণ্য তাহা,
সংসারের মহামেলা দু'দণ্ডে ফুরায়।
মনোরমা একাকিনী,
কুঞ্জবনে বিষাদিনী,
সুশীল জননী হায় ত্যজেছে জীবন,
একে একে সব গেল,
সব খেলা ফুরাইল,
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হউক পুরণ;
সুশীলেব বন্ধু যারা,
ক্রমে হেব সবে তাবা,
মধুচক্র ভেঙ্গে গেলে ভৃঙ্গ নাহি রয়,
আজি হেব পথে পথে,
কোন বন্ধু নাহি সাথে,
ঐশ্বর্য্যের অনাদরে এইরূপ হয়।
কুঞ্জবনে ওকে ধায়,
লাল আঁখি মত্ত প্রায,
কাবে হেব মারে লাগি বুক ফেটে যায
সতী সাধ্বী মনোরমা,
প্রাণ বায়ু ত্যজে বামা,
ছিন্ন ব্রততীব মত ভূমেতে লুটায়;
সাধেব বাসব হায,
অকালে ভাঙ্গিযা যায়,
হাঃ হাঃ২ অট্টহাস্যে সুশীল হাসিল,
অবশেষে বাপীজলে,
সুশীল পরাণ ঢালে, [ডাকিল ?
"সুশীল" বলিয়া তোরে কেনরে
কি কুক্ষণে পিতামাতা ও-নাম রাখিল।

কিরণ।

সুধাংশু।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

[৪]

শশীশেখর গৃহে আসিয়া প্রথমেই স্নেহের নিকট গমন করিল, স্নেহ আপনার কক্ষে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল, ভ্রাতাকে সম্মুখে দেখিয়া অঞ্চল দ্বারা অশ্রু মুছিল।

শশীশেখর স্নেহের চক্ষে অশ্রু দেখিয়া প্রমাদ গণিল এবং ধীরে বলিল, 'দিদি! আমি কাল আসিনি বলে কাঁদচ?'

স্নেহ বলিল "হ্যাঁ ভাই! শুধু তাই নয—রতন এসে বাবাকে কাল রাত্রে অনেক কথা বলে গেল। তুমি সরকারী কাযের ক্ষতি করেছ, বাবা আর তোমার মুখ দেখ্‌বেন না।"

শশীশেখর আদ্যোপান্ত ব্যাপার বুঝিল, এবং স্নেহের পদতলে পড়িয়া বলিল দিদি! তুমি?—মা? বাপের বাড়ী চলে গেলেন, তোমাকেও সেই——

স্নেহ। তুমি যা' বলবে।

শশী। কিছু বলবো না—আমি চল্লেম;—

স্নেহ। কোথায?

শশী। যেখানে পিতার অধিকার নাই,—

স্নেহ। পুষ্প?

শশী। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো;—

স্নেহ। কাল পুষ্পের সঙ্গে কি কথা হ'ল?

শশী। কাল তার জননীর মৃত্যু হয়েছে—সারারাত্রি জাগিয়া তাহার সৎকার করিয়াছি;—

স্নেহ। তারপর?

শশী। পুষ্পের জনীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি, "পুষ্প আমার।"

স্নেহ। পুষ্প কি সত্যই তোর?

শশী। তুমি ভগিনী—দিদি, নতুবা অন্য কেহ ও-কথা বলিলে জন্মে তাহার মুখ দেখিতাম না।

স্নেহ। তবে সে ধান কোথায় পেলে?

শশী। স্নেহ-দিদি তোমার তা জানা উচিত, কেন না, তুমি আমার বড়, তুমি অনেক দিন ত তাদের বাড়ী গেছ?

স্নেহ। পুষ্প স্বর্গের পারিজাত—দানবের অত্যাচার স্বর্গ-শ্রীহীন হইলেও পারিজাতের গন্ধ ও শোভা তেমনই আছে।

শশী। দিদি! বাবা তার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তা'ই পুষ্পের এই দশা—সে দরিদ্র হইয়াছে—কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানে না, কাহার সাহায্যও চাহে না। যতদিন তাহার জননীর শরীরে বল ছিল, পুষ্প ঘরে বসিয়া খাইতে পাইত, কিন্তু আজ কয়মাস—তিনি শয্যাগত ছিলেন, পুষ্প মাঠে পথে যে ধান কা'হার বোঝা হইতে খসিয়া পড়িত, তাহাই কুড়াইয়া বোঝা বাঁধিয়া ঘরে লইয়া যাইত—এবং তদ্দ্বারা নিজের ও জননীর আহার চালাইত।

স্নেহ। পুষ্পকে তুমি প্রথমেই চিনিয়াছিলে কি?

শশী। না, তাহার কুটির দেখিয়া চিনিয়াছিলাম।

স্নেহ। এখন কিছু খা?

শশী। না দিদি চলিলাম—এ বাটীতে আর আমার স্থান নাই আমি পুষ্পের নিকট ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কথা শুনিলাম। পিতা এখন পুষ্পের প্রাণ নাশের চেষ্টায় আছেন, আমাকেও ছলে কোন কুঠিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, কেন না আমার অপরাধ—আমি পিতার পাপকার্য্যে সহায়তা করি না—তিনি লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বিষয় বৃদ্ধি করেন—আমি তাহাতে বাধা দিই। আহা! অনাথিনী পুষ্প! বাবার জন্য তাহার এই দশা! কিন্তু দিদি! আমি পুত্র হইয়া পিতাকে সে পাপ হইতে মুক্ত করিব। অদ্যই পুষ্পকে লইয়া এ গ্রাম পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে পিতা আর নারী-হত্যা-জনিত পাপে পতিত হইবেন না, তাহার

এখন আমি ভিন্ন আর কেহ নাই। দিদি! আমি চলিলাম, বিদায়,—যদি কখন দিন পাই আবার দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত।"—এই বলিয়া শশীশেখর দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

স্নেহের মুখে কথা সরিল না, কেবল চক্ষু দিয়া দু'এক ফোঁটা অশ্রু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

[৫]

শশীশেখর বরাবর পুষ্পের কুটিরে গমন করিয়া সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তরে যাইয়া বাস করিল এবং অশৌচান্তে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া তাহার পাণি-গ্রহণ করিল—পুষ্প এখন শশীশেখরকে দেখিলে কিঞ্চিৎ লজ্জা না করিয়া থাকিতে পারে না।

শশীশেখর এতদিন নিজ-খরচ হইতে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ সুখে দিন কাটাইতে লাগিল, পুষ্প এখন সদ্য-বিকশিত গোলাপ ফুলের প্রায় হইয়া উঠিল।

অপর পক্ষে রাধিকাপ্রসাদের কি হইল—স্নেহই বা এখন কি করিতেছে? শশীশেখর অমন করিয়া চলিয়া যাইবে, স্নেহ ততটা ভাবে নাই—সুতরাং ভ্রাতার অবিদ্যমানে তাহার দেহ মন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল, ইহার উপর অল্পদিন পরেই তাহার স্বামীবিয়োগ ঘটিল—তথাপি স্নেহ শশীশেখরের জন্য বাঁচিয়া রহিল—স্নেহের জননী বদ্ধ-উন্মাদিনী হইলেন। রাধিকাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলেন।

ঘরে অগ্নি লাগিয়া রতন মণ্ডল গৃহশূন্য ও সর্ব্বস্বান্ত হইল—সেই বিষম অগ্নিকাণ্ডে তাহার একমাত্র পুত্র পুড়িয়া মরিল—রতন তখন শশীশেখর ও পুষ্পের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু তাহাদের উভয়ের সংবাদ ত্রিবাটীতে কেহ জানে না।

রতন বুঝিল—এ সকলই তাহার প্রভু-দ্রোহিতা এবং সরলা বালিকা পুষ্পের সর্ব্বনাশ সাধনের সমুচিত প্রতিফল; সুতরাং সে মনে মনে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্থির করিল—রতন, শশী-শেখরের সন্ধানে চলিল।

[৬]

যেস্থানে শশীশেখর পুষ্পকে লইয়া বাস করিতেছেন, সে স্থান ত্রিবাটী হইতে প্রায় দশ পনর ক্রোশ দূরে; রতন কিন্তু অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে যাইয়া পড়িল।

শশীশেখর ও পুষ্প একত্রে আর চারি বৎসর সুখ-সম্ভোগ করিল, ইতি মধ্যে পুষ্পের একটী পুত্র হইয়াছে—স্বামী ও স্ত্রী, মধ্যে মধ্যে পুত্রের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুপাত করেন। কিন্তু শশীশেখরকে আর বড় অধিক দিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না।

শশীশেখর প্রতি মাসে প্রচ্ছন্ন বেশে, এক একবার অশ্বারোহণে ত্রিবাটী গমন করেন। এবারেও গমন করিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে অন্ধকারে পথ হারা হইয়া অশ্ব সহিত একটা কূপে পতিত হইলেন, এবং সমস্ত রাত্রি সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন—প্রভাতে একজন লোক আসিয়া তাহাকে উঠাইল—এবং পাল্কী আনাইয়া গৃহে লইয়া গেল।

এই আঘাতে শশীশেখর অসুস্থ হইলেন, এবং এক মাস পরে তাহার মৃত্যু হইল—পুষ্পের দশা এইবার কি হইল তাহা বর্ণনাতীত!

[৭]

প্রায় তিন মাস পরে একদিন রতন শশীশেখরের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্পের বাটী আসিল—পুষ্প তখন পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। রতন পুষ্পকে দেখিল—কিন্তু চিনিতে পারিল না—পুষ্পও তাহাকে চিনিল না। রতন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল "মা!—আমি আজ কয়দিন পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি, যদ্যপি আমাকে আশ্রয় দেন, তবে বড় উপকৃত হই—আর এই গ্রামে কি শশীশেখর নামে কেহ বাস করেন?—আমি যে গ্রামে যাইতেছি, সেই গ্রামে প্রত্যেককেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।"

পুষ্প এতক্ষণে রতনকে চিনিল, এবং ভয়ে গৃহ মধ্যে পলায়ন করিল। রতন ভাবিল—রমণী তাহাকে দেখিয়া কিছু না বলিয়া পলাইল কেন? ভাবিতে ভাবিতে তাহার পুষ্পের কথা মনে পড়িল, তখন সে বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল মা—পুষ্প! আমি তোমায় চিনিয়াছি, তুমি আমাদের ত্রিবাটীর পুষ্প। আর ভয় নাই মা! একবার গৃহের বাহির হইয়া ভাল করিয়া দেখ, রতনের কি দশা হইয়াছে—তোমাদের অনুসন্ধানে আমি আজ কয় বৎসর পথে পথে ফিরিয়াছি—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে—আমার গৃহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়াছে—আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে—আমি এখন পথের কাঙ্গালি—কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও যাহা বাকী আছে, তাহা শেষ করিব। এস মা—আমার ত্রিবাটীর যোত্র-জমা তোমাকে দেওয়াইব—রতনের কথায় রাধিকাপ্রসাদ অমত করিবে না—এখন এস এবং বল শশীশেখর কোথায়?—সেই দরিদ্রের 'মা বাপ' শশীশেখরকে দেখাও।"

এই সময় গৃহ মধ্য হইতে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল। রতন সে ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিল, তাহার মর্ম্ম স্থান বিদ্ধ হইল—রতন ভূমে পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল—পুষ্প আর গৃহ মধ্যে থাকিতে পারিল না—বাহিরে আসিয়া রতনকে বলিল;——

"রতন!—আর কাঁদিও না,—তোমাদের প্রভু স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে এ শিশুকে গ্রহণ কর—যদ্যপি ইচ্ছা হয়, ইহাকেই তোমাদের প্রভু বলিয়া মনকে সান্ত্বনা কর।—

রতন দ্রুত যাইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইল—শিশু রতনের ক্রোড়ে আসিয়া 'দা' 'দা' বলিয়া তাহার নাকটী কামড়াইতে লাগিল—রতন ক্ষণেকের জন্য সকল শোক বিস্মৃত হইল। পুষ্প রতনকে পূর্ব্বাপর সকল কথা বলিল।

রতন সেই কথা শুনিয়া শিশুকে আদর করিতে করিতে

বলিল,—"মা!—এখানে থেকে আর কি করবি—চল ত্রিবাটী যাই—ত্রিবাটীর শিশু জমিদারকে এখানে কে আদর যত্ন করবে?"

পুষ্প কাঁদিয়া বলিল—"রতন! যে পরের ধান চুরি করিয়া জীবন ধারণ করিত—তাহার পুত্রকে ত্রিবাটীর লোক খাওয়াইবে কেন?"

রতন পুষ্পের পদতলে পড়িল—পুষ্প সরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—"রতন! আমি আজ তিনদিন অনাহারে আছি, এবং অনাহারেই থাকিব—এ কথা কাহাকেও বলিতাম না, কেবল এই শিশুর জন্যই বলিতেছি। তুমি আজ থাক, কাল প্রাতে ত্রিবাটী যাইয়া স্নেহ দিদিকে সকল কথা বলিও—যদি তাঁহার পিতার মত হয়—ইহাকে লইয়া যাইও—আর ত্রিবাটীতে শেষদিন যে ধানের বোঝা চুরি করিয়াছিলাম, তাহাও রাখিয়া দিয়াছি—তোমাকে ঐ সঙ্গে তাহাও দিব—উহা তোমাদের মৃত প্রভুর জীবনের মূল্য; সুতরাং উহা ত্রিবাটীর লোকেরই প্রাপ্য—আমি কেবল পোড়া পেটের জ্বালায় পথে পথে কুড়াইয়া একত্রিত করিয়াছিলাম।"

রতন বলিল "মা—!এখন চলিলাম—পারি—কাল মধ্যাহ্নে এখানে আসিয়া যাহা ভাল বুঝিব করিব।"

এই বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রতন দ্রুতবেগে বাটীর বাহির হইয়া গেল। পুষ্প আসিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল।

[৮]

পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থেরই দুই একটী ঘোটক থাকে—সে সকল ঘোটক অনেক সময় দিবারাত্র মাঠে, পথে চরিয়া বেড়ায়। রতন পুষ্পের বাটী হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটা অশ্ব দেখিতে পাইল এবং ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল, এবং প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা পরে ত্রিবাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অপ্রয়োজন বোধে অশ্বটিতে ছাড়িয়া দিল, এবং দ্রুতগতিতে রাধিকাপ্রসাদের গৃহাভিমুখে চলিল, পথে পূর্ব্বোক্ত

নায়েবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, রতন তাহার সহিত বাক্যালাপও করিল না—রতন বরাবর যাইয়া রাধিকাপ্রসাদের বিশ্রামকক্ষে গমন করিল, এবং তাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—"বাবু! আমি এসেছি।"

রাধিকাপ্রসাদ করতলে মস্তক রাখিয়া কি ভাবিতেছিলেন—রতনের স্বর তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল এবং চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—রতন মণ্ডল! তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—রতন আবার বলিল "বাবু! একবার আপনার কন্যা স্নেহকে এই খানে ডাকিয়া পাঠান।—"

রাধিকাপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন রতন? এতদিন কোথায় ছিলে?"

'শশী বাবুর অনুসন্ধানে' এই বলিয়া রতন স্বয়ং একজন চাকরকে ডাকিয়া স্নেহকে ডাকিয়া আনিতে বলিল—চাকর তাহাকে ডাকিতে চলিয়া গেল।

রাধিকাপ্রসাদ বসিয়াছিলেন, রতনের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রতন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।—রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন—"রতন! কোথায় গিয়াছিলে বলিলে?"

রতন দৃঢ়স্বরে বলিল—"শশী বাবুর অনুসন্ধানে—তাহাকে দেশে ফিরাইতে—"

রাধিকাপ্রসাদ তীব্র স্বরে বলিলেন,—"শশীশেখর আমার পুত্র হইয়া আমার শত্রু, আমার উন্নতির পথের কণ্টক, আমার—আমার শত্রুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমায় যথেষ্ট অপমানিত করিয়াছে—তুমি তাহাকে আবার আনিতে গিয়াছিলে, সুতরাং তুমিও আমার শত্রু।"

এই সময় স্নেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, রতন রাধিকা-প্রসাদের কথার কোন উত্তর না দিয়া স্নেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিল;—মা স্নেহ! একটী অনাথ শিশুর ভার গ্রহণ করিতে পারিবে কি?

স্নেহ বলিল,—"পারিব।"

রতন। আগে সকল কথা শোন, তবে বলিও।

স্নেহ। তবে বল।

রতন। ত্রিবাটীর প্রবল জমিদার রাধিকাপ্রসাদের এক পুত্র মৃত শশীশেখরের পুত্র অনাথ শিশু আজ তিন দিন অন মৃত প্রায়।

রাধিকাপ্রসাদ ও স্নেহ উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে হইল।

[৯ [

রাধিকাপ্রসাদ শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করিল, কিন্তু স্নেহ মৃতকল্প রহিল—রতন অনেক যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, এবং "বাবা! তোমার ত্রিবাটী আমি চলিলাম"—এই বলিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল। রাধিকাপ্রসাদ বিদ্যুদ্বেগে তাহাদের পশ্চাতে করিলেন এবং স্নেহকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন ;—

"মা স্নেহ! কোথায় যাও?"

স্নেহ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"যেখানে পুষ্প শশীশেখরের লইয়া অনাহারে আছে?"

রাধিকা। তাহার পর?

স্নেহ। যাহাতে ত্রিবাটীর অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই করিব।

রাধিকা। আমি স্বেচ্ছায় তাহা দিব—এই রাত্রেই ত্রিবাটীর মণ্ডল, প্রজা, পাইক লইয়া সেই স্থানে যাইব কি চাও?

এই বলিয়া তিনি রতনকে সেই রাত্রেই সকলকে গমনের আয়োজন করিতে বলিলেন। রতন আপনার কা করিল।

স্নেহ আসিয়া পিতার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! আমাদের শশী ?—"

রাধিকা। স্নেহ—আর কেন? আমার পাপের প্রতিফল যথেষ্ট হইয়াছে।

এই বলিয়া উভয়েই নিম্নে গমন কবিলেন। অল্পক্ষণ পরেই পাল্কী, বেহারা, পাইক, প্রহরী, সকলেই আসিল—রাধিকাপ্রসাদ সদলবলে পুষ্পানয়নার্থে গমন করিলেন। রতন সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল।

[১০]

পরদিন পূর্ব্বোক্ত পুষ্পের বাটীর অদূরে বিষম কোলাহল সমুত্থিত হইল। পুষ্প শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া ভূমে পড়িয়া অনাহারের ভাবনা ভাবিতেছিল, এমন সময় এ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে উঠিয়া বসিল—কিন্তু শরীর বিষম দুর্ব্বল বলিয়া শুইয়া পড়িল—এমন সময় রতন আসিয়া ডাকিল, "মা—লক্ষ্মি! এই দেখ কে এসেছে?"

পুষ্প বুঝিল রতন আসিয়াছে, সুতরাং অতি কষ্টে উঠিয়া দ্বার খুলিল এবং সম্মুখে রতন ও স্নেহকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতের প্রায় বসিয়া পড়িল। স্নেহ যাইয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল—পুষ্প স্নেহের সুকোমল স্পর্শে যেন কিঞ্চিৎ বল পাইল, এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"ভাই স্নেহ! তুমি এসেছ? এই শিশুটীকে ধর—এটী তোমার।"

স্নেহ স্নেহভরে বলিল—"হ্যাঁ ভাই এসেছি, বাবা এসেছেন, ত্রিবাটীর তোমার অধিকাংশ প্রজাই আসিয়াছে। এই বলিয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিল—এবং স্বীয় নয়ন জলে তাহাকে স্নান করাইল।—

এই সময় রাধিকাপ্রসাদ ও অন্যান্য সকলেই সেই গৃহ-প্রাঙ্গণে আসি[illegible]।—স্নেহ শিশুটীকে লইয়া পিতার হস্তে প্রদান করিল—রা[illegible]কাপ্রসাদ নির্নিমেষে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহার পর

মধ্যাহ্নে সেই স্থানে সকলেই আহারাদি সমাপন
অপরাহ্নে সকলেই ত্রিবাটী ফিরিলেন।

স্নেহ ঘরে আসিয়া পুত্রকে বলিলেন—"ছেলের কি
রাছিস।" পুষ্প—"বলিল কিছুই না।" স্নেহ বলিল আমি
নাম রাখিলাম—সুধাংশু।

শ্রীশ্যামলাল

সমালোচনা ও মতামত।

মীমাংসা-তত্ত্ব—প্রথম ভাগ, শ্রীযুক্ত নবকুমার
নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা মাত্র।

পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রাপ্ত মহোদয়গণের হিন্দুত্ব ও
বিরুদ্ধে উপর্য্যুপরি লেখনী চালন, অধার্ম্মিকগণের
বাদানুবাদ (যাহা হিন্দুধর্ম্ম বরাবরই গা' পাতিয়া সহিয়া
তাহার একটী মীমাংসা করিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক
ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই "মীমাংসা-তত্ত্ব" প্রচার করিয়াছে
পাদ নবকুমার বাবুর এই অভিনব ও সর্ব্বজন প্রীতিপ্রদ
আমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। গ্রন্থে
আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হয় নাই; শৈবেরা মহা
করিয়া তাহাদের দেবতাকে বড় করেন নাই, বৈষ্ণব
ব্রহ্মা শিবকে বিষ্ণুর ভক্ত বলিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শিবে
নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বেদে সাকার উপাসনা ও প্রতিমা
নাই, বেদে জাতিভেদ নাই—এই সকল পাশ্চাত্য
গণের সমালোচনা আলোচনার—মীমাংসা করিয়া তাহ
চিন্তা-শক্তির পরিচয়ের সহিত হিন্দু সাধারণের বিশেষ
করিয়াছেন। নাটক-নভেলাদি-প্লাবিত বঙ্গদেশে এই
অতি সারবান গ্রন্থের আদর হইবে কি না বলিতে পা